তিমি তিমিঙ্গিল
নারায়ণ সান্যাল

তিমি তিমিঙ্গিল

নারায়ণ সান্যাল

গ্রন্থ প্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭১
ও
করুনা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন। কলিকাতা ৭০০০০৯

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

প্রথম প্রকাশ:
মে, ১৯৩৯
প্রকাশক:
মৈনাক বসু
গ্রন্থ প্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০০৭৩
মুদ্রক:
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদ:
কুমারঅজিত
দাম:
বারো টাকা

শ্রীমতি ছন্দা ঘোষ

ও

শ্রীমান চয়ন ঘোষ

------ যুগ্মকরকমলেষু

তিমির আঁতুড়ঘর

অদ্ভুত একটা অনুভূতি। তলপেটের কাছে। কে যেন গুঁতো মারছে! কে আবার? দুষ্টুটাই। যে আসছে। যাকে আজ এগার মাস ধরে পেটের ভিতর বয়ে বেড়াচ্ছে। না, এগার মাসের হিসাবটা ও বোঝে না। এক-দুই-তিন গুণতে জানে না। তা হোক, সময়ের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ওর নিজস্ব বোধ অনুযায়ী একটা ধারণা আছে—অমাবস্যা-পূর্ণিমার মাপে। তখন বড়-জোয়ার আসে যে! সাগর ফুলে ফেঁপে ওঠে। মোটকথা ও বুঝতে পারছে সময় হয়েছে—পেটের ভিতর সেই চুন্নুমুন্নুটা এবার বাইরে আসতে চাইছে! মা-তিমি একটা শব্দতরঙ্গ ছেড়ে দিল সামনের দিকে।

শ-দুই গজ দূরে ভাসছিল মাসিমা, মানে ধাই-মা। একটা প্রকাণ্ড ভাসমান পর্বত। তার কর্ণকুহরে সেই শব্দতরঙ্গ প্রতিহত হল। ধাই-মা মুখ ঘোরাল। হ্যাঁ, ধাই মা-ই; মানুষের ধাইমা থাকে, হাতীর আন্টি থাকে আর ওদেরই থাকবে না? দলছুট ধাই-মা আজ এক-পূর্ণিমা ঘুরছে আসন্ন প্রসবার সাথে সাথে। যাকে রক্তের সম্পর্ক বল, তা নেই, তবে খুব ব্যাপক অর্থে জাতিগত রক্তের সম্পর্ক আছে। আসন্ন প্রসবার বাইশ বছর বয়সের মধ্যে এই বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। মাত্র একমাস আগে হঠাৎ দুজনে দেখা হয়েছে—দক্ষিণার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে—মাসি-তিমি দেখেই বুঝতে পেরেছিল তার সদ্যোপরিচিতা ভরা পোয়াতি। ব্যস্, তাকে আর অনুরোধও করতে হয়নি। তারপর থেকে সে ছায়ার মত সেঁটে আছে বান্ধবীর সঙ্গে। সে খালাস হবে, দেড়-দু'মাসে বাচ্চাটা একটু লায়েক হবে, মা তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পাবে, তখন তার ছুটি। এ কাজের দায়িত্ব তাকে কে দিল? তার আমি কী জানি? ডারউইন সাহেবকে শুধিয়ে দেখ।

শব্দ শুনেই ধাই-মা বুঝতে পারল। তৎক্ষণাৎ ঘনিয়ে এল কাছে। এখন ওর বান্ধবী নিতান্ত অসহায়। এখন যদি কোন 'রাক্ষুসে-তিমি', হাঙর বা 'অসিনাসা' ওর বান্ধবীর দিকে তেড়ে আসে তাহলে মাসিই তার সঙ্গে মোকাবিলা করবে। জান দিয়ে লড়ে যাবে প্রজাতিকে বাঁচাতে হবে না। বাচ্চাটা ছটফট করছে মায়ের পেটের ভিতর।
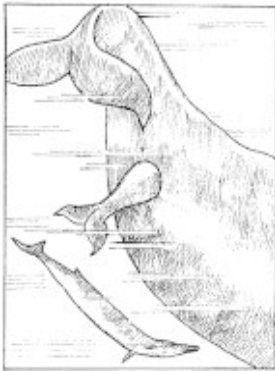
এ কি মানুষের বাচ্চা? -বেরিয়ে এল একটা লেজ।

পুঁচকে বাচ্চাটা--এ্যাত্তটুকুন—লম্বায় মাত্র সাত মিটার, মানে পনের হাত, ওজন মাত্র দু'টন (৫৪ মণ) এক্কেবারে চুন্নু মুন্নু।

প্রসব হতে কোন মায়ের না যন্ত্রণা হয়? কোন মায়ের না আনন্দ? প্রায় আধঘণ্টা প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করতে হল। তারপর—আঃ! কী আনন্দ! সবার আগে বেরিয়ে এল, না মাথা নয়, এ কি মানুষের বাচ্চা?—বেরিয়ে এল লেজটা তারপর ক্রমে-ক্রমে পনের হাত লম্বা গোটা দেহটা। মা-তিমির তলপেটের মাংসপেশী, যা এতক্ষণ ক্রমাগত সঙ্কুচিত-

প্রসারিত হচ্ছিল, তারা অব্যাহতি পেল কিন্তু কাজ এখনও শেষ হয়নি প্রথম কাজ নাড়িটা ছিঁড়ে ফেলা। মায়ের সঙ্গে সন্তানের দৈহিক যোগসূত্রটা বিচ্ছিন্ন করা, সন্তান এখন স্বতন্ত্র সত্তা। কী করে ছিঁড়বে? দাঁত তো নেই। না মা-তিমির, না মাসি-তিমির, ওরা 'ঝিল্লিমথো' দাঁতের বালাই নেই

কে ওদের শিখিয়েছে জানি না- যদি ভগবানে বিশ্বাস কর তবে ভগবান, যদি ডারউইনে বিশ্বাস কর, তবে দু'কোটি বছরের জন্মগত সংস্কার! সেই যবে থেকে দাঁত খোয়া গেছে। প্রকৃতিই ওকে শিখিয়েছে।

মা-তিমি তার অতি বিশাল দেহটা নিয়ে জলের আকাশে একটা ডিগবাজি খেল। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলল নবজাতকের সঙ্গে ওর শারীরিক যোগসূত্র। আর তৎক্ষণাৎ-- বলতে পার ঐ জন্মগত সংস্কারের বশেই, চলে গেল নবজাতকের দেহের নিচে। মা-তিমি জানত—তলা থেকে ঠেকো না-দিলে বাচ্চাটা তলিয়ে যাবে সমুদ্রের গভীরে। ওর দেহে এখনও বাতাস ঢোকেনি, ও যে ‘প্লবতা'-র নাগাল পায়নি, তাই ও সাঁতার জানে না!

বাচ্চাটা রীতিমত হকচকিয়ে গেছে। অনেকগুলো অভিজ্ঞতা হুড়মুড়িয়ে এল কিনা। প্রথমত আলোর বোধ! নীরন্ধ্র অন্ধকারেই এতদিন অভ্যস্ত ছিল--হঠাৎ এই মুহূর্তে আলোর স্পর্শ পেল। হ্যাঁ, আলো। ওর জন্ম হল সমুদ্র সমতলের ফুট-দশেক গভীরে। এখানেও সূর্যরশ্মির নীলাভ সবুজ আলোর আলিম্পন। না, নীল বা সবুজ রঙের বোধ ওর নেই—কোন তিমিরই নেই, তবে আলোর বোধ আছে। দ্বিতীয়ত শব্দ। এতদিন প্রায় একবছর ধরে একটিমাত্র শব্দই শুনেছে— দপদপ - সমান সময়ের ব্যবধানে। ওর মায়ের পাঁচশ কেজি - ওজনের প্রকাণ্ড হৃদপিণ্ডটার স্পন্দন! যে হৃদপিণ্ড থেকে প্রায় দু ইঞ্চি ব্যাসের শিরা-ধমনী দিয়ে ওর মায়ের সত্তর ফুট দেহের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে রক্ত চলাচল করে। যে-রক্তের ভগ্নাংশ পেয়েই ও বেঁচেছিল এতদিন। হঠাৎ এই মুহূর্তে সেই দপদপানিটা বন্ধ হয়ে গেল। যেন আজ এক বছর ধরে মাতৃহৃদয় সন্তানকে জীবনের আহ্বান শোনাচ্ছিল— সন্তান পৃথক সত্তায় রূপান্তরিত হতেই সে শব্দটা থেমে গেল। তার পরিবর্তে হাজাররকম বিচিত্র শব্দ এসে ধাক্কা মারতে শুরু করেছে ওর শ্রুতিতে। কী-কেন-কোথা থেকে আসছে সেসব জানে না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে। প্রায় নিঃশব্দ-সঞ্চারী মাছের ঝাঁকের পাখনার আওয়াজ, উপর-তলার সমুদ্রগর্জন, আরও কত কী শব্দ। মানুষ-ডুবুরি জলের তলায় এসব শব্দ শোনে না, মাছেরাও শোনে না— ও শুনতে পাচ্ছে। কারণ ওর শ্রবণশক্তি যে অবিশ্বাস্য রকমের। বাচ্চাটা তাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

কিন্তু এ কী জ্বালা! তলা থেকে মা ওকে এমন ক্রমাগত গুঁতোচ্ছে কেন রে বাবা? বেচারি কোন কূলকিনারা করতে পারে না। না পারুক, বুঝুক না বুঝুক মায়ের গুঁতুনিতে ওকে অনিবার্যভাবে উপরদিকে উঠে যেতে হয়। রীতিমত নাক দিয়ে ধাক্কা মেরে বাচ্চার মাথাটা মা-তিমি ঠেলে তুলে দিল জলের উপরে। ঐ সেই একই গল্প! জন্মগত সংস্কার! বাচ্চার ব্রহ্মতালুতে ‘নাক-বিকল্পে'র পর্দাটা সরে গেল। এক ঝলক বাতাস সেঁধিয়ে যায় ওর ফুসফুসে। এতক্ষণে বুঝতে পারে—মা কেন তাকে ঠেলে-ঠেলে উপরদিকে তুলছিল। আর একবার— এবার স্বেচ্ছায়, নাক-বিকল্পের পর্দাটা খুলতে গেল বাচ্চাটা, আর ঠিক তখনই এক মুঠো নোনাজল সেঁধিয়ে গেল ওর মাথায়। বেচারি! ও কেমন করে জানবে, সমুদ্র এখন উথাল-পাথাল। রীতিমত ঝড়ই বইছে একটা। মা-তিমি কিন্তু তখনই বাচ্চার তলা থেকে সরে গেল না। একটু ফাঁক দিয়ে উথাল ঢেউটা কাটিয়ে পাথাল ঢেউয়ের নৌকা-বাঁকের খোঁজে ঠেলে তুলে দিল বাচ্চার মাথাটা। কী চালাক। পুটুস করে শিখে নিয়েছে। ঠিক পরের উথাল ঢেউ হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে আসার আগেই পুট করে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে নাক-বিকল্পের ছ্যাঁদাটা বন্ধ করে দিয়েছে। মা-তিমি খুশি হল। এ ছেলে বড় হয়ে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট না হোক, লায়েক হবে! মা-তিমি নিশ্চিন্তও হল—এবার সে চট করে সরে গেল বাচ্চার তলা থেকে। ভাবখানা দেখাই যাক না—খোকন কতটা সেয়ানা!

বাচ্চাটা প্রথমে কেমন যেন অসহায় বোধ করল—মা-তিমি তলা থেকে সরে যাওয়ায়। কিন্তু না! পরমুহূর্তেই দেখল সে ভাসতে পারছে। তলিয়ে যাচ্ছে না! এক বুক বাতাস টেনে নিয়েছে তো! তাছাড়া তিমির বাচ্চা—ডুবে মরবে কোন্ দুঃখে? দিব্যি পাখনা নাড়িয়ে ভুরভুর করে জল কেটে এগিয়ে চলল। মাসি খুব খুশি। এগিয়ে এসে 'হাতডানা' দিয়ে একটু আদর করল। মাসিকে ও চিনত না। কুতকুতে চোখ মেলে এখন চিনল।

মা-তিমি ক্লান্ত বোধ করছিল। আহ!, মা হওয়া কী কম জ্বালা! মাসিই বাচ্চাটার দায়িত্ব নিল। খুব কিছু প্রয়োজন ছিল না। বাচ্চাটা ইতিমধ্যেই দু দুটো কাজে রীতিমত রপ্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নেওয়া আর তরতরিয়ে সাঁতার কাটা। মাসির তদারকিতে বার-কয়েক ওঠানামা করে নিঃশ্বাস নেবার পরেই ও কেমন যেন চনমন করতে থাকে। কী যেন চাই, কী-যেন বাদ যাচ্ছে—ভাবখানা এইরকম। কী সেটা? ঠাওর হয় না—কিন্তু কিছু একটা চাইছে ওর শরীর। কোথাও কিছু নেই, মাসিকে একটু টু মারল। মাসি উল্টে লেজের এক ঝাপট মারল আলতো করে। 'হাতডানা' দিয়ে ঠেলে দিল একধারে। যেন বললে, দূর পাগলা। আমার কাছে কেন এসেছিস? ও-জিনিস আমি কোথায় পার রে বোকা! যা—তোর মায়ের কাছে যা–বাঁদর কোথাকার!

বাচ্চাটা বুঝল। মাসিকে ছেড়ে চুকচুক করে এগিয়ে গেল মায়ের দিকে। মা-ও বুঝল। না বুঝবে কেন? এতক্ষণে ওর স্তনদুটোও যে টন-টন করছে—টন-টন দুধের চাপে। এই ওর প্রথম সন্তান—তা হোক, মা-হওয়ার যে কী জ্বালা তা কি জানবে না? মা-তিমি একটু কাত হয়ে মাঝারি-সাইজ চালকুমড়ো মাপের বোঁটাখানা এগিয়ে দিল খোকার দিকে। বাচ্চাটার ঠোঁট নেই। কী আপদ! স্তন্যপায়ী জীব পয়দা করে ঠোঁট দিতেই ভুলে গেলেন ভগবান? ঠোঁট ছাড়া চুষবেই বা কেমন করে? কেমন করে? কেন, জিভ তো আছে। হাত খানেক লম্বা জিভটা সূঁচালো করে ফানেলের মতো পাকিয়ে লেপটে দিল ঐ চালকুমড়োর গায়ে। চাপ দিতে হল না—বাচ্চাটা জিভ দিয়ে জড়িয়ে ধরতেই অঝোর ধারায় মাতৃস্তনের অমৃত ঝরে পড়তে থাকে ওর কণ্ঠনালীতে।

হ্যাঁ, অঝোর ধারাতেই। কম করেও আট-দশ বালতি! তার কী ঘন সে দুধ! বটের আঠার মত। খাঁটি মূলতানি গরুর দুধে যতটা ফ্যাট থাকে তার না-হোক দশগুণ বেশি স্নেহপদার্থ! মায়ের স্নেহ তো একেই বলে!

পেটটা মোটা-মোটা মানেই চোখটা ছোট-ছোট, কী মানুষ, কী তিমি। খোকামণি এবার ঘুম যাবে। কিন্তু বাচ্চাই হোক আর ধাড়িই হোক, তিমির একটানা ঘুম দেবার জো নেই। সেই যাকে তোমরা বল ‘কাঁথা পেড়ে ঘুম যাওয়া' তেমন কুম্ভকর্ণী ঘুম ওদের ধাতে নেই। তাই ওদের ঘুম মানেই চটকা ঘুম। দশ-বিশ মিনিটের চোখ-মটকানো। উপায় কী? প্রতি ঘণ্টায় ওদের দু-তিনবার আকাশপানে উঠে নিঃশ্বাস নিতে হয় যে! দশ কোটি বছর আগে সাগরে নেমেছে, তবু মাছেদের মত কানকো দিয়ে অক্সিজেন শুষে নেওয়া আজও রপ্ত হল না। যার যেমন কপাল! মা-তিমি খোকনসোনার চিবুকের তলায় একটা ‘হাতডানা' চালিয়ে চেপে ধরল। খোকনমণি তো এখনও ঘুমুতে-ঘুমুতে সাঁতার কাটা শেখেনি, তাই এই সাবধানতা। আসলে হয়তো প্রয়োজন ছিল না। ঐ 'হাতডানা'র ঠেকো ছাড়াও হয়তো বাচ্চাটা তলিয়ে যেত না— তবু সদ্যোজননী তার সংস্কারবশে ঐটুকু সাবধানতা অবলম্বন করে। তোমার মা কি করত না? আঁতুড়ঘরে রাত্রিবেলা তুমি যখন ঘুম যেতে, তখন দেয়ালা দেখে যাতে ককিয়ে না ওঠ, তাই একটা হাত আলতো করে ছুঁইয়ে রাখত তোমার গায়ে, শুধিয়ে দেখ তোমার মা-মাসিকে। এও ঠিক তেমনি!

ঐখানেই তোমার সঙ্গে ওর তফাৎ। এর মা আছে, মাসি আছে, কিন্তু তিমির রাত্রি নেই। তারিখটা পনেরই জুন শীতকাল! না গো, হিসাবের কড়ি বাঘে খায়নি—ওর জন্ম যে দক্ষিণ অতলান্তিক মহাসাগরে। বিষুবরেখার ওপারে। দক্ষিণ আমেরিকার রিও-ডি-জেনিরো বন্দর থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে মানে দক্ষিণ গোলার্ধে। সেখানে জুনমাস

বলতে শীতের মাঝামাঝি। ওর মায়ের ব্লাবার এখন প্রায় দশ ইঞ্চি পুরু। ব্লাবার বোঝা তো? চামড়ার ঠিক নিচেই থাকে, উপরের চামড়া-চাদরটার আড়ালে, তাতে ওরা খাদ্যসম্পদ সঞ্চয় করে রাখে। মা-তিমি গত গ্রীষ্মের মরশুমে চরতে গিয়েছিল দক্ষিণমেরুর ক্রিল পাড়ায়। প্রতি গ্রীষ্মেই যায় সেখানে চার-ছয়মাস ক্রমাগত প্ল্যাংটন আর ক্রিল খেয়েছে মানে অতি ছোট ছোট মাপের কুচোচিংড়ি জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী। তাতেই ওর ব্লাবারটা পুরু হয়েছে। এখন মাস ছয়েক কিছু না-খেলেও ওর চলবে—মাঝে মাঝে হয়তো হেরিং খাবে। বস্তুত ওরা গ্রীষ্মকালের কয়েকমাস মেরু অঞ্চলে যায় প্রাণভরে খেয়ে নিতে, বাড়তি খাদ্যসম্পদ মজুত হয়ে থাকে ব্লাবারে। তারপর শীত পড়তে শুরু করলেই চলে আসে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। গত বছরের সঞ্চয় থেকে মা-তিমি গোটা শীতকালটা কাটাবে—নিজেও বাঁচবে, বাচ্চাটাকেও বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচাবে। মাস ছয়েক বাচ্চাটা মায়ের দুধ খাবে—সেই গ্রীষ্মকাল তক্। তারপর মায়ের লগেলগে যাবে ক্রিল পাড়ার মেলায়; বলতে পার তখন ওর 'ক্রিলপ্রাশন' হবে। এই ছয়মাস ধরে দিনে দশ-পনেরবার মায়ের তলপেটে গুঁতো মারবে, দুদু খাবে আর কোঁৎকা হবে।

'নীলতিমি'—ঐ যাকে বলে ব্লু-হোয়েল, তার বাচ্চার বৃদ্ধি তো অবিশ্বাস্য। দিনে তার ওজন বাড়ে এক কুইন্ট্যাল! মানে প্রথম সপ্তাহে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় চার কেজি! বিশ্বাস হয়? লম্বায় প্রথম ক'দিনে বাড়ে দৈনিক প্রায় এক হাত!

আমাদের গল্পের যে নায়ক, অর্থাৎ খোকা-তিমি, নীলতিমি নয়, 'ডানা-তিমি'। তিম্যাদি কুলে এরা নৈকষ্য কুলীন নয়; দৈর্ঘ্য ও ওজন যদি কৌলিন্যের মাপকাঠি হয় তবে জীবজগতে এরা দ্বিতীয়। নীলতিমির পরেই এদের স্থান। নীলতিমির দৈর্ঘ্য হয় একশ ফুট, ওজন দেড়শ টন পর্যন্ত। ডানা-তিমির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য আশি ফুট, ওজন সওয়াশ টন। অন্যান্য বড় জাতের তিমি সেঙ্গী, কুঁজি, রাইট, বো-হেড, 'রাম-দাঁতল' প্রভৃতি, কী ওজনে, কী দৈর্ঘ্যে ঐ নীলতিমি বা ডানা-তিমির কাছাকাছি নয়। আর ছোট জাতের তিম্যাদি সাদা, রাক্ষুসে, ডলফিন, শুশুকেরা নেহাৎ চ্যাংড়া ওদের তুলনায়। যাক সেসব কথা না-হয় পরে আলোচনা করা যাবে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের খোকা-তিমি বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। এখন সে একা-একাই জলের উপর মাথাটা জাগিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে। নাক-বিকল্পের পর্দাটা এখন ঠিকমত খোলে, সময়মত বন্ধ হয়, সাঁতারটাও রপ্ত হয়েছে। ও বুঝতে শিখেছে, এর বগলের কাছে যে একজোড়া 'হাতডানা' আছে সে-দুটো কায়দামত নাড়তে পারলে ডাইনে বাঁয়ে বাঁক নেওয়া যায়। উল্টে যাওয়া ঠেকানো যায়। ও অবশ্য জানে না —ওর এক বহু দুরসম্পর্কের জ্ঞাতিভাই—সেই যখন দশ কোটি বছর আগে ওর পূর্বপুরুষ সমুদ্রে ফিরে গিয়েছিল, তখন তার যে-জাতভাই ডাঙায় রয়ে গেল—তারা ঐ হাতডানাটাকে এমন কাজে লাগিয়েছে যাতে নানান পুণ্যকর্ম আর দুষ্কর্ম করা যায়। সেই দূরসম্পর্কের জ্ঞাতিভাইয়ের কাছে ওটা হাতডানা নয়, হাত—তা দিয়ে তারা শুধু সেতারে দরবারী কানাড়া আর ক্যানভাসে মোনালিসাই আঁকে না, ঐ হাতের আঙ্গুল চালিয়ে তারা পিস্তল ছুঁড়ে জাতভাইকে হত্যা করে। তবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে ওদের হাতেডানায় অস্থির সংস্থান সেই অতি দূরসম্পর্কের জ্ঞাতিভাইয়ের হাতের মতই দশ কোটি বছরের বিবর্তন পাড়ি দিয়ে এসেও তাদের সাদৃশ্যটা খোয়া যায়নি।

মাসি ইতিমধ্যে ওদের ছেড়ে চলে গেছে। যেত না, কিন্তু ঘটনাচক্রে যেতে হল! হঠাৎ একটা পুরুষ ডানা-তিমি একদিন বেমক্কা এসে হাজির। মা-তিমিই মাসিকে যেতে বলল, বাচ্চাটার দেখ ভাল সে নিজেই করতে পারবে। মাসি প্রথমটায় দোনামনা করছিল, কিন্তু ইদানীং পুরুষ-তিমির সংখ্যা এতই কমে গেছে যে মাসি শেষমেশ এ সুযোগ ছাড়েনি।

মা-তিমি এ্যাদ্দিনে যেন বাচ্চাটাকে কে. জি. স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। একটু-একটু করে লেখাপড়া শিখুক। প্রথম পাঠ হল মাকে ঘিরে চক্কর মারা। মা এখন দৈর্ঘ্যে ওর চারগুণ। বাচ্চাটা মাকে ঘিরে পাক খেতে শিখল। গায়ে পা লাগবে না, দূরেও যেতে পারবে না, ক্রমাগত পাক মারতে হবে। দ্বিতীয় শিক্ষা হল ডাইভ দেওয়া এবং ভেসে ওঠা। খুব কঠিন অঙ্ক! নামতে হবে একেবারে খাড়া—কুয়োর দড়িতে বাঁধা বালতির মত; কিন্তু উঠতে হবে রয়েসয়ে, ত্যারচা হয়ে। কেন? কারণ আছে। পরে বুঝিয়ে বলব। বাচ্চাটা দিনকয়েকের মধ্যে সেটাও শিখে ফেলল। তিন নম্বর হোমটাস্ক সামনের দিকে শব্দতরঙ্গ ছুঁড়ে দেওয়া এবং সেটা ফিরে এলে সমঝে নেওয়া শব্দটা কোথায় ঘা খেয়ে ফিরছে। অর্থাৎ কান দিয়ে দেখা। তিমি যে জলের রাজা! রাজার ধর্মই হল কর্ণেন পশ্যতি! অবশ্য বাদুড় রাজা নয়, তবু কান দিয়েই শোনে। বস্তুত বাদুড় ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর শ্রুতি তিমির মত ভাল নয়। শব্দতরঙ্গের প্রতিঘাতে তিমি বুঝে নিতে পারে সামনে কী আছে। কত বড় জন্তু, তার গতি কোন দিকে, গতিবেগ কত। এমনকি বুঝতে পারে—সেটা মাছ, হাঙর অথবা রাক্ষুসে তিমি; অথবা ঐ নতুন জাতের আপদ জাহাজ!

প্রসঙ্গত বলি রাজামাত্রেই কিন্তু অন্ধ! কী জলের, কী দুনিয়ার! জলের রাজা তিম্যাদি, এখনই বলেছি 'শ্রুতি' দিয়ে দেখে। আকারে আর আয়তনে ডাঙার রাজা হাতি দেখে ঘ্রাণে। শুঁড়টা আকাশের পানে তুলে হাতি বুঝতে পারে মাইলখানেক দূরে যে-জীবটা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে জিরাফ, জলহস্তী, না মানুষ। আর জল-স্থল-অন্তরীক্ষের যে-রাজা, সে দেখে বুদ্ধি দিয়ে দূরবীনে, অনুবীক্ষণে, র‍্যাডারে, রেডিও মনিটারিং-এ। চোখ খুলে দেখে না, তাহলে রাজগিরি করতে চক্ষুলজ্জা হয় যে! যাক সে কথা—তিমি দেখে কান দিয়ে।

এক দিনের কথা বলি। খোকা-তিমির বয়স তখন মাসদেড়েক। এখন সে মাকে ছেড়ে একটু দুরে একা-একাই বেঙ্গী-বেঙ্গী যেতে সাহস পায়। আশপাশের জলদুনিয়াটাকে অবাক-শ্রুতিতে চিনে নিতে চায়। মা-তিমি আপত্তি করে না, অথচ সর্বদা সজাগ থাকে। মাঝে মাঝে শব্দতরঙ্গ ছেড়ে ঠাউরে নেয় খোকামণি কোথায়, কী করছে। সেদিন মা-তিমির একটু চটকা মতো এসেছে আর খোকা যেন লাল-জুতুয়া পায়ে দিক্‌বিজয়ে বেরিয়েছে। খোকা তিমি লক্ষ করেছে—ওর মাকে সবাই সমীহ করে চলে, পথ ছেড়ে যেন নয়ানজুলিতে সরে দাঁড়ায়। হাঙর, 'অষ্টাপদ', স্কুইড—সবাই। খোকনও হয়তো মনে-মনে ভাবত একদিনের জন্য বীরপুরুষ হবে—ফিরে এসে মাকে বলবে -

'ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে
ঢাল তরোয়াল ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমায় গায়ে দেবে কাঁটা।"

বেচারির ভাগ্যে সে সুযোগ আর কোনদিনই হয়নি। সেদিন খোকন তিমি একা-একাই রওনা দিয়েছে। একটু সামনে যেতেই হঠাৎ ওর কানে গেল অদ্ভুত শব্দ! কৌতূহলী খোকন আরও একটু এগিয়ে গেল। হঠাৎ দেখতে পেল একটা আজব কাণ্ড! একঝাঁক ম্যাকরেল মাছকে ঘিরে একটা থ্রেসার-হাঙর ক্রমে পাক খাচ্ছে। আসলে পাক খেতে-খেতে মাছের ঝাঁকটাকে সঙ্কুচিত পরিসরে বন্দী করছে। এভাবেই হাঙরে মাছ ধরে। মাছগুলো বিহ্বল হয়ে আথালিপাথালি ছুটছে আর তার দ্বিগুণ বেগে হাঙরটা পাক খেয়ে ওদের একত্র করছে। খোকা-তিমি ঐ দৃশ্য দেখে একেবারে অষ্টস্তব্ধ। থ্রেসার-হাঙর সে আগেও দেখেছে—চোখ দিয়ে নয়, শ্রুতিতে—মা চিনিয়ে দিয়েছে তার আওয়াজ। মায়ের সঙ্গে থাকলে থ্রেসার-হাঙর ওর ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। এখন তার মুখোমুখি পড়ে গিয়ে কী করবে ভেবে পেল না। ঠিক তখনই হাঙরটা ওকে দেখতে পেল। মাছগুলোর লগ্নে বৃহস্পতি। পরিত্রাণ পেল তারা। হাঙরটা তাদের ছেড়ে দিয়ে বন্দুকের গুলির মত সাঁই করে ছুটে এল ওর দিকে। প্রাণধারণের তাগিদে কাজ।

খোকা-তিমি প্রাণপণে ছুট লাগাল মায়ের দিকে। কিন্তু হাওরের সঙ্গে সাঁতারে পাল্লা দিতে পারবে কেন অতটুকু বাচ্চা? মুহূর্তমধ্যে হাঙরটা পৌঁছে গেল ওর কাছে। ধারালো দাঁতের একটা মর্মান্তিক কামড়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। খোকা-তিমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে। মাত্র দেড়মাস বয়সেই মৃত্যুকে দেখল মুখোমুখি--ব্যাদিতবদন হাঙরের মুখগহ্বরে! হাঙরটা ভারি খুশি! ম্যাকরেল মাছের চেয়ে অনেক ভালো শিকার জুটে গেছে বরাতজোরে। স্তন্যপায়ী জন্তুর তুলতুলে মাংস! মুখের গ্রাসটা গিলে নিয়ে আবার সে এগিয়ে আসে প্রকাণ্ড দাঁতাল হাঁ মেলে।

বেচারি! দ্বিতীয় গ্রাসের নাগাল পাওয়ার আগেই ঘটে গেল একটা অচিন্ত্যনীয় দুর্ঘটনা। একটা ভাসমান পর্বত রাজধানী এক্সপ্রেসের মত হুড়মুড় করে কোথা থেকে ছুটে এসে তাকে প্রচণ্ড ঢুঁ মারল। একশ টন ওজনের প্রভঞ্জনগতি জলদানবের সেই প্রচণ্ড 'ভরবেগে' মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল হাঙরটা।

মা-তিমি ছুটে এলেন সন্তানের কাছে। আলতো করে হাতডানা বুলতে থাকে ওর ক্ষতচিহ্নের উপর। বাচ্চাটা তখনও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কী আর করা? ওষুধ নেই, ব্যান্ডেজ নেই, লোনাজলে কাটা ঘায়ে যন্ত্রণা তো হবেই। যা পারে তাই করল। মা-তিমি তাড়াতাড়ি তার চালকুমড়ো-মাপের বোঁটাটা গুঁজে দিল বাচ্চাটার মুখে। দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের পরে গরম দুধটা কাজ করবে।

একপেট দুধ খেয়ে বাচ্চার গোঙানি থামল। কিন্তু তখনও সে কাতর। মা-তিমি তখন ওকে নিয়ে সিধে পশ্চিমমুখো চলতে থাকে। 'মহীসোপান' অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের দিকে। বলতে পার এটাও ওদের অহেতুক জন্মগত সংস্কার।

শুধু ডানা-তিমি নয়, সব জাতের তিমিই—যারা থাকে সমুদ্র উপকূল থেকে শত-শত সহস্র মাইল সমুদ্রের ভিতর, তারা অসুস্থ অথবা আহত হলেই অনিবার্যভাবে চলতে থাকে ডাঙার দিকে! কেন গো? তা জানি না। তিমি-বিজ্ঞানীরা অসংখ্য প্রমাণ পেয়ে এ তথ্যটা মেনে নিয়েছেন। কেন এমনটা হয় তা কিন্তু বিজ্ঞান আজও বলতে পারেনি।

বিজ্ঞান যেখানে মূক, দর্শন সেখানে এগিয়ে আসে। কথা সাহিত্যে একটা রূপ দেবার চেষ্টা করে। আমার তো মনে হয়েছে--না, কোন বই পড়ে নয়, নিজের চিন্তাতেই মনে হয়েছে এটাও ওদের জন্মগত সংস্কার। ওদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে দশ কোটি বছর আগেকার একটা বিস্মৃতপ্রায় আকুতি, একটা অবচেতনিক অভিজ্ঞতা। যখন ওরা ডাঙার ছিল। সেই সমুদ্র- মেখলা শ্যামল ভূখণ্ডই যে ওদের আদি বাসভূমি। দুঃখের দিনেই তো মনে পড়ে সাতপুরুষের ভিটের কথা! সমুদ্রকে ওরা ঘর করেছে, তবু মৃত্যুর মুখোমুখি হলে তারাও বুঝি মনে মনে মাটির জন্য কাঙাল হয়ে ওঠে:

"হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌন মুখ
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দ-ভবন
শ্যামল-কোমলা! যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ অয়ি মুগ্ধে কি বিপুল টানে
দিগন্ত বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ পানে।'

মা-তিমি তার আহত সন্তানকে নিয়ে সেই উপকূল ভাগের দিকে চলতে থাকে।

দাঁতাল তিমি

জীবের বংশতালিকায় দেখছি, জলচর প্রাণীর মধ্যে তিমি ও তিম্যাদি প্রাণী আমাদের সবচেয়ে নিকট-আত্মীয়। যাবতীয় মৎস্যকুলের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক অনেক দূরের। আজ থেকে তের-চোদ্দ কোটি বছর আগে—সেই যখন জুরাসিক যুগের শেষে অতিকায় স্টেগসরাস -ডিপ্লোডকাস-ইগুয়ানোডন-টেরডেকটিলদের দল পৃথিবী থেকে বিদায় নিল তখনই আদিম স্তন্যপায়ী জীবের একটি শাখা সমুদ্রে ফিরে গিয়েছিল। ফিরে গিয়েছিল' কেন বললাম? বাঃ! জীবের আদি জন্ম তো সমুদ্রেই। এই পৃথিবী নামক সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহে আদিম প্রাণী উদ্ভিদরূপে জন্ম নেয় সমুদ্রের বুকেই—কেউ বলে সত্তর-আশি কোটি বছর আগে, কেউ বলে তার চেয়েও আগে। সেই আদিম সামুদ্রিক উদ্ভিদ ডাঙায় এসে বিবর্তিত হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। আদিমতম জলচর জীব থেকেই বিবর্তিত হয় উভচর জীব, সরীসৃপ, ক্রমে স্তন্যপায়ী স্থলচর প্রাণী। ফলে তাদের একটি শাখা যদি আবার সমুদ্রে যায়, তবে তাকে 'ফিরে যাওয়াই' তো বলব। সে যাই হোক, স্তন্যপায়ী জীবের যে-শাখাটি ডাঙ্গায় রয়ে গেল তাদের বংশাবতংস থেকে কালে বিবর্তিত হল নানান জাতির স্থলচর স্তন্যপায়ী জীব— স্টেগডন-ম্যাস্টডন-ম্যামথের পথে হাতি, রামাপিথেকাস-হোমোইরেকটাস-পিকিং ম্যানের পথ বেয়ে এল মানুষ আর স্তন্যপায়ী জীবের যে-শাখাটি সমুদ্রে ফিরে গেল তাদের বংশে জন্ম নিল জলচর স্তন্যপায়ী নানান জীব তিম্যাদি আর তার জ্ঞাতিভাইরা।

'তিম্যাদি' বর্গের দুটি উপবর্গ 'দাঁতাল' আর 'ঝিল্লিমুখো'।

দাঁতাল তিমির মোটামুটি চারটি 'গোত্র'। রামদাঁতাল, ঠোঁটওয়ালা, সামুদ্রিক ডলফিন আর নদীর ডলফিন! প্রতিটি গোত্রের অনেকগুলি করে উপগোত্র এবং গণ আছে। কিন্তু আমরা তো আর জীববিজ্ঞানের পরীক্ষার পড়া করছি না—অত বিস্তারিত আমাদের না জানলেও চলবে। শ্রাদ্ধবাসরে পুরোহিতমশাই যখন বৃদ্ধ প্রমাতামহের নাম জিজ্ঞাসা করেন, তখন যা করি তাই করব 'যথাসম্ভব গোত্রনামে' বলে ম্যানেজ করে নেব।

তাহলে দাঁতাল তিমির শ্রেণীবিভাগটি মোটামুটি এইরকম দাঁড়াল:-

দাঁতাল তিমি (উপবর্গ)			
রামদাঁতাল	**ঠোঁটওয়ালা**	**সামুদ্রিক ডলফিন**	**নদীর ডলফিন**
ক্ষুদ্র রামদাঁতাল বৃহৎ রামদাঁতাল	ভাসমান ক্যুভিয়ের বোতলনাসা	সাদা তিমি শূলনাসা পরপয়েজ ডলফিন রাক্ষুসে তিমি	গাঙ্গেয় শুশুক আমেজন ডলফিন চীনা ডলফিন

এদের মধ্যে রামদাঁতালই হচ্ছেন নৈকষ্যকুলিন —আকারে ও ওজনে। দৈর্ঘ্যে ষাট ফুট পর্যন্ত হয়। অন্যান্য সবগুলি চার ফুট থেকে বিশ ফুট।

রামদাঁতালের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য সবারই মুখটা সূঁচালো, এদের মুখটা থ্যাবড়া। নিচেকার চোয়াল অপেক্ষাকৃত সরু। বিশ্বসাহিত্যে বিখ্যাত মবি ডিক এই রামদাঁতাল জাতের তিমি। আকৃতি ছাড়া প্রকৃতিতেও কিছুটা পার্থক্য আছে। অন্যান্য

জাতের তিমি মোটামুটি জোড়া বেঁধে বাস করে—নীল ও ডানা-তিমির দাম্পত্য একনিষ্ঠা তো বিস্ময়কর ---পুরুষ রামদাঁতাল সেদিক থেকে ডন জুয়ান-ধর্মী। মাদী রামদাঁতাল এবং বাচ্চারা মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করে----বলা যায় ৪০° অক্ষাংশ উত্তর থেকে ৪০° অক্ষাংশ দক্ষিণ বলয়ের মধ্যে। মহিলা ও বাচ্চাদের ঐ না-গরম না-ঠাণ্ডা অন্দরমহলে রেখে কর্তারা হামেহাল পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ট্যুরে বের হন—-একেবারে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু তক। বলা বাহুল্য ট্যুর থেকে ফিরে এসে নিজ পরিবারের আর সন্ধান পান না। ভিড়ে যান অন্য পরিবারে, অন্য কোন সহধর্মিণীর সঙ্গে জোড় বাঁধেন, যাবৎ দ্বিতীয় ট্যুরে না-যাচ্ছেন। রামদাঁতালের গতিবিধি ও আচার-ব্যবহার বিষয়ে জীববিজ্ঞানীরা এখনও স্থিরনিশ্চয় হতে পারেননি। এখনও যথেচ্ছভাবে এদের শিকার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দেখছি, চিলি ও পেরু ভাঞ্চলে এই জাতের মাদী তিমি বেশি সংখ্যায় ধরা পড়েছে। রামদাঁতালের গোত্রভুক্ত আর এক জাতের তিমির নাম বামন রামদাঁতাল বা ক্ষুদে রামদাঁতাল।

রামদাঁতাল = SPERM WHALE

‘চলন্তিকা' বলছে 'বৃহৎ’-অর্থে 'রাম' প্রয়োগ হয়—সেজন্যই দাঁতাল কুলের ঐ বৃহৎ স্পার্ম হোয়েলের নাম দিয়েছিলাম রামদাঁতাল; এখন বুঝতে পারছি নামকরণটা খুব জুতের হয়নি। ‘ক্ষুদে রামদাঁতাল' শব্দটা সোনার পাথরবাটির মত শোনাচ্ছে। কিন্তু উপায় কী? এই ক্ষুদে রামদাঁতালকে দেখতে হুবহু রামদাঁতালের মত---অনেক সময়ে অশিক্ষিত তিমি-শিকারী এদের রামদাঁতালের অপরিণত বাচ্চা বলে ভুল করে—কারণ পূর্ণাবয়ব ক্ষুদে রামদাঁতাল দৈর্ঘ্যে মাত্র তের-চোদ্দ ফুট হয়। এদের সারা পৃথিবীতেই দেখতে পাওয়া যায়।

রামদাঁতালের আর-এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের খাদ্য। ঝিল্লিমুখোরা অধিকাংশই ক্রিলভোজী। অপরপক্ষে রামদাঁতালের প্রধান খাদ্য হচ্ছে স্কুইড 'আর ‘অষ্টাপদ'। কেমন করে জানলাম? সেকথা সত্যি। জীববিজ্ঞানী কেমন করে জানতে পারেন—কোন্ জাতের তিমি সমুদ্রগভীরে সিঙ্কিং-সিঙ্কিং কী ভক্ষণ করছেন! আসলে শিকার-করা তিমির পেট চিরে যে-ধরনের খাদ্যাংশ পাওয়া যায় তা থেকেই এই অনুমাননির্ভর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। একটি খতিয়ান আপনাদের সামনে পেশ করছি। বিভিন্ন তিমি-শিকারীদের প্রেরিত ২৬৮৫ টি মৃত তিমির পেট কেটে যে-তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তা তালিকাকারে সাজিয়ে দিই:-

জাতি	মোট সংখ্যা	পেটের ভিতর কী পাওয়া গেছে			
		ক্রিল	স্কুইড	সার্ডিন (মাছ)	অক্টোপাস (অষ্টাপ
ঝিল্লিমুখো:					
নীলতিমি	৫২	৫০	১	১	০
ডানাতিমি	৪১৩	৪১০	২	১	০
সেঙ্গীতিমি	৬৮২	৩৬৭	১৪৫	১৬৮	২
দাঁতাল					
রামদাঁতাল	১৫৩৮	২	১৫১৩	৪	১৯

এ থেকে আপনি নিজেই কি এই সিদ্ধান্তে আসবেন না ঝিল্লিমুখো তিমির প্রধান খাদ্য ক্রিল; যদিও সেঙ্গী-তিমি সেই হ-য-ব-র-ল-এর খাদ্যবিশারদ ব্যাকরণ শিঙের মত অন্যান্য খাদ্যও মাঝে-মাঝে পরখ করে দেখে থাকে। অপরপক্ষে রামদাঁতালের প্রধান খাদ্য স্কুইড। অক্টোপাসও খায়।

এ-ও এক অবাক কাণ্ড! স্কুইড জীবটি আকারে বড় কম নয়—ওদের একটি জাতি, দানবস্কুইড বা জায়েন্ট-স্কুইড দৈর্ঘ্যে তিমির কাছাকাছি। বস্তুত নীলতিমি ছাড়া দৈর্ঘ্যে কেউ তাকে হারাতে পারে না। প্রসঙ্গত 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লীগস আন্ডার দ্য সী' উপন্যাসে ক্যাপ্টেন নিমোর ডুবোজাহাজ 'নটিলাস্'-এর সঙ্গে অমন একটি দানব-স্কুইডের লড়াইয়ের বর্ণনা আছে। সিনেমাটা দেখা থাকলে হয়তো আপনাদের মনে পড়বে। রামদাঁতাল অবশ্য জায়েন্ট-স্কুইড ভক্ষণ করতে পারে না তবে যা খায় তার দৈর্ঘ্য ওর দেহের বার আনা অংশ। একটি ছেচল্লিশ ফুট লম্বা রামদাঁতালের পেট চিরে চৌত্রিশ ফুট লম্বা স্কুইডও পাওয়া গেছে। এ যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি!

ঠোঁটওয়ালা তিমি:- দৈর্ঘ্যে পনের থেকে বিশ ফুট লম্বা হয়। মূল বৈশিষ্ট্য ওর তুণ্ড। গত শতাব্দীর শেষাশেষি এই জাতের তিমি বার্ষিক দু'তিন হাজার ধরা পড়ত। এখন সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। ১৯৬৫ সালে ধরা পড়েছে মাত্র সাত'শ। অনুমান হয়—এদের সংখ্যা বর্তমানে খুব কমে গেছে। যথেষ্ট সংখ্যায় আত্মদানের সৌভাগ্য যে ওরা অর্জন করতে পারছে না সেটাই তার একমাত্র কারণ!

সামুদ্রিক ডলফিন:- এই গোত্রভুক্ত জীবের অনেকগুলি গণ আছে। আকারে কেউই বিশাল নয়। কয়েকটিকে সামুদ্রিক জীবাগারে রাখা হয়েছে। 'সামুদ্রিক জীবাগার' শব্দটা 'ওশানিয়ামের' খুব ভালো বাংলা অনুবাদ হল না অবশ্য। তবে Zoo-এর বাংলা যখন চিড়িয়াখানা তখন এ অনুবাদটাকেও ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেওয়া যেতে পারে। 'এ্যাকোয়ারিয়ামে' যেমন মাছ থাকে, 'ওশানিয়ানে' তেমন রাখা হয় ডলফিন, পরপায়েজ এবং রাক্ষুসে তিমিদের। তারা পোষ মানে। একই কৃত্রিম চৌবাচ্চায় খাদ্য-খাদক, অর্থাৎ ডলফিন ও রাক্ষুসে তিমি অনায়াসে খেলা দেখায়।

সামুদ্রিক ডলফিনের একটা গণ হচ্ছে: সাদা তিমি। দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠার বিশ ফুট। জন্মের সময় কালচে নীল হলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের গায়ের রঙ হলদেটে হতে শুরু করে। চার-পাঁচ বছর বয়সে একেবারে ধপধপে সাদা হয়ে যায় শ্বেতহস্তী কেন বর্মা-মালয়ে পাওয়া যায় তার কোন যুক্তিনির্ভর হেতু আমি খুঁজে পাইনি—শ্বেত ভল্লুক ও সাদা বাঘ কেন তুষারাবৃত অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ বুঝি৷ একই কারণে জীববিবর্তনের পথে উত্তরমেরু অঞ্চলের এক জাতির তিম্যাদি কেমন করে কয়েক লক্ষ বছরে সাদা হয়ে গেল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না---যাতে পারিপার্শ্বিকের শুভ্রতার সঙ্গে

ওদের গায়ের রংটা মিশে যায়। উত্তরমেরু সাগরে থাকে বটে তবে ওবি-এনেসি-লেনা প্রভৃতি যেসব নদী উত্তর সাগরে পড়েছে তাদের মোহনা থেকে এরা দল বেঁধে কখনও-কখনও হাজার-দেড় হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত নদীপথে দেশের ভিতরে চলে আসে।

শূলনাসা: দৈর্ঘ্যে পনের ফুট পর্যন্ত হয়। প্রধান বৈশিষ্ট্য নাকের উপর বিরাট বল্লম, যেটি লম্বায় সাত-আট ফুট পর্যন্ত হয় শূলটা কঠিন, পাকানো এবং এর আঘাতে ওরা হাঙরের পেট ফুটো করে দেয়। ইংরাজিতে এর নাম ‘নারওয়াল'। বৈজ্ঞানিক নামটা monodon—অনুবাদে যা হওয়া উচিত ছিল ‘একদন্তী'; কিন্তু ও নামটা আগের এক গ্রন্থে খরচ করে বসে আছি। পূর্ব প্রকাশিত 'গজমুক্তা'য় যে-হাতির বাঁদিকের দাঁতটা ভেঙে গিয়ে শুধু ডানদিকের দাঁতটা আছে তার নাম দিয়েছিলাম 'গণেশ' এবং যার ডানদিকের দাঁতটা ভেঙে শুধু বাঁদিকেরটা অবশিষ্ট আছে তাকে বলেছিলাম একদন্তী। ফলে একে নাম দেওয়া গেল শূলনাসা।

'পরপয়েজ' ও 'ডলফিন' বলতে সাধারণ মানুষ একই জীবকে বোঝে—-যেমন ‘এলিগেটার' আর ‘ক্রোকোডাইল'-এর তফাৎটা অনেকে জানেন না। জীববিজ্ঞানীদের কাছে ওদের পার্থক্য আছে। ডলফিন সাধারণত আকারে কিছু বড় ওদের মুখটা সূঁচালো, দেহ--সরলীকৃত সাবলীল, যাকে বলে ‘স্ট্রিম লাইনড'। পরপয়েজদের নাক থ্যাবড়া, ডলফিনের মত ঠোঁট নেই। হাতডানাতেও তফাৎ আছে। ডলফিনের হাতডানা সূঁচালো, পরপয়েজদের গোলাকৃতি। পিঠের উপর যে-ডানা, যাকে বলে 'ডরসাল ফিন' সেখানেও প্রভেদ আছে। ডলফিনদের ক্ষেত্রে সেটা বেশি সূঁচালো। সে যাই হোক, আমরা অত সূক্ষ্ম বিচারে না-গিয়ে ডলফিন ও পরপয়েজদের বিষয়ে একত্রেই আলোচনা করি।

ডলফিন: আকারে ডলফিন বা পরপয়েজরা বড় জাতের তিমির তুলনায় নেহাৎ শিশু — কিন্তু ভারে নয়, এরা ধারে কাটে। ডলফিন জীবজগতে এক পরম বিস্ময়:

পরপয়েজ

ডলফিন

শুলনাসা = নারওয়াল

জীবকুলে দৈহিক বৃদ্ধিতে সবার সেরা যদি নীলতিমি, তাহলে মনুষ্যেতর স্কুলে বুদ্ধিমত্তায় ক্লাসের ফার্স্ট বয় হচ্ছে 'ডলফিন' তার মস্তিষ্কের ওজন মানুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মস্তিষ্কের ওজন নয়, দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্ক-ওজনের অনুপাতটাই নাকি সেই জীবের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। একটি গড় মানুষের ওজন যদি হয় দেড়শ পাউন্ড তাহলে দেখা গেছে তার মস্তিষ্কের গড় ওজন হচ্ছে তিন পাউন্ড। অর্থাৎ অনুপাতটা দাঁড়াল ০.০২। ডক্টর জন লিলি তাঁর গবেষণা-প্রসূত সংবাদে জানাচ্ছেন একটি ডলফিনের ওজন তিনশ পাউন্ড হলে দেখা গেছে তার মস্তিষ্কের ওজন হয় ৩. অনুপাতটা হল ০.০১২। এ্যালসেশিয়ান কুকুর, হাতি, ঘোড়া, বানর ইত্যাদি যারা বুদ্ধিমান জীব বলে পরিচিত তাদের ক্ষেত্রে ঐ অনুপাতটা অনেক কম। বিখ্যাত জীৱবিজ্ঞানী জে. বি. স্কট এ বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রথমে তাঁর ভাষাতেই শোনাই— যাতে আপনারা না মনে করেন, অনুবাদ করতে গিয়ে উচ্ছ্বাসের মাথায় অতিশয়োক্তি করছি "Some marine biologists believe that porpoise may have a higher potential IQ than man, they have never had to develop it because they are so perfectly adapted to their environment. What could happen if they ever did develop their brain power is limited only by the imagination. If the porpoise's brain proves as complex and as competent as some believe, it is possible that man one day will talk to and understand another species for the first time.

অর্থাৎ, "সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন ডলফিনদের আই-কিউ উন্নত করার সম্ভাবনা মানুষের চেয়েও বেশি। কিন্তু যেহেতু ওরা ওদের পরিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিখুঁতভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তাই মস্তিকটা উন্নত করার কোন প্রয়োজনই ওরা বোধ করেনি। করলে কী হত সেটা কল্পনার বিষয়। ওদের ঐ বৃহদায়তন মস্তিষ্ক যদি বিকশিত অবস্থায় নবরূপ গ্রহণ করতে পারে তাহলে অনেকে মনে করেন মানুষকে তার সমপর্যায়ের আর এক জীবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সমঝোতার আসতে হবে। "

ডলফিন অথবা পরপয়েজাদের বিশ পঁচিশটা প্রজাতি আছে লম্বায় এরা আট থেকে দশ ফুট, ওজন দুশ থেকে তিনশ পাউন্ড। মানুষের বাচ্চার মত জন্মমুহূর্তে এর নিদন্ত— কয়েক সপ্তাহ পরে ওদের দাঁত ওঠে। এক এক চোয়ালে প্রায় পঞ্চাশটা ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁত। স্তন্যপায়ী; মায়ের দুধ খায় প্রায় দেড় বছর। তারপর মাছ-টাছ। প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য ব্রহ্মতালুর উপর একটা 'নাক-বিকল্প' আছে। আধখানা ভাঙা চাঁদের মত। এই প্রসঙ্গে বলি, 'নাক-বিকল্পে'র গঠন দেখেই ঝিল্লিমুখো, দাঁতাল এবং ডলফিনদের জাত নির্ণয় করা যায়।

সে যাই হোক, ডলফিনের ঐ আবখানা ভাঙা চাঁদের মত নাক-বিকল্প। খোলা-বন্ধ করার জন্য একজোড়া ঠোঁটও আছে জলের নিচে ডুব দেওয়ার সময় ঠোঁটজোড়া আপনিই সেঁটে যায়। ডলফিন কথা বলে, মানে শব্দ করে—মুখ দিয়ে নয়, ঐ নাক-বিকল্পের ঠোঁট নেড়ে। ওদের চোখ অনেকটা মানুষের চোখের মত—অক্ষিগোলকের কোটরে সেটা নড়াচড়া করতে পারে। অর্থাৎ প্রয়োজনে তির্যক কটাক্ষবাণ নিক্ষেপে সমর্থ—যা মানুষ ব্যতিরেকে অধিকাংশ জীবই পারে না। সবচেয়ে অবাক করা খবর ওদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রখরতা। স্থলচর, জলচর, নভোচর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে শ্রবণশক্তির প্রতিযোগিতায় ব্র্যাকেটে ফার্স্ট-বাদুড়ের সঙ্গে। এমন যে বুদ্ধিমান জীব মানুষ সে পর্যন্ত শ্রুতির প্রতিযোগিতায় লড়তে গিয়ে তার যাবতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম-সমেত ওদের কাছে হেরে গেছে। এই ইলেকট্রনিক যুগেও মানুষ সমুদ্রগর্ভে শব্দগ্রাহক যন্ত্রে যেসব শব্দতরঙ্গ ধরতে পারে না ডলফিনরা তা শোনে, বিশ্লেষণ করে, বোঝে! কথাটা বলেছেন ফ্লোরিডা-স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য

ডক্টর ডবলু কেল্‌জ। তাঁর মতে শ্রবণযন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান আজও বলতে পারে না যে-বস্তুতে প্রতিহত হয়ে শব্দতরঙ্গ ফিরে এল সেটা কী জাতের বস্তু—তা জাহাজ, ডুবোজাহাজ, ডুবোপাহাড়, ভাসমান মাইন, না তিমি। শুধু বলতে পারে--এই দিকে, এত দূরে বিশালায়তন কোন একটা কিছু আছে! সেটা সজীব কি নিষ্প্রাণ, গতিশীল কি স্থির তা বলতে পারে না। অপর পক্ষে ডলফিন তার ঐ ৩.৭ পাউন্ড ওজনের মস্তিষ্কের 'শ্রবণযন্ত্রে' বেমালুম বুঝে নেয়—এটা হাঙর, রাক্ষুসে তিমি, না খাদ্যজাতীয় কোন বস্তু অথবা স্বজাতীয় জীব। বুঝতে পারে, সেটা কোন দিকে যাচ্ছে, কত গভীরে, কত গতিবেগে!

কৃত্রিম জলাশয়ে বন্দী করে মানুষ ও-দেশে ডলফিনদের দিয়ে নানান কসরং দেখায়। সেটা আর এমন কী অবাক করা খবর? ওর চেয়ে অনেক কম বুদ্ধিমান জীব—হাতি, ঘোড়া, কুকুর মায় টিয়াপাখিতেও তো সার্কাসে খেলা দেখায়। ওদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বিস্ময়কর সংবাদ হল এই যে, ওরা জন্মগতভাবে মানুষের বন্ধু। জীবজগতে এ এক বিচিত্র ব্যতিক্রম! আর কোন প্রাণী জন্মগতভাবে মানুষের বন্ধু নয়। বলতে পারেন, গরু-ঘোড়া-কুকুরও কি মানুষের বন্ধু নয়? আমি বলব না, প্রজাতিগতভাবে নয়। বংশ-পরম্পরায় যেসব পোষমানা গৃহপালিত জীব মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, মনুষ্যসভ্যতার বাতাবরণে যার বাপ-মা ঠাকুর্দা- বুড়ো ঠাকুর্দা বেড়ে উঠেছিল, তারা এই দ্বিতীয় জাতের জন্মগত সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের বাচ্চা জন্ম থেকেই মানুষের সাহচর্য কামনা করে, কারণ বেশ কয়েক পুরুষ ধরে সেই প্রবৃত্তিটা এর দ্বিতীয় জাতের সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে — মনুষ্যসভ্যতার আওতার বাইরে যারা আছে, বংশানুক্রমিক ভাবে আছে, সেই জাতের বুনো-ঘোড়া, বুনো-গরু, বুনো-ডিংগো কুকুর মানুষকে ভয় পায়, শত্রু হিসাবে দেখে, ডলফিন তা দেখে না তফাৎটা ঐখানেই। সারাজীবন যে-ডলফিন মানুষ দেখেনি, যার বাপ-মা-চোদপুরুষ মনুষ্যসভ্যতার ধারেকাছে আসেনি সেও মানুষের মিতালি চার কেন?

কয়েকটা উদাহরণ দিই। 'কেন'র জবাবটা আপনারাই দেখুন। বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রবিহারী নাবিকদের মধ্যে একটা কথার প্রচলন ছিল—-পথহারা জাহাজকে নাকি ডলফিনেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পথ দেখিয়ে নিরাপদ বন্দরে পৌঁছে দেয়! আর পাঁচটা গাল-গল্পের মত এ কিংবদন্তিও বিজ্ঞান বিশ্বাস করত না। কিন্তু পরে এটা নিছক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামুদ্রিক ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলের একটি ডলফিন। তার নামকরণও করা হয়েছিল পোলোরাস জ্যাক। আন্দামান নিকোবরের মত নিউজিল্যান্ড ও দুটি দ্বীপ—দুই দ্বীপের মাঝখানে সংকীর্ণ প্রণালীটা ডুবোপাহাড়ে ভর্তি! উত্তর দ্বীপের ওয়েলিংটন বন্দর থেকে দক্ষিণ দ্বীপের নেলসন বন্দরে আসতে হলে তাই নাবিকদের গোটা দ্বীপটা পরিক্রমা করতে হত। মাত্র কয়েক মাইল দূরের এই কর্মব্যস্ত দুটি বন্দরের মধ্যে যোগাযোগের কোন বিকল্প ব্যবস্থা অসম্ভব —ঐ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করতে হলে ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজডুবি হওয়ার আশঙ্কা। এই সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করে ঐ অজ্ঞাতনামা ডলফিনটা নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। বিসর্পিল পথে ডুবোপাহাড় এড়িয়ে সে নাকি জাহাজগুলোকে ক্রমাগত ঐ প্রণালীটা পারাপার করিয়ে দিত। প্রথমটা জীববিজ্ঞানীরা এ কথা বিশ্বাস করেননি। শেষে নাবিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাদের একটি দল এলেন। সরেজমিনে ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে। দেখলেন, জাহাজটা প্রণালীর কাছাকাছি এসে বারকয়েক সিটি দিল—একটু পরেই ডলফিনটা এগিয়ে এসে অদূরে ঘাই দিতে শুরু করল। তারপর পথপ্রদর্শকের মত সে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলল সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে। সেদিনই তার নামকরণ করা হল পোলোরাস জ্যাক।

অকল্যান্ড প্রণালী

প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর ধরে জ্যাক এভাবে পথপ্রদর্শকের কাজ করে গেছে। ঘটনা বর্তমান শতাব্দীর একেবারে প্রথমে। বস্তুত ১৯০৪ সালে নিউজিল্যান্ড-সরকার একটি আইন জারি করলেন--ঐ জ্যাক হচ্ছে জাতীয় সম্পত্তি। তাকে বধ করা বা বিরক্ত করা অপরাধ

১৯১২-র পর তাকে আর দেখা যায়নি। সরকারীভাবে জানানো হয়েছে অজ্ঞাত কারণে কে বা কারা জ্যাককে গোপনে হত্যা করে।

প্রামাণিক গ্রন্থে পোলোরাস জ্যাকের মৃত্যুর কারণটা খুঁজে পাইনি। কিন্তু অসমর্থিত তথ্যটা হচ্ছে এই রকম ১৯১২ সালে চার-চারটি নরউইজিয়ান তিমি-শিকারী জাহাজ নোঙর গাড়ে ওয়েলিংটনে। ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সরকারের আর একটি তিমি-শিকারী কোম্পানির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর রেষারেষি ছিল। একদিন ঐ নরউইজিয়ান কোম্পানির একটি জাহাজ থেকে একজন ডাচ নাবিক মত্তাবস্থায় পোলোরাস জ্যাককে নাকি গুলি করে। কেউ বলে গুলিতে জ্যাক মারাত্মকভাবে আহত হয়, কেউ বলে আঘাত সামান্যই। মোট কথা, পোলোরাস জ্যাক প্রাণে বেঁচে যায়। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ায় নিউজিল্যান্ড সরকার একটা তদন্ত কমিশন বসাবার প্রস্তাবও করেন--কারণ পোলোরাস জ্যাক ছিল জাতীয় সম্পত্তি, তাকে গুলি করা নিতান্ত বেআইনি কাজ প্রথমে সকলের ধারণা হয়েছিল গুলি খেয়ে জ্যাক মারা গেছে—কারণ পরদিন থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। অবস্থা যখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে, তখন আবার একদিন দেখা গেল জ্যাক ফিরে এসেছে। ওয়েলিংটন বন্দরের সমুদ্রসৈকতে জল থেকে মাথা তুলে দুই হাতডানায় তালি বাজাচ্ছে। সবাই খুশি হল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

এ পর্যন্ত গল্পটা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না; কিন্তু যে-তথ্যসূত্র থেকে এই কিংবদন্তি রচনা করছি তাঁরা এর পর যা বলেছেন তা প্রায় অবিশ্বাস্য! এরপর থেকে নাকি

পোলোরাস জ্যাক আর পাঁচটা জাতির জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত—শুধুমাত্র ঐ নরউইজিয়ান কোম্পানির চারখানি জাহাজ ছাড়া। অন্য যে-কোন জাহাজ তা যাত্রীবাহী, মালবাহী, তিমি-শিকারী যাই হোক না কেন—প্রণালীর কাছাকাছি এসে ভোঁ দিলেই জ্যাক ছুটে আসত, জল থেকে দেহখানা তুলে হাতডানায় তালি বাজাত। তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে। অথচ ঐ নরউইজিয়ান জাহাজ চারখানার আহ্বানে সে সাড়া দিত না!

তদন্ত কমিশন বসেনি, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের স্বতঃপ্রণোদিত সাক্ষ্যে নাকি নরউইজিয়ান কোম্পানির মাথা হেঁট হয়ে গেল। এরপর যা ঘটবার তাই ঘটল ২০ এপ্রিল, ১৯১২ সালে গুলিবিদ্ধ জ্যাক সলিল সমাধি লাভ করে।

এই কিংবদন্তির রচয়িতা এটাকে সত্য ঘটনা বলেই লিখেছেন, যদিও নিউজিল্যান্ড সরকারের সমর্থন এতে নেই এই কাহিনী মেনে নিলে আমাদের মনে দু-দুটো প্রশ্ন জাগে প্রথম কথা—যে-জাহাজ থেকে জ্যাককে গুলি করা হয়েছিল সেই জাহাজটাকে তার পক্ষে হয়তো সনাক্ত করা সম্ভব, কিন্তু একই কোম্পানির আর-তিনখানি জাহাজকে সে কেমন করে চিনত? নরওয়ে সরকারের ফ্লাগ তো তার চেনার কথা নয়, তার তো রঙের বোধ নেই দ্বিতীয় কথা—-অতই যদি বুদ্ধি ধরে তাহলে কেন তির্যক পথে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল না! সে তো অনায়াসে তার শত্রু জাহাজকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খাওয়াতে পারত। তা সে করল না কেন? সে তো গান্ধিজীর অহিংসা অসহযোগ' বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েনি। তাহলে কি ধরে নেব মানুষের শত্রুতা করার ইচ্ছা তার জন্মাতেই পারে না? প্রজাতিগত সংস্কার?

আমার পরামর্শ এসব সিদ্ধান্তে আসবেন না। এ ঘটনার সত্যতা বিজ্ঞান স্বীকার করেনি। যদিও সংবাদ পরিবেশনকারী বলেছেন এ তথ্য আদ্যন্ত সত্য, তবু আমরা তা গ্রহণ করতে পারছি না। প্রসঙ্গত জানাই, বছর চার-পাঁচ আগে দেবসাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত শারদীয় সংকলনে একটি 'সত্য ঘটনা' ছাপা হয়েছিল—লেখক একটি বিদেশী তথ্যের সাহায্যে ঐ তথাকথিত 'সত্য ঘটনা' কাহিনীর আকারে প্রকাশ করেন। এক ধীবরকে একবার একটা তিমি আস্ত গিলে ফেলে এবং পরদিন সেই তিমিটিকে শিকার করার পর তার পেট চিরে মানুষটিকে উদ্ধার করা হয়। তখনও সেই মানুষটি জীবিত ছিল এবং তাকে চিকিৎসা করে বাঁচানো হয়। অতঃপর প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দিতে তিমির জঠরে সে কী জাতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তার বর্ণনা আছে। তিমিটি কী জাতের তা অবশ্য লেখক বলেননি।

বিজ্ঞান এ তথ্য মেনে নিতে পারে না। তিমির কণ্ঠনালী এত সরু যে একটি মানুষ যদি তার ভিতর দিয়ে আদৌ গলে যায় তবে জীবিত অবস্থায় যেতে পারবে না— যেমন অজগরের পেটে কোন খরগোশ জীবিত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত লেখক ধরে নিয়েছেন তিমির জঠরে অক্সিজেন আছে; তা নেই। থাকলে জন্তুটা জলে ডুব দিতে পারত না। বাতাসের ঊর্ধ্বচাপে, বয়েন্সিতে, সে কিছুতেই অত গভীরে যেতে পারত না। ফলে এ জাতীয় গালগল্প 'সত্য ঘটনা' বলে কিশোর পত্রিকায় ছাপাটা আপত্তিকর।

মূল লেখক বাইবেলের 'জোনহা'র উপাখ্যানের প্রভাবে ভারসাম্য হারিয়েছেন এমন মনে করা যায়। বাইবেল-বর্ণিত জোনহা তিমির পেটে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে জ্যান্ত ফিরে এসেছিল। সে যাই হোক, 'পোলোরাস জ্যাক" তো অনেকদিন আগেকার কথা, আর একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা শুনুন। এটিও প্রামাণিক গ্রন্থের সমর্থিত সন্দেশ। বলছেন ফ্লোরিডা উপকূলের এক স্নানার্থিনী: "আমি সাঁতার জানি না; মাজা জলে দাঁড়িয়ে সমুদ্রস্নান করছিলাম আমার স্বামীর সঙ্গে। স্নান করতে গিয়ে যেমন হয়—ঢেউ-এ ঢেউ-এ আমি কিছুটা দূরে সরে এসেছি। ঘাটে আরও অনেক লোক আছে। যদিও আমার পাঁচ-সাত হাত দূরে কেউ ছিল না। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত বড় ঢেউ-এ আমার পদস্খলন

হল। ঢেউটা সরে যেতে যেই দাঁড়াতে গেছি দেখি পায়ের তলায় মাটি নেই। তার মানে, ঢেউ-এর ধাক্কায় আমি ডুবজলে চলে গেছি! আমার স্বামী তখন বেশ কিছুটা দূরে আমার কাছেপিঠেও কেউ নেই। তবু মৃত্যুভয়ে সংস্কারবশে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। আমার স্বামী শুনতে পেলেন না। কেউই শুনতে পায়নি সামুদ্রিক ঝোড়ো হাওয়ায় আমার আর্তনাদ ভেসে গেল। মৃত্যুকে দেখলাম মুখোমুখি সেই মুহূর্তটির বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষার দখল আমার নেই। অনিবার্য সলিলসমাধি থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম নিতান্ত অলৌকিকভাবে। না, ভুল বললাম- অলৌকিক নয়। সমুদ্রগর্জনে আমার আর্তনাদ কোন মানুষ শুনতে পায়নি বটে, কিন্তু শুনতে পেয়েছিল এমন একজন যার শ্রবণশক্তি মানুষের চেয়ে শতগুণে বেশি। হঠাৎ মনে হল জলের মধ্যে কে যেন আমাকে গুঁতো মারল। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আমার কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি—মনে হল, আমার কাছেপিঠে তো কেউ ছিল না তাহলে এভাবে কে আমাকে ঠেলছে? তা জানি না--কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি ক্রমাগত গুঁতো মেরে মেরে সে আমাকে ডাঙার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চার-পাঁচ সেকেন্ডের ব্যাপার—তার পরেই ঐ অজ্ঞাত বন্ধুর এক প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি বালির উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। তখন সমুদ্রের দিকে ফিরে দেখি প্রায় দশ-পনের ফুট দূরে একটা ডলফিন তিমি জল থেকে মাথা তুলে আমাকে দেখছে। তার চোখদুটো রীতিমত জ্বলজ্বল করছে। আমি দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সে দুটো হাতডানার হাততালি বাজিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই সে ফিরে গেল তার রাজ্যে। আমি এমনই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে ওকে ধন্যবাদটাও জানাতে ভুলে গেলাম। পরে ডাঙায় বসে থাকা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলাম- -সমস্ত ঘটনাটাই তিনি লক্ষ করেছেন, আমার পদস্খলন থেকে ডলফিনটার -- তিরোধান পর্যন্ত।”

গত দু-তিন দশক ধরে ডলফিন নিয়ে বহু বিজ্ঞানাগারে বহুরকম গবেষণা হচ্ছে। ওদের শব্দতরঙ্গ রেকর্ড করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। একদল বৈজ্ঞানিক ওদের ভাষা বুঝে নেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। বিপদের সঙ্কেত, খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির সংবাদ, আনন্দ ও বেদনার সংবাদ ওরা বিভিন্ন শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে জানায়--অর্থাৎ ওদের ভাষার সেটুকু পার্থক্য বোঝা গেছে। কিন্তু অধিকাংশ জীববিজ্ঞানী মনে করেন এর চেয়েও জটিলতর ভাববিনিময়ে ওরা সক্ষম। ওদের প্রেমের ভাষা, অপত্যস্নেহের সম্বোধন, বন্ধুদের মধ্যে বাক্যবিনিময়ের পদ্ধতিতে যে ফারাক আছে এটুকু বোঝা যায়— কিন্তু ঠিক কী বলে তা বোঝা যায় না।

১৯৬৬ সালে বিলাতের সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যাতে দেখছি, সুয়েজ প্রণালীতে একজন নাবিক ঘটনাচক্রে জাহাজ থেকে পড়ে যায়। জায়গাটা হাঙর-আকীর্ণ। নাবিকটি সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে বলেছিল, একদল ডলফিন তাকে হাঙরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সে যখন সাঁতরে জাহাজে ফিরছিল তখন একটা হাঙর তাকে বারেবারে আক্রমণ করতে তেড়ে আসে, অথচ দশ-বারটা ডলফিন নাবিকটিকে ঘিরে তার সঙ্গে সাঁতরাতে সাঁতরাতে জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

গঙ্গায় আমরা শুশুক দেখি—সেও একজাতের ডলফিন। আমেরিকার আমেজন নদীতেও আছে আর এক জাতের ডলফিন। আমেজন নদীর ধারে ধারে যেসব গ্রাম তার আদিম অধিবাসীরা কিন্তু ঐ ডলফিনের মাংস খায় না। বরং ডলফিনকে পূজো করে। অনেকটা হিন্দুরা যেমন গোমাতার পূজা করে। গরু মানুষকে দুধ দেয়, তাই ভারতীয় হিন্দু গো-মাতার পরিকল্পনা করেছিল ডলফিন কিন্তু সেভাবে ঐ আদিম আমেরিকানদের উপকার করত না। দুধ দিত না, দেয় না। তবু ক্যানোয় করে যারা নদীতে পাড়ি জমাত তারা এমন কোনও উপকার নিশ্চয়ই পেয়েছিল যাতে ওদের পূজার প্রচলন করে।

জাপানের পশ্চিম উপকূলে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে, নাম 'সেইবাই-তো'। সেখানে আছে একটি বৌদ্ধ সংঘারাম কোগাঞ্চি মন্দির। প্রতি বছর এপ্রিলের ২৯ তারিখ থেকে পাঁচদিন সেখানে পূজা ও উৎসব হয়—জাপানী তিমি-শিকারীরা যে-সব তিমি ও ডলফিন

হত্যা করে তাদের আত্মার সদগতি কামনায়।

ওদের লীগ অব নেশান নেই, ইউএনও নেই—কিন্তু একতার বন্ধন ওদের রক্তে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিজ্ঞানীর বক্তব্য শুনুন "উপকূল থেকে অনেক দূরে দেখতে পেলাম একটা হাঙর বারেবারে জল থেকে লাফিয়ে উঠছে। কৌতূহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম ঐ রাক্ষুসে হাঙরটাকে ঘিরে ফেলেছে আধডজন ডলফিন। কেউ পালাচ্ছে না—যদিও পালাবার রাস্তা তাদের চারদিকেই। ডলফিনগুলো পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে ঐ হাঙরটাকে গুঁতো মারছে। হাঙরটা ওদের কয়েকজনকে ঘায়েল করল। করবেই তার তীক্ষ্ণ দাঁত আছে, ডলফিনের দাঁত কামড়ানোর উপযোগী নয় তবু একটিও ডলফিন পালাল না। রক্তের ধারায় তারা ভেসে যাচ্ছে, তবু ক্রমাগত ফিরে-ফিরে এসে গুঁতো মারছে হাঙরটার তলপেটে। শেষ পর্যন্ত হাঙরটাই ঐ নিরীহ ব্যূহ ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করল। পারল না। -আশ্চর্য! তীক্ষ্ণ দাঁতের অধিকারী ঐ মাংসাশী হাঙরটা শেষ পর্যন্ত ওদের যৌথ আক্রমণে প্রাণ দিল।"

এ ঘটনার না-হয় একটা অর্থ হয় বিবর্তনের নিয়মই হচ্ছে ঐ – প্রজাতির মঙ্গলকামনায় একক জীবের আত্মদান। কিন্তু নিজের জাতের নয়, ভিন্ন জাতের জীবকে তারা কেন বাঁচাতে চায়? কেন জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিরাপদ বন্দরে পৌঁছে দেয়? কেন নিমজ্জিত মহিলাকে ঠেলে দেয় ডাঙায়? আর-একটা গল্প শুনুন। গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

এটাও নিউজিল্যান্ডের ঘটনা—ওপোননি গ্রামের কাছে একটা সমুদ্রতীর। ছুটির দিনে স্নানার্থীদের প্রচুর ভিড় হয় সেখানে---যেমন হয় পুরী বা দীঘাতে। ১৯৫৫ সালের এক গ্রীষ্মের সকালে বহু স্নানার্থীর সাথে সেখানে সমুদ্রস্নান করছিল ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা জিল বেকার। কোমরজলে। বেচারি সাঁতার জানে না। কাছেই আছে তার বাবা-মা। জিল বলছে, তার হঠাৎ মনে হল, দুই পায়ের ফাঁকে মসৃণ কী যেন একটা সেঁধিয়ে গেল! ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই দেখল, সে জলে ভাসছে! কিসের পিঠে? ঘটনাটা অনেকেই দেখতে পেয়েছে, ভয়ে সবাই চিৎকার করে উঠেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে বিদ্যুৎ-চমকে জলজন্তুটা ডুব দিল—কিন্তু বেশি নিচে নয়, মাত্র ফুটখানেক। তরতরিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। শতশত লোক দেখছে—জিল দু'দিকে দু'পা ঝুলিয়ে বসে আছে একটা প্রকাণ্ড মাছের পিঠে, দুই হাতে তার পিঠের ডানাটা আঁকড়ে। আসলে জীবটা কোন মাছ নয়, ডলফিন। অনেক ভাল সাঁতারু তার পিছু নিল— কিন্তু কী পাগলের কথা! সাঁতরে নাগাল পাবে ডলফিনের—যে ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার জোরে সাঁতরাতে পারে। ঘাট-সুদ্ধু লোকের হায়-হায় করা ছাড়া আর কীই বা করণীয় আছে?

কিন্তু না! ডলফিনটা রাবণরাজার মত সীতাহরণে আসেনি—এসেছিল দশ কোটি বছরের ওপার থেকে ভেসে আসা এক প্রেমের প্রেরণায়। যেন বাল্যসহচরীর সঙ্গে খেলা করতে! ঐ ...তোমাদের কবি যেমন একদিন ডাঙায় বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা যেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই!
প্রশ্ন করেছিলেন হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা

ঠিক তেমনি ঐ ডলফিনটা নিকট-আত্মীয়ের কাছে তার ভাষায় সোহাগ জানাতে

এসেছিল হয়তো! ঘাটে স্নানরতা ঐ ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখে একটু দুষ্টুমি করতে শখ হয়েছিল। গভীর সমুদ্রে আধনাইলটাক একটা চক্কর মেরে কৌতুকময়ী ফিরে এল ঘাটে। একটা ডিগবাজি খেয়ে—আশ্চর্য! যার ধন তাকেই ফেরত দিল, একেবারে মায়ের কোলে!

সকলে যখন আনন্দে চিৎকার করছে, তখন দেখা দেল জলজন্তুটা জল থেকে খাড়া হয়ে উঠে দুই হাতডানা বাজিয়ে করতালি দিচ্ছে। রীতিমত হাসছে খ্যাকখ্যাক করে!

এ খবর রটে গেল গ্রাম থেকে গ্রামে, শহরে, গঞ্জে। অনেকেই বিশ্বাস করল না, বললে গাঁজাখুরি গালগল্প! ডলফিনটা নিশ্চয়ই খবরের কাগজ পড়েনি, কিন্তু তার বান্ধবীকে মিথ্যাবাদী বলাটা সে সহ্য করল না। সে রয়ে গেল ওখানেই, বহুদিন। যখন লোকে ভিড় করে সমুদ্রস্নান করত, তখন সেও এসে জুটত। ওর দিকে রবারের বল ছুঁড়ে দিলে সে ‘হেড' করে ফেরত পাঠাত; ছিপি এঁটে খালি বিয়ারের বোতল সমুদ্রে ফেলে দিলে সে নাকের উপর সেটাকে তুলে ব্যালেন্সের খেলা দেখাত। জিলের বয়সী ছেলে-মেয়ে সাহস করে এগিয়ে এলে সে তাকে সওয়ার করত—সমুদ্রে এক চক্কর পাক মেরে ফিরে আসত। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড সরকার তাকেও জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেন। অখ্যাত ওপোননি গ্রাম হয়ে গেল বিখ্যাত টুরিস্ট-স্পট। ওর নামকরণও হল ওপো!

কিন্তু বেশিদিন এ আনন্দ ঐ গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ভোগ করতে পারল না। অজ্ঞাত কারণে ১৯৫৬ সালের ৯ মার্চ ওপো মারা গেল। পরদিন তার মৃতদেহ ভেসে এল সাগরবেলায়। ওপোননি গাঁয়ের বুড়ো জেলে ও'নীল বলে, আমি হলপ্ করে বলতে পারি ‘ওপো’ কথা বলতে পারত। কী-যে বলত চিৎকার করে। আমরা বুঝতাম না। কী বলতে চেয়েছিল ওপো?

দশ কোটি বছরের ওপারের কোন প্রেরণায় সে কি দেশওয়ালি ভাইবোনদের হাতে রাখি বেঁধে দিতে চেয়েছিল? ঐ যাকে দার্শনিকেরা বলেন নিকষিত হেম?

ঝিল্লিমুখো তিমির আনুপাতিক মাপ

ঝিল্লিমুখো তিমির দাঁত নেই। মাছের কানকোর মত ওদের মুখে অসংখ্য ঝিল্লি আছে। এদের মোটামুটি এগারটি প্রজাতি আছে। আজ থেকে পৌনে দু'কোটি বছর আগে যখন আমাদের পূজ্যপাদ পূর্বপুরুষেরা গাছ থেকে নেমে আফ্রিকার মাটিতে প্রথম দু'পায়ে উঠে দাঁড়াতে শিখছেন, প্রায় সেই সময়েই তিম্যাদির এই শাখাটি দাঁত ত্যাগ করে ঝিল্লির সূচনা করে। রাতারাতি নয়, বিবর্তনের প্রচলিত মন্থরতায় হয়তো কয়েক লক্ষ বছর সময় লেগেছিল। ঝিল্লির সংখ্যা বর্তমানে কয়েকশ, দৈর্ঘ্যে দশ-বারো ফুট, মাছের কানকোর মত প্রায় আধ-ইঞ্চি ফাঁক-ফাঁক, উপরের চোয়ালে আটকানো। ঝিল্লিমুখোর প্রধান খাদ্য হচ্ছে ক্রিল আর প্ল্যাংটন। খুব ছোট-ছোট কুচোচিংড়ি-জাতীয় জীব। ঝিল্লিমুখো তিমি বিরাশিসিক্কা হাঁ-করে একদিকে এগিয়ে যায়—একেবারে কয়েকশ গ্যালন জল মুখের ভিতর নেয়। তারপর যখন মুখটা বন্ধ করে, তখন ঝিল্লিপথে জলটা বার হয়ে যায়, মাছ আর ক্রিল আটকে যায় মুখবিবরে সেই কালিদাসী হেঁয়ালির ছন্দে : জানলা দিয়ে ঘর পালাল, গেরস্ত রইল বন্ধ!

আকারে ঝিল্লিমুখো মাত্রেই অতিকায়। গ্রে, সেঈরা হয় পঞ্চাশ ফুট রাইট ও কুঁজি তিমি ষাট ফুট; ডানা তিমি সত্তর আশি এবং নীল তিমি সর্বকালের বিশ্বরেকর্ডের

অধিকারী একশ ফুট। জুরাসিক যুগের কোন অতিকায় ডাইনোসরও এত বড় ছিল না। ওজনে একটি নীল
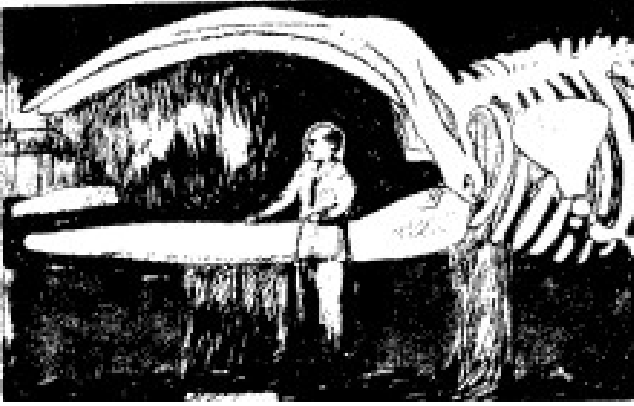
তিমির কঙ্কালে ঝিল্লির অবস্থান

তিমি হাজার-দেড়েক মানুষ, অথবা ত্রিশটি আফ্রিকান হাতির সমান। জুরাসিক যুগের অতিকায় ব্রন্টোসরাস অন্তত গোটাচারেক প্রয়োজন হবে এ পাল্লায়, ওজনদাঁড়ির ও পাল্লায় যদি একটি নীল তিমিকে চাপানো যায়। তবে হ্যাঁ, আপনার ওজনদাঁড়িটা কিঞ্চিৎ মজবুত হওয়া চাই!

ঝিল্লিমুখোর এক নম্বর বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি ওদের ঝিল্লিগুলো! দু'নম্বর বৈশিষ্ট্যও জীবজগতে একটা ব্যতিক্রম। স্ত্রীজাতীয় ঝিল্লিমুখো তিমি সমবয়সী পুরুষজাতীয়ের চেয়ে আকারেও বড়, ওজনেও বেশি। ঝিল্লিমুখোর বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকলে আপনি চোখ বুজে বলে দিতে পারবেন বর বড় নয়, বউ বড়।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা ঝিল্লিমুখোদের মোটামুটি তিনটি গোত্রে ভাগ করেছেন দক্ষিণ, নীলাভ ও বরকোয়াল। তালিকাটা এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে——

ঝিল্লিমুখো তিমি						
দক্ষিণ তিমি			নীলাভ তিমি		ররকোয়াল	
গ্রীনল্যান্ড	কৃষ্ণ	বামন	ডানা	সেঙ্গী	কুঁজি	নীলতি
উত্তর অতলান্তিক						

'দক্ষিণ' বলতে এখানে South নয়, Right৷ কেন এদের বামপন্থী বলে ধরা হয়নি। তা জানি না। তাদের ভিতর গ্রীনল্যান্ড তিমি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এদের ঝিল্লি খুবই প্রকট ও বিরাটাকার! বদনখানি—যাকে বলে ঘাড়ে-গর্দানে। বস্তুত দেহ-দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মাথাটা। লক্ষণীয়, এদের পিঠে 'পাখনা' বা 'ডরসাল ফিন' নেই। দেহটা ধূসর বা গ্রে রঙের, যদিও চিবুকটা ধপধপে সাদা। ১৯৬৩ সাল তক্ এদের দূর থেকে সনাক্ত করা গেছে। আশা করা যায় ওরা এখনও ডোডো পাখির সগোত্র হয়ে যায়নি। তাড়াতাড়ি নিঃশেষিত হবার দুটি কারণ! প্রথমত এরা ধীরগতি, দ্বিতীয়ত মরে গেলে ডুবে যায় না, ভেসে ওঠে। তাই এদের মারতে অনেক সুবিধা।

কৃষ্ণ তিমি : নিবাস উত্তর-অতলান্তিক অঞ্চলে; তাই এদের অপর নাম উত্তর-অতলান্তিক তিমি। এদের অবস্থা আরও কাহিল। বর্তমানে আইন করে এ জাতের তিমি শিকার বন্ধ আছে। গ্রীনল্যান্ড তিমির সঙ্গে এদের প্রভেদ আকারে ও বাসস্থানে। এদের মাথাটা অপেক্ষাকৃত ছোট। তাছাড়া দুই চোখের মাঝখানে, চশমা পরলে নাকের যেখানে চশমাটা আটকায়, সেখানটা কিছু উঁচু। গ্রীনল্যান্ড তিমির মত এরা শুধুমাত্র উত্তরমেরু অঞ্চলে থাকে না—-উত্তর-অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরভাগে হামেশা চরতে আসে।

বামন তিমি : দৈর্ঘ্যে কুড়ি ফুটেরও কম।

নীলাভ বা গ্রে-তিমি: দৈর্ঘ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট। দক্ষিণ তিমির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য এই যে এদের পিঠের উপরেও পাখনা নেই, যা অনিবার্যভাবে আছে তৃতীয় গোত্রভুক্ত ররকোয়ালের। অপরপক্ষে ররকোয়ালের মত এদের চিবুক খাঁজকাটা, যা নয় দক্ষিণ তিমির। বর্তমানে গ্রে-তিমিদের প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অঞ্চলেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি হল্যান্ডে এই জাতির একটি তিমির কঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে--এককালে ওরা ইউরোপীয় সমুদ্রে বিচরণ করত। এরা এখনও দীর্ঘ দূরত্বে যাতায়াত করে। গ্রীষ্মকালে উত্তর মেরুবলয়ের কাছাকাছি এরা খাদ্যসন্ধানে সমবেত হয়, বরফ জমতে শুরু করলেই ক্রমশ দক্ষিণে সরে আসে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধরে চলে আসে ক্যালিফোর্নিয়ার কাছাকাছি। সেখানে ওদের বাচ্চা হয়। শ'দুয়েক বছর আগে ওদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। তারপর ক্রমাগত শিকারের ফলে ওরাও নির্বংশ হতে বসেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে জীববিজ্ঞানীরা বললেন, গোটা পৃথিবীতে আর মাত্র আড়াইশ গ্রে-তিমি অবশিষ্ট আছে। তখন আইন করে এদের শিকার বন্ধ করা হয়েছে।

ররকোয়াল চার জাতের। নীল, ডানা, সেঈ, কুঁজি। এরা সকলেই দীর্ঘদেহী। অন্যান্য ঝিল্লিমুখোর সঙ্গে দু-দুটো প্রভেদ। এক নম্বর, এদের পিঠের উপর পাখনা থাকে, যাকে বলে ‘ডরসাল ফিন’। দু'নম্বর এদের চিবুকে ও বুকে— নিচেকার ঠোঁট থেকে প্রায় তলপেট পর্যন্ত কতকগুলি সারি-সারি সমান্তরাল দাগ বা আঁজি-কাটা। এদের মধ্যে, আগেই বলেছি, বৃহত্তম হচ্ছে নীল তিমি! সর্বযুগের সর্ববৃহৎ এই জীবটিকে আমরা কীভাবে হত্যা করে চলেছি তার খতিয়ানটা একবার সংক্ষেপে দেখুন:-

এ শতাব্দীর শুরুতে নীল তিমির আনুমানিক সংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০

১৯৩০ সালে সেটা কমে গিয়ে হল ৪০,০০০

১৯৫০ সালে নেমে গিয়ে হল ১০,০০০

বর্তমানে আন্দাজ পাঁচ/ছয় হাজার নীল তিমি অবশিষ্ট আছে।

ডানা তিমির কথা বিস্তারিত বলছি না, কারণ আমাদের কাহিনীর নায়ক ঐ জাতির। যে-কথা বলছিলাম। দশ কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী জীবের যে-শাখাটি সমুদ্রে ফিরে গেল, তারা বিবর্তিত হল নানান জাতির তিম্যাদিতে। কিন্তু যারা ডাঙায় রয়ে গেল? প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে-করতে তাদের মধ্যে বিবর্তনের তুঙ্গশিখরে উঠল মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই। জীবনসংগ্রামে সে উন্নত করল মস্তিষ্ক—শিখল আগুন জ্বালা, লোহার ব্যবহার, চাষবাস, অস্ত্রের ব্যবহার।

কিন্তু! যে-যন্ত্রের উপর নির্ভর করে সে পৃথিবী জয় করল ক্রমে সেই যন্ত্রের পায়েই লিখে দিল দাসখত। জীবন হল কৃত্রিম। ধ্বংসের উৎসবে মাতাল সে। শুধু অন্যান্য জীবকেই নয়, স্বজাতীয়কে। তাদের দেশ—ঐ ডাঙাটাকে— কৃত্রিম পদ্ধতিতে ভাগাভাগি করে বললে—এই গন্ডি-দেওয়া জমিটা আমার, ওটা তোমার! গন্ডির এপারে মাথা গলালে ঠ্যাঙ ভেঙে দেব। তারপর থেকেই শুরু হানাহানি আর খাওয়া-খাওয়ি। মানুষই আজ মানুষের প্রধানতম শত্রু। বাঘ বাঘকে আক্রমণ করে না, সাপ সাপকে কামড়ায় না,

একমাত্র সবার উপরে সত্য যে মানুষ, তারা মানুষ মারে! যারা এ অবস্থার প্রতিবাদ করতে গেল তাদের ওরা আগুনে পুড়িয়ে মারল, হেমলক পান করাল, ক্রুশবিদ্ধ করল, গুলি করে হত্যা করল!

তিমি কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার ধার ধারেনি। সেও নেমেছিল জীবনসংগ্রামে। এই দশ কোটি বছরে সে দেহটাকে শুধু বড়ই করেনি, করেছে তার পারিপার্শ্বিকের তুলনায় নিখুঁত। তার শ্রবণশক্তির নাগাল আজও পায়নি প্রযুক্তিবিদ্যার ধুরন্ধর পণ্ডিতেরা। সে যে কীভাবে কয়েক মিনিটে বাতাসের অক্সিজেনকে ফুসফুসের সাহায্য ব্যতিরেকে সারা দেহের রক্তকণিকায় সঞ্চারিত করে দেয় তার হদিশ আজও জানে না বিজ্ঞান। তাই আজ সে সমুদ্রের অধিপতি। তার দাঁত নেই, শিঙ নেই, নখ নেই, মানুষের মত দূর থেকে অস্ত্র ছুঁড়ে মারতেও সে শেখেনি—তা সত্ত্বেও সে সমুদ্রের অধিপতি। কী হাঙর, কী অক্টোপাস, কী রাক্ষুসে তিমি তাকে আক্রমণ করতে ভয় পায়। অত প্রকাণ্ড দেহ সত্ত্বেও কেমন করে সে আয়ত্ত করল এমন প্রভঞ্জনগতি? অথচ সমুদ্রের এই শ্রেষ্ঠ জীব সমুদ্রসম্রাট হতে চাইল না। খাদ্য-খাদকের যে-প্রাকৃতিক নিয়ম সেটা মেনে নিয়ে সে আর পাঁচটা জীবের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে বাঁচতে শিখল। সার্থক করল ক্রুশবিদ্ধ সেই মানুষটির বাণী - লাভ দাই নেবার। প্রতিবেশীকে ভালোবাস। ওরা স্বজাতীয়কে ডেকে বলেনি : তোমরা অমৃতের পুত্র। বলেনি 'শুনহে মানুষ ভাই' জাতীয় কোন আত্মশ্লাঘার কথা। কিন্তু পরিবর্তে যা বলেছে তা জীবজগতের কেউ কোথাও— আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ অমৃতস্য পুত্রাঃ সমেত—স্বজাতীয়কে ডেকে বলতে পারেনি আজও—

এ কথা কি জানেন যে নীল তিমি অথবা ডানা তিমি বহুবিবাহ প্রথাটাকে বর্বরতা মনে করে? ওদের বিবাহবন্ধন আযৌবন এবং যাবৎজীবন।

বলুন এ জিনিস কোথায় দেখেছেন? জলে? স্থলে? অন্তরীক্ষে? হাতি, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল এবং মানুষ, কে তার সঙ্গীর প্রতি আমৃত্যু বিশ্বস্ত? প্রতি বসন্তেই পাখিরা জোড় বাঁধে— ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, বাচ্চারা উড়তে শিখলে তাদের বাবা-মা যে যেদিকে খুশি উড়ে যায়। ওদের বিবাহবন্ধন এক ঋতুর। পরের বছর তারা অন্য সঙ্গীর সঙ্গে জোড় বাঁধে। মানুষ? নলচের আড়াল দিয়ে যা খুশি করতে পারে। কথাটা জানাজানি না-হয়। পছন্দ না-হয়, সমাজ বিধান দিয়ে রেখেছে তালাক-তালাক-তালাক, অথবা ডিভোর্স! তিমি তা নয়। মাদী তিমি আক্রান্ত হলে কোন একটি ব্যতিক্রম ক্ষেত্রেও মদ্দা তিমি ভাবতে পারে না -

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ, দারাং রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ, দারৈরপি ধনৈরপি!'

সে আক্রমণকারীকে আক্রমণ করতে অনিবার্যভাবে ছুটে আসবে। মাদী তিমিও তাই — তবে তার একটি ব্যতিক্রম আছে। মাদী তিমি যদি গর্ভিণী হয়, অথবা সদ্য সন্তানবতী হয়, তাহলে সে অনিবার্য পরিণামকে মেনে নিয়ে সরে আসে। কাঁদে কি না? তা তো জানি না। পশুদের পশ্বাচারের খবর আর কে রাখে? জানি মানুষের কথা। তিমি-শিকারীদের কথা। তারা ঐ পশ্বাচারের সন্ধান রাখে। তাই কোথাও কোন মাদী তিমি হত হলেই শিকারীদের উদ্যত হারপুন প্রতীক্ষায় আঁতিপাতি খুঁজতে থাকে। ওরা জানে মদ্দা-শালা নির্ঘাৎ মরতে আসবে! শালাটাকে গেঁথে তুলতে হবে!

বইপত্র ঘেঁটে যতদূর জেনেছি, ররকোয়ালদের ক্ষেত্রে প্রাক্-বিবাহ প্রণয়কাহিনী ত্রিভুজাকৃতি হতে পারে, বিবাহোত্তর দাম্পত্য জীবন কোনক্রমেই ত্রিকোণাকৃতি হবে না। সেখানে শুধুই নায়ক ও নায়িকা— 'নেভ' নেই। স্বামী বর্তমানে কোন মাদী তিমি যে অসতী হতেই পারে না— 'নেভ' বেচারা কী পার্ট করবে? ফলে ওদের প্রাক্-বিবাহ প্রেম আছে, স্বয়ম্বর সভা আছে, শৃঙ্গার আছে, কামকেলি আছে। নেই তালাক প্রথা বা বিবাহবিচ্ছেদ, নেই প্রেমের জন্য হত্যা, পরস্ত্রীকাতরতা!

রীতিমত পশ্বাচার!

মানুষ আর তিমি। দশ কোটি বছরের ব্যবধানে আবার তাদের সাক্ষাৎ হল—একেবারে হাল আমলে। সুশিক্ষিত মানুষ আর বর্বর তিমি। সে সাক্ষাতে তিমি দিল প্রাণ, আর মানুষ দিল মান। গাণিতিক সূত্রটা হল :-

তিমি : মানুষ :: প্রাণ : মান

তিমি কী করে প্রাণ দিল শুধু সে কথাই শোনাব। মানুষ সবার উপরে সত্য। সেই অমৃতস্য পুত্ররা কীভাবে মান দিল সেকথা আমার বলা শোভা পায় না। মহাকাশের কোন নূতন সূর্যের অজ্ঞাত গ্রহের বুদ্ধিমান জীব যেদিন পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করবে সেদিন সে-ই সে প্রশ্নটা তুলবে: এ তুমি কী করেছ, হে বর্বর মানুষ?

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ চিনেছে তিম্যাদি জীবকে। প্রস্তর যুগের গুহামানব ছেনিহাতুড়ির সাহায্যে যে-ছবি এঁকেছে তাতে বোঝা যায়-- জন্তুটা অপরিচিত নয়। দুটি হাতডানা, পিঠের উপর পাখনা, লেজ ও মেরুদণ্ড বরাবর লম্বাটে রেখাটা, বিশেষ করে ঠোঁট দেখে মনে হয় চিত্রটি একটি ডলফিনের তার মানে দশ-পনের হাজার বছর আগে থেকেই ডলফিনকে চিনেছে মানুষ—কে জানে, হয়তো বন্ধু হিসাবেই।

প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে তিমি

এর পর আর-একটি অনবদ্য চিত্র পাচ্ছি যা রঙে ও রেখায় অবিকৃত? হয়ে টিকে আছে দীর্ঘ চার-সাড়ে চার হাজার বছর। ক্রীট দ্বীপের নৃপতি নসস্-এর রাজপ্রাসাদে এ চিত্রটি অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে। রানি নেগারনের শয়নকক্ষে এই ম্যুরাল চিত্রটি যখন আঁকা হয় তখনও ভারতবর্ষে ঋকবেদ রচিত হয়নি, মহেন-জো-দড়ো, হরপ্পার সভ্যতায় তখন অশ্বারোহী অসভ্য আর্যরা প্রথম আক্রমণ হানছে!

আশ্চর্য! ডলফিনগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আঁকা। বেশ বোঝা যায়, চিত্রকর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে ডলফিন জীবটিকে দেখেছেন।

প্রায় দু'হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ তিমি-শিকার শুরু করেছিল গ্রীনল্যান্ড রাইট তিমি, গ্রে তিমি, এবং কুঁজিতিমি। উত্তরমেরুর কাছাকাছি এসকিমোরাই এ বিষয়ে ছিল অগ্রণী। তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। বেচারিদের না ছিল চাষের জমি, না গবাদি পশুর গোচারণভূমি। তাদের তিমিশিকারে কিন্তু তিম্যাদি কুলের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ সে হত্যা ছিল নিতান্ত প্রাকৃতিক নিয়মে – খাদ্যখাদকের নির্দিষ্ট সম্পর্কে, যে-ছন্দে এইই বিশ্বপ্রপঞ্চে জীবজগৎ অনিবার্য আইনে বাঁধা। একটি তিমি খেয়ে শেষ করতে গোটা গ্রামবাসী এসকিমোদের বেশ কিছুদিন লেগে যায়। বরফের দেশে মাংস পচেও যায় না। ফলে মৎস্যকুল বৃদ্ধি পেত! মানুষও বাঁচত, তিমিরও জাতিগতভাবে কোন ক্ষতি হয়নি। প্রাকৃতিক ভারসাম্য অব্যাহত ছিল।

বিপদ ঘনিয়ে এল যখন মানুষ জাহাজ তৈরি করে তিমির পিছু ধাওয়া করল গভীর সমুদ্রে। উপকূলভাগ ছেড়ে— ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। প্রথমেই মারা যেতে

শুরু করল দক্ষিণ তিমি এবং গ্রে তিমি! প্রথমত তারা ধীরগতি, দ্বিতীয়ত মানুষ বুঝতে পেরেছিল—- অন্যান্য জাতির তিমি যেখানে মৃত অবস্থায় সমুদ্রে তলিয়ে যায়, এরা সেখানে মারা গেলে ভেসে ওঠে। অন্যান্য জাতির তিমির গায়ে তাই সে যুগে বিশেষ হাত পড়েনি। তা সত্ত্বেও বলব এই পর্যায় পর্যন্ত মানুষ জীবজগতের অলিখিত আইন লঙ্ঘন করেনি। সেই অলিখিত আইন হচ্ছে খাদ্য-খাদকের স্বাভাবিক সম্পর্ক। বিবর্তনের পথে খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে যে-প্রজাতি উন্নততর স্বাক্ষর রাখবে সেই টিকে থাকবে। তাকেই বলি প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশান।
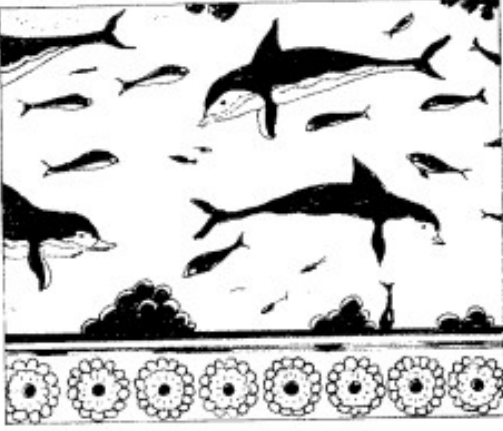
ক্রীট সভ্যতার প্রাচীরচিত্রে তিমি

তাই বলব— উপকূলভাগ ছেড়ে তিমির মাংসের সন্ধানে মানুষের পক্ষে গভীর সমুদ্রে তাকে ধাওয়া করার ভিতরে ‘ফাউল’ নেই। সেটা এই খেলার আইন। বড়-বড় নৌকা, হারপুন, দূরবীন--সবই সেই খেলার সরঞ্জাম। ক্রিকেট খেলায় যেমন গ্লাভস, প্যাড, এ্যাবডমিনাল গার্ড। সবই খেলার কানুন-ভুক্ত।

মানুষ সে নিয়ম প্রথম লঙ্ঘন করল, “বিলো-দ্য-বেল্ট' আঘাত করল, যেদিন সে আবিষ্কার করল— তিমির চর্বিতে আলো জ্বালা যায়, খাদ্য-খাদকের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সম্পর্ক গেল ঘুচে। তিমি হল মানুষের কৃত্রিম জীবনযাত্রার উপাদান।

১৮০০ সাল নাগাদ মানুষ হাজার- ছয়েক জাহাজ ভাসিয়েছে সমুদ্রে। ঐ তিমিশিকারের উদ্দেশ্যে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে থাকে কয়েকটি তিমিশিকারী জাত: নরউইজিয়ান, ডাচ, আমেরিকান, জাপানী, রাশিয়ান। মাত্র একশ বছরের মধ্যেই অবস্থা এমন হল যে এ ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম- একটিমাত্র কারণে; সাতসমুদ্রে ইতিমধ্যে তিমি প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মানুষ চার-চারটি চমকপ্রদ আবিষ্কার করে বসে আছে যে। এক নম্বর, হোয়েল গান। বিশেষ জাতের বন্দুক অর্থাৎ আর তাকে হাতে করে হারপুন ছুঁড়তে হয় না। তিমি-বন্দুকের রেঞ্জ অনেক বেশি। এই হারপুন গানের গুলির সঙ্গে একটি বোমা গিয়ে-বিদ্ধ হয় তিমির দেহে—বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে তিমিটির অনিবার্য মৃত্যু। দু'নম্বর, বাষ্পীয় পোত। এখন স্টিম জাহাজে ওদের তাড়া করে ধরা সম্ভবপর হল। এতদিন পালতোলা বা দাঁড়টানা নৌকা ওদের দৌড়ে ধরতে পারত না। তিন নম্বর, একজাতের ফাঁপা বল্লম। এত দিন মরণাহত তিমি অধিকাংশই সমুদ্রে তলিয়ে যেত। এখন এমন ব্যবস্থা হল যাতে মরণাহত তিমির গায়ে ঐ ফাঁপা বল্লম গেঁথে দিয়ে ওর মাধ্যমে তিমির পেটে হাওয়া ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এতে মৃত তিমি ভাসতে থাকে। আর চতুর্থ আবিষ্কার ভাসমান তিমি ফ্যাক্টরি।
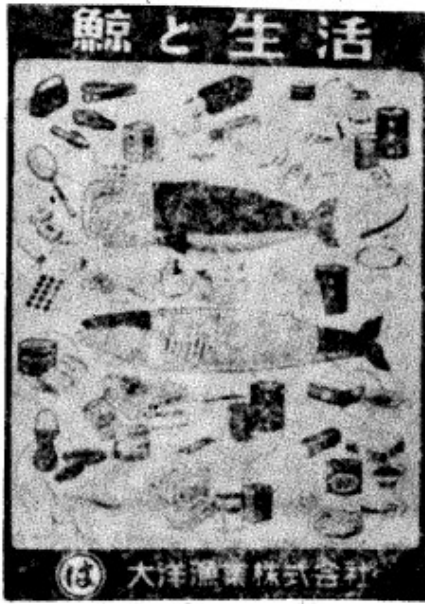
鯨と生活

তিমির দেহজাত ব্যবহারিক দ্রব্য--একটি জাপানী পোস্টার

এতদিন মৃত তিমিটাকে টেনে আনতে হত ডাঙায় কেটেকুটে ড্রেস করতে। এখন এই ভাসমান কারখানায় এমন ব্যবস্থা করা হল যাতে কপিকলের সাহায্যে তিমিটাকে ঢালুপথে টেনে জাহাজে তোলা হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টুকরো-টুকরো করে ওর দেহাংশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। মাংসটা খাদ্য; ব্লাবার থেকে পাওয়া যায় তেল ও চর্বি; বালিন বা ঝিল্লি থেকে হয় নানান জাতের শৌখিন জিনিস। তিমির অন্ত্রে একজাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়— তাকে বলে 'এ্যাম্বারগিস্'— সেটা সুগন্ধী সেন্ট তৈরি করার কাজে লাগে, যেমন মৃগনাভি হরিণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তিমির দেহাংশ থেকে কত রকমের জিনিস তৈরি করা যায় তা এই জাপানী পোস্টারে দেখানো হয়েছে। উপরে একটি রামদাঁতাল, যার দেহ থেকে তৈরি হবে ভ্যানিটি ব্যাগ, জুতো, চটি, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট ইত্যাদি। নিচেকার ছবিটা একটা ররকোয়ালের, সম্ভবত ডানা তিমির।

কয়েকশ বছরে তিম্যাদি কুলের কত বড় সর্বনাশ মানুষে করেছে সেটা নিচেকার তালিকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

প্রজাতি	তিমি শিকার বাণিজ্যিক ভাবে নেওয়ার পূর্বে কত ছিল	বর্তমানে আনুমানিক কত বেঁচে আছে	শতকার কতগুলি বেঁচে আছে	১৯৬৬-৬৭ সালে কত ধরা হয়েছে (সরকারী হিসাবে)
নীল *	২,১০,০০০	১৩,০০০	৬%	০
ডানা	৪,৫০,০০০	১,০০,০০০	২২%	৩৪৪
সেঈ	২,০০,০০০	৭৫,০০০	৩৮%	১৯৯৫
কুঁজি *	১,০০,০০০	৭,০০০	৭%	০
রাইট *	৫০,০০০	৪,০০০ ?	??	০
বো-হেড *	১০,০০০	২,০০০ ?	??	০
গ্রে	১৫,০০০	১১,০০০	৭৩%	০
রামদাঁতাল (পু)	৫,৩০,০০০	২,৩০,০০০	৪৩%	৮,২১৪
রামদাঁতাল (স্ত্রী)	৫,৭০,০০০	৩,৯০,০০০	৬৪%	৩,৭৭৭

[* তারকা চিহ্নিত প্রজাতির শিকার বর্তমানে নিষিদ্ধ]

আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে, আমাদের কাহিনীর নায়ক সেই খোকা তিমি ডানা-তিমি প্রজাতিভুক্ত। গত তিন-চারশ বছরে আমরা সেই ডানা তিমিদের ৭৮ শতাংশ কমিয়ে এনেছি। অর্থাৎ ২২% এখনও টিকে আছে। ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং সংস্থা মনে করলে ২২ শতাংশ যখন জীবিত আছে তখন ওদের হত্যা-উৎসব আপাতত বন্ধ না-করলেও চলতে পারে। অবশ্য ওঁরা নিষিদ্ধ করলেও কিছু ইতর বিশেষ হত বলে মনে হয় না। কারণ এই আন্তর্জাতিক তিমি-রক্ষণ সংস্থা যে- 'কোটা' বেঁধে দেন তা আদৌ মানা হয় কিনা সন্দেহ। অনেক তিমি শিকারী দেশ ঐ সংস্থার সভ্য নয়; অনেকে সভ্য হয়েও অসভ্যের মত আচরণ করে। বস্তুত ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থার ফতোয়া কেউ না-মানলে শাস্তি দেওয়ার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। ঢোঁড়া সাপকে আর কে মানে?

আসল কথা তাও নয়। পচনকার্য আরও গভীরে। একাধিক দরদী জীববিজ্ঞানীর মতে ঐ 'আন্তর্জাতিক তিমিরক্ষণ সংস্থা' আসলে একটা ধাপ্পাবাজি। এই সংস্থার যাঁরা কর্মকর্তা তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তিমি-শিকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভোটে। ফলে তাঁদের মূল লক্ষ্য তিমিকে বাঁচানো নয়, তিমি-শিকারের ব্যবসাটা বাঁচানো। সর্ষের মধ্যেই ভূত। উৎসাহী পাঠককে এই প্রসঙ্গে দুটি রচনা পড়তে বলব। এক নম্বর সম্প্রতি প্রকাশিত 'Leviathan'। মন-গড়া কাহিনী। উপন্যাস। কাহিনীর নায়ক নিজের জীবন বিপন্ন করে তিমি শিকারের ব্যবসাটা বন্ধ করতে গিয়েছিল। ডিনামাইট দিয়ে প্রথমে সে একটি জাপানী বন্দরে তিমি শিকারী জাহাজগুলিকে উড়িয়ে দেয়। এবং পরে দক্ষিণমেরু অঞ্চলে রাশিয়ান তিমি ফ্যাকটরি ধ্বংস করে। ঐ দুঃসাহসিক অভিযানে নায়ক প্রাণ দেয়। কিন্তু কাহিনীর উপসংহারে আমরা দেখি একটি নীল তিমিকে—যে চলেছে সঙ্গিনীর সন্ধানে, প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে।

দ্বিতীয় রচনাটি বাস্তব ঘটনা। প্রকাশিত হয়েছে রিডার্স ডাইজেস্ট, আগস্ট '৭৮-এ। রচনাটির নাম Greenpeace vs Russian Whalers। কানাডার সমুদ্র উপকূলে গ্রীনপীস ফাউন্ডেশানে কয়েকজন দুঃসাহসী তিমি-দরদী 'ফিলিস্ করম্যাক' নামে একটি জাহাজ নিয়ে রাশিয়ান তিমি- শিকারীদের বাধা দিতে সরেজমিনে অগ্রসর হলেন। ঘটনা

১৯৭৫ সালের। লেখক বলছেন, " In London, meanwhile, the sun was casting afternoon shadows into the room where the International Whaling Commission was winding up its annual meeting. Delegates from the 15 member nations were aware of the Greenpeace mission but did not take it seriously. Few delegates believed the Canadian boat would ever get within 200 kilometers of Russian or Japanese fleet.

ছোট্ট জাহাজ ঐ করম্যাক কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ান তিমি-শিকারীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। তারা ক্রমাগত ঐ তিমি-শিকারী আর তিমিদের মাঝখানে নিজেদের জাহাজটাকে নিয়ে গিয়ে বাধা দিয়েছিল। রাশিয়ান তিমি-শিকারীদের হাত থেকে অনেক তিমি পালিয়ে গেল। লেখক সানন্দে লিখছেন, “For the first time men had deliberately put their lives on the line to save the endangered band of whales. It was a unique bonding.” খবরটা টুকে রাখার। কারণ বেশ বুঝতে পারছি, আগামী শতাব্দীতে এই দুনিয়ায় নীল তিমি থাকবে না। তখন গ্রহান্তরের জীব যদি পৃথিবীতে পদার্পণ করে এবং আমাদের কৈফিয়ৎ তলব করে তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এই রিপোর্টটাই আমাদের কাজে লাগবে।

একটা কথা যখন ভাবতে বসি তখন কোন কুলকিনারা পাই না। ওদের এত বুদ্ধি তবু জীবন-যুদ্ধে এমনভাবে ওরা হেরে গেল কেন? কেন ওরা ওভাবে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে? বুদ্ধি ওদের কম নয়। মস্তিষ্কের ওজন যদি ধরেন, তবে জীবকুলে মানুষ কিন্তু প্রথম নয়, তার স্থান অষ্টম। ওজন অনুপাতে সাজালে তালিকাটা হবে এই রকম :

(১) রামদাঁতাল তিমি

(২) সেঈ তিমি

(৩) নীল তিমি

(৫) ডানা তিমি

(৬) হাতি

(৭) রাক্ষুসে তিমি

(৮) ডলফিন

(৯) মানুষ।

জানি, মস্তিষ্কের ওজনই বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি নয়। দেহের ওজনের অনুপাতে মস্তিষ্কের যে-ওজন, সেই ‘রেশিও’ বা অনুপাতটাই কোন জীবের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সেখানেও, জানেন, তিম্যাদির স্থান অনেক জীবের উপরে—এমনকি এ্যালসেশিয়ান কুকুর, বাঁদর, ঘোড়ার চেয়ে আগে। সেই তালিকায় তিম্যাদির স্থান মানুষের পরেই

(১) মানুষ

(২) ডলফিন

(৩) ঘোড়া

(৪) হাতি

(৫) রাক্ষুসে তিমি

(৬) নীল তিমি।

তাই প্রশ্নটা ঘুরেফিরে আসে মনের ভিতর জুরাসিক যুগের সরীসৃপ ছিল নির্বোধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। স্যেবর টুথ টাইগার জাতীয় মাংসাশী স্তন্যপায়ীর সঙ্গে অত বড় দেহটা নিয়ে তারা পাল্লা দিতে পারেনি। তাই তারা নির্বংশ হয়ে গেল। এই সেদিন নিঃশেষ হয়ে গেল ডোডো পাখি— উড়তে শিখল

না বলে।

সমুদ্রের অধিপতি তো অত বোকা নয়। আমি বড় জাতের ররকোয়ালদের কথা বলছি নীল তিমি, ডানা তিমি, সেঈদের কথা। মানুষের হাত এড়িয়ে বিবর্তনের তাগিদে ওরা মুক্তির কোন পথ খুঁজে পেল না কেন? পাচ্ছে না কেন?

হেতুটা দ্বিবিধ। এবং দুটোই মর্মান্তিক।

প্রথম হেতু ওদের দাম্পত্যজীবনের একনিষ্ঠতা!

প্রকৃতিগতভাবে ওরা যদি সতীত্বের ঐ অদ্ভুত নিয়মটা না-মানত ? বিভিন্ন পুরুষ তিমির ঔরসে যদি একই মাদী তিমির সন্তান হত, তাহলে এত দ্রুত হারে ওরা নিঃশেষিত হত না। প্রেমের ঐকান্তিকতা, দাম্পত্যজীবনের একনিষ্ঠতা প্রজাতিগতভাবে ওদের চরম সর্বনাশ করল!

দ্বিতীয় হেতু সময়ের অভাব।

মানুষ ওদের যথেষ্ট সময় দিল না। বিবর্তনের পথে আত্মরক্ষার কায়দা শিখতে যেটুকু সময় অনিবার্য্য মানুষ তা দেয়নি তিমিকে। মাত্র তিন-চারশ বছর জীববিবর্তনের হিসাবে অকিঞ্চিৎকর! সময় পেলে হয়তো মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যার হাত থেকে ওরা আত্মরক্ষার কায়দা শিখে নিত। হয়তো ওদের অন্ত্রে 'এ্যাম্বারগিস' আর পাওয়া যেত না, হয়তো ওদের মাংস অভক্ষ্য হয়ে যেত। কী হত তা বলা অসম্ভব। কিন্তু মানুষ ওদের সে সময়টুকু দিল না।

জবাবটা বেদনার; কিন্তু অকাট্য।

কিন্তু ঐ সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন যে মনে জাগছে: ডাঙার সম্রাট মানুষও তো নির্বোধ নয়। তাহলে সেই বা কেন শিখল না বাঁচতে? এবং বাঁচাতে? যে-যন্ত্র আবিষ্কার করে সে পৃথিবীর ঈশ্বর হল, জীবজগতে শ্রেষ্ঠ আসন পেল, শেষমেশ কেন সেই যন্ত্রের পায়েই লিখে দিল দাসখৎ? জীবজগৎকে সে বাঁচতে সাহায্য করল না—নিজ প্রজাতির- হোমো স্যাপিয়েন্স নামক প্রজাতির সর্বনাশও সে ডেকে আনছে ঐ প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে। এ্যাটম বোমায়, দূষিত আবহাওয়ায়, কৃত্রিম জীবনে, অনিয়ন্ত্রিত প্রজননে, শাসনে এবং শোষণে!

এ প্রশ্নের জবাব কী? কেন আমার কাহিনীর নায়ক ঐ খলনায়কের হাত থেকে রেহাই পাবে না? জবাবটা আপনারা জানেন?

আমাদের খোকা-তিমির বয়স এখন তিন মাস। লম্বায় সে নয় মিটার, মানে হাত ত্রিশেক। ওজন প্রায় সাত-আট টন –ধরুন দু'শ মন। এই বৃদ্ধিটা হচ্ছে তিন পুন্নিনে মায়ের দুধ খেয়ে। ঐ ত্রিশ হাত লম্বা চুন্নুমুন্নুটা এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু যে! মানুষীর সঙ্গে মা-তিমির তফাৎটা এই যে, মানবী তার বুকের অমৃতে সন্তানকে পরিপুষ্ট করে নিজে আহার করে। ঝিল্লিমুখোর ক্ষেত্রে তা নয়। সে নিজেও বাঁচে, বাচ্চাকেও বাঁচায় তার দেহের অতিরিক্ত সঞ্চয় থেকে ব্লাবারের ভাণ্ডারে সঞ্চিত মূলধন খরচ করে। মা-তিমি এই ক'মাসে তাই বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। নীল তিমি বাচ্চা হবার পর প্রায় ছয়মাস উপোসী থাকে, সেই যদ্দিন না আবার ক্রিলপাড়ার মেলার যাচ্ছে। ছয়মাসের আগে কেন যায় না? গিয়ে কী লাভ? তখন যে সব বরফ, বরফ আর বিলকুল বরফ!

খোকনের গায়ের ক্ষতটা সেরেছে। সেই হাঙরের কামড়ে যে-ক্ষতটা হয়েছিল। মা-তিমি এবার দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ছেড়ে দখিন পানে চলতে থাকে। দক্ষিণ অতলান্তিক অতিক্রম করে দক্ষিণমেরুর ক্রিলপাড়ায় পৌঁছতে গ্রীষ্ম পড়ে যাবে বস্তুত সূর্য বিষুব সংক্রান্তি অতিক্রম করে (সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে) দক্ষিণায়নের পথে অগস্ত্যযাত্রা শুরু করলেই ওরা টের পায়। সারা শরীরটা চনমন করে ওঠে। জোড়-বাঁধা তিমি তিমিনীকে বলে, লগ্ন এসে গেছে, চল রওনা দিই। তিমিনী চমকে উঠে বলে না, কোথায়? সে জানে গন্তব্যস্থল কোন দিকে, কেন। এক ‘পড’-এ অনেক তিমিনী থাকলে

এ ওর গায়ে গা ঘষে বলে, ‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল। ' ওরা দলে-দলে রওনা দেয় দক্ষিণ পানে— সেই যেখানে সাদাসাদা বরফের পাহাড় জলে ভাসছে, পেঙ্গুইনের দল ওদের প্রতীক্ষা করে আছে। সূর্যও চলতে থাকে ওদের সাথে তাল দিয়ে মকরসংক্রান্তির দিকে।

ধীরগতিতে, মানে দিনে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে ওরা মায়ে-পোয়ে রওনা দিল দক্ষিণমুখো—উপকূলের ধার বরাবর। সমুদ্রসৈকত থেকে তিন-চার মাইল দূরত্ব বজায় রেখে। এটুকু দূরত্ব বজায় রাখা ভালো—ওখানে জেলেডিঙির ভিড়; তাছাড়া জলও অগভীর। মন্টিভিডিও-র কাছাকাছি মোড় ঘুরে ওরা দুজনে চলল দক্ষিণ-পুবমুখো। সমুদ্রের এই এলাকাটা

ওদের ক্রিলপাড়া তীর্থে যাত্রাপথ

মা-তিমির খুব প্রিয়। খোকন সে কথা জানে না। জানবে কেমন করে? প্রথমত মহীসোপান অতিক্রম করে এতক্ষণে ওরা গভীর সমুদ্রে নামল। তোমরা ভূগোলের ছাত্ররা, জায়গাটাকে বলবে আর্জেন্টিনা বেসিন। সে নাম মা-তিমি জানে না। কিন্তু এ কথা জানে, এখানে সমুদ্রের গভীরতা পনের- বিশ হাজার ফুট। দ্বিতীয়ত ভূগোলের ছাত্ররা এলাকাটাকে বলে গর্জনশীল চল্লিশা — Roaring Forties। কেন? কারণ দক্ষিণ গোলার্ধের এই চল্লিশ অক্ষাংশে, যার অপর 'নাম ‘অশ্ব অক্ষাংশ’— সেখানে সমুদ্র স্বতই অশান্ত। রণভেরী শুনে সমর-তুরঙ্গন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ যেন সমুদ্রের যৌবন, ভাদ্রের ভরা গঙ্গা। চঞ্চল, উচ্ছ্বাসময়, নিত্য নৃত্যরতা নটিনী। ভারি মনোরম। এ এলাকাটা মা-তিমির কাছে আরও একটি বিশেষ কারণে প্রিয়। প্রৌঢ়া সীমন্তিনীর কাছে কোন একটি বিশেষ পান্থাবাসের বিশেষ কক্ষ যেমন। কেন? এ জায়গাটা তার মধুযামিনীর স্মৃতিবিজড়িত। পাঁচ-পাঁচটা বছর আগে তরঙ্গভঙ্গ-চপলা এই সমুদ্রেই সে ঐ খোকন-পাগলার বাপের প্রথম দেখা পেয়েছিল। তখন ওর ভরা যৌবন। তৈলচিক্কণ নিটোল তনুদেহ, তলপেটে তরঙ্গায়িত যৌবনের অস্পর্শিত যুগল জয়স্তম্ভ। সে ছিল তখন নিঃসঙ্গসঞ্চারী— যেমন কণ্বমুনির আশ্রমে অনাঘ্রাতা শকুন্তলা। হঠাৎ দূর অতিদূর থেকে সমুদ্রতরঙ্গে ভেসে এল এক অদ্ভুত শব্দতরঙ্গ তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? বিস্ময়ে

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মা-তিমি! এ কার কণ্ঠস্বর? কোথা থেকে এ ডাক সে পাঠাচ্ছে? কেন? কী চায় সে?

দূরত্বটা মা-তিমি আন্দাজ করতে পারেনি। তোমরাও পারছ না কিন্তু! বিশ্বাস হবে— যদি বলি, দূরত্বটা ছিল ছয়-সাতশ কিলোমিটার? মেনে নিতে পারবে—কলকাতা থেকে কাশীর যা দূরত্ব, অত দূর থেকে খোকনের বাপ ঐ শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছিল দক্ষিণ অতলান্তিকের দিকেদিকে—জলতলে বিশেষ-বিশেষ স্রোতরেখা ধরে? আর তার একটি শব্দতরঙ্গ মা-তিমির শ্রুতিতে আঘাত করে তাকে উতলা করে তুলেছিল? বাস্তবে ঘটনাটা কিন্তু সেই রকমই ঘটেছিল। নীল তিমি হাজার-দেড়হাজার কিলোমিটার দূর থেকে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

মা-তিমি ঐ অজানা স্বজাতীয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। তারপর দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে এসেছিল। অভিসার একেই বলে। সমুদ্রের দুই দূরতম প্রান্ত থেকে দু-দুটি বিশালকায় জলজন্তু প্রভঞ্জন গতিতে ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে। ঘণ্টায় গড়ে বিশ কিলোমিটার বেগে সাঁতার কেটেও ওদের মিলিত হতে সময় লাগল আট দশ ঘণ্টা।

তারপর এই গর্জনশীল চল্লিশা অঞ্চলেই কেটেছিল ওদের মধুযামিনী।

বাচ্চাবেলায় ঝিল্লিমুখো তিমি বাপ-মায়ের লগে-লগে থাকে। এক পরিবারভুক্ত 'পড়'-এ সচরাচর তিন-চারটি তিমি থাকে বাপ, মা, হয়তো দুটি সন্তান। ক্রমে বাচ্চারা যৌবনপ্রাপ্ত হয়। বার-তের বছরেই কিশোরী-তিমিনী মা হওয়ার উপযুক্ত হয়ে পড়ে। মানুষ-সমেত যাবতীয় যূথবদ্ধ জীবের জীবনযাত্রার নিরিখে 'কুমারীত্ব' কথাটার কোন মানে নেই। কিন্তু মানুষের তো আছে? রবীন মৈত্রের 'উদাসীর মাঠ' ই শুধু নয়—- বিশ্বসাহিত্য অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের বেদনাদায়ক কাহিনীতে আকীর্ণ। ঝিল্লিমুখো তিমি এ বিষয়ে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। হে অমৃতের পুত্রগণ। জেনে রাখুন, নিজ পরিবারভুক্ত পুরুষতিমির সঙ্গে কখনও কোন ঝিল্লিমুখো কুমারী তিমি গোপন সঙ্গম করে না!

কৈশোর অতিক্রমণে কুমারীর দল নিজ 'পড' ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে দুনিয়াদারিতে। তখন তারা বেপরোয়া, উদ্দাম, নিরুদ্দেশযাত্রী। না, নিরুদ্দেশ নয়— উদ্দেশ্য একটা আছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না সেটা কী? টের পায় কী যেন নেই, কীসের যেন অভাব। শরীরমন একটা কিছুর প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে প্রহর গণে। ঠিক তখনই মাদী তিমি যদি শুনতে পায় দূর, অতিদূর থেকে ভেসে আসা একটা বিচিত্র আহ্বান তখনই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায়। বুঝতে পারে এ ডাক প্রজাতির গোত্রং নো বর্দ্ধতাম?

ওরা জোড় বাঁধে। তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় নয়। অনেক ভেবেচিন্তে। অনেক বাজিয়ে নিয়ে। কেন? ঐ যে বললাম জোড় ভাঙার কানুন নেই। সীমন্তে ওরা যে একবারই সিন্দুরবিন্দু দিতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদ বলে কিছু নেই ওদের সামাজিক সংবিধানে। না, সামাজিক আরোপিত কানুন নয়, এ একেবারে রক্তের মধ্যে নেশা — মজ্জায় মজ্জায় জড়ানো সাতপাকের বাঁধন— সে বন্ধন ওদের শুভবুদ্ধিতে নয়, স্বভাবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন তিমিনী অপর পুরুয়ের অঙ্কশায়িনী হতে পারে না। আজ্ঞে হ্যাঁ— চায় না' নয়, 'পারে না'— Physical inability— ব্যভিচারে ওদের স্বভাবজাত শারীরিক অক্ষমতা। বিপত্নীক বা অকৃতদার কোন পুরুষ তিমিও কোন তিমিনীর প্রতি যৌন আহ্বান জানায় না, যদি জানতে পারে সে বিবাহিতা, তার স্বামী বর্তমান! তাই তো বলছিলাম, তিমির দাম্পত্য-নাটকে নায়ক আছে, নায়িকা আছে, কিন্তু খলনায়ক অপাংক্তেয়! মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীই তো অনেক কিছু পারে না— এও সেই রকম এক জাতের অক্ষমতা। বিশ্বাসঘাতিনী হবার মত ক্ষমতাই নেই ওদের। ক্ষমাঘেন্না করে আমার নায়ক-নায়িকাকে তাদের অক্ষমতার জন্য না হয় মাপ করে দিন।

পাঁচ বছর আগে নিঃসঙ্গ-সঞ্চারিণী মা-তিমি এই সমুদ্রেই দেখা পেয়েছিল খোকনের

বাপের। গর্জনশীল-চল্লিশা-সমুদ্র চলোর্মি নিনাদে সেই প্রভঞ্জনগতি তিমিকে সাবধান বাণীও শুনিয়েছিল ন হন্তব্যো! ন হন্তব্যো!—খোকনের বাবা কর্ণপাত করেনি। পরিচয় হল, প্রণয় হল, হল পরিণয়। পাঁচ-পাঁচটা বছর তো বড় কম নয়। এই পাঁচ বছরে না-হোক দশবার ওরা যুগলে এই অশ্ব অক্ষাংশের মধুযামিনীর স্মৃতিবাহী এলাকাটা অতিক্রম করেছে—ক্রিলপাড়ায় যাওয়ার পথে, এবং ফেরার পথে। আজ খোকনের সঙ্গে সমুদ্রের সেই এলাকাটা পার হতে গিয়ে ওর স্মৃতিতে প্রথম যৌবনের সেই মিলনমধুর মূহূর্তগুলি ভেসে উঠছিল কি না কে জানে? আর সেই সূত্রে, এই এখানেই, খোকনের বাপের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথাটাও।

সে তো একেবারে হাল আমলের কথা। মাস-পাঁচেকও হয়নি মা-তিমি বিধবা হয়েছে। এবার যখন তারা দক্ষিণমেরুর ক্রিলপাড়া থেকে ফিরছিল, খোকা তখন ওর মায়ের পেটে। স্বামী-স্ত্রীতে একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। হঠাৎ মা-তিমি প্রতিহত শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে টের পেল সামনে প্রকাণ্ড কী যেন একটা জলে ভাসছে। না, জলচর জীব নয়, ধাতব প্রতিধ্বনি! তার মানে ঐ সমুদ্রের আপদ তিমিঙ্গিল!

জাহাজ মানেই কিন্তু শত্রু নয়। মাঝসমুদ্রে এমন ভাসমান ধাতব জন্তুর সাক্ষাৎ ওরা বারে বারেই পায়। তারা কোন ক্ষতি করে না। মা-তিমি তা সত্ত্বেও সঙ্গীকে খবরটা জানাবার জন্য একটা শব্দতরঙ্গ জলে ছেড়ে দিল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে ওর কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হয়ে গেল যেন! মা-তিমি প্রাণপণে ছুটে গেল শব্দটা লক্ষ করে। যা দেখল, তাতে ...উঃ!

ওর অসীম বলশালী জীবনসঙ্গী-এতদিন যার প্রতাপে কোন হাঙর, রাক্ষুসে তিমি ওদের ধারেকাছে ভিড়তে সাহস পেত না—সে ভাসছে জলে! উল্টো হয়ে। যদি খোকনের বাপ বেঁচে থাকত,—যদি অন্তিম মুহূর্তে জীবনসঙ্গিনীর একটু সান্ত্বনার প্রত্যাশী হয়ে থাকত তাহলে মা-তিমি নিশ্চয় ছুটে যেত তার কাছে। দুই হাতডানা দিয়ে জাপটে ধরত। কিন্তু না, মৃত্যুকে সে চেনে। গর্ভস্থ সন্তানের কথা চিন্তা করে পালিয়ে এসেছিল। দশ কোটি বছর ধরে যে ছিল সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিপতি, আজ সে নিতান্ত অসহায়। ঐ অচেনা শত্রুর বিরুদ্ধে। তিমিঙ্গিল!

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে মা-তিমি খোকন সোনাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। খোকন এখন অনেকটা ডুব দিতে পারে— তা প্রায় দুশ মিটার। ওর মা অবশ্য তার দেড় গুণ গভীরে যেতে পারে। খোকন মাঝে-মাঝে বায়না ধরে, সে আরও গভীরে যাবে— জলের একেবারে তলায় কী আছে দেখে আসবে। বোধ করি তারও ধারণা, জলের একেবারে নিচের তলায় আছে শঙ্খ-কড়ি-প্রবাল ঘেরা রাজপ্রাসাদ, সেখানে মুক্তোর ঝালর ঝোলানো সোনার পালঙ্কে রাজকন্যা ঘুম যাচ্ছেন। না-তিমি রাজি হয় না। অঙ্ক কযতে না-জানলেও মা-তিমি জানে— সে যতটা গভীরে যেতে পারে (৩৫০ মিটার বা ১২০০ ফুট) সেখানে জলের যা ঔদক চাপ (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৮৫ কে.জি., তুলনায় সমুদ্রের উপরিভাগে মাত্র ১ কে.জি.) তা ঐ তিনমাসের বাচ্চা সইতে পারবে না। একদিন তো রাগ করে বলেই বসল গিয়ে দেখ, কেমন লাগে! বেশ তো চল!

খোকন সেদিন পালিয়ে বাঁচে। বাস্! সে কী চাপ! প্রাণ যায়!

ওরই মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হল। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। অশ্ব অক্ষাংশের উত্তাল সমুদ্র লক্ষ-লক্ষ হাতছানি দিয়ে যেন অস্তগামী সূর্যকে 'টা টা' জানাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেই একটা ধাতব জলজন্তু পশ্চিমমুখো চলে গেছে—তার নিঃশ্বাসের কালো ধোঁয়া তখনও মিলিয়ে যায়নি আকাশে। এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ এক্কা-দোক্কা খেলছে—প্রিং প্রিং করে লাফিয়ে উঠছে, ঝুপঝুপ করে আবার জলে পড়ছে। ওরা মায়ে-পোয়ে খোশমেজাজে চলেছে দক্ষিনপানে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, মা-তিমি তার হাতডানা দিয়ে খোকনকে ঝাড়লে এক থাপ্পড়। আর তৎক্ষণাৎ ডুব দিলে খাড়া সমুদ্রের গভীরে। এক্কেবারে সিধে।

নাক বরাবর। কী ব্যাপার? ব্যাপার জানা আছে। খোকন এ সঙ্কেতের অর্থ বোঝে। তাকে যত্ন করে শেখানো হয়েছে। এমার্জেন্সি লেসন নম্বর টু। কেন, কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করতে নেই। এ এক্কেবারে জঙ্গি হুকুম :

ডাউন টার্ন! ফরোয়ার্ড মার্চ!

ডুবছে তো ডুবছেই। যেন অতলস্পর্শী পাতকুয়োয় নেমে যাচ্ছে মগ-সমেত একটা বালতি। বালতির গায়ে মগটা লটকানো। এক্কেবারে খাড়া! ডুব-ডুব-ডুব! যেন ওলনের দড়ি। কিম্বা কয়লাখনির খাঁচায় বাচ্চা- কাঁকালে খাদ-কামিন। খেলাটা খোকনের ভালোই লাগছিল প্রথমটা; কিন্তু একটু পরেই মালুম হল— না! এ তো খেলা নয়! সামথিং সিরিয়াস! মা নিশ্চয় কোন বিপদের সঙ্কেত পেয়েছে। কী বিপদ? মা তো কোন কিছুকেই ডরায় না!

ডরায়! ঈশপ বুড়োর সেই গল্পটা! একটা পাটকাঠিকে মট করে ভাঙতে পার বলে ভেব না গোটা আঁটিটাই অমন মট করে ভাঙা যায়!

মা-তিমি প্রতিহত শব্দতরঙ্গে টের পেয়েছিল— একঝাঁক রাক্ষুসে তিমি দক্ষিণ দিক থেকে এদিক পানে এগিয়ে আসছে। দলছুট দু'একটা রাক্ষুসে তিমি ওকে দেখলে পালাবার পথ পাবে না—কিন্তু এ যে এক দলে এগারটা! হ্যাঁ, গুণে-গুণে এগারটা। রীতিমত শব্দতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি গুণে জটিল অঙ্ক কষে মা-তিমি সমঝে নিয়েছে। তোমাদের ল্যাবরেটারির 'টিউনিং 'ফর্ক'-এর বাপেরও ক্ষমতা হবে না সে অঙ্ক কষবার। মা-তিমি বুঝেছে সংখ্যায় ওরা এগার জন। ওদের গতিমুখ খাড়া-উত্তর থেকে দশ-ডিগ্রি পূর্বে। সমুদ্র-সমতল থেকে পনের ডিগ্রি উপর দিকে। ওদের গতিবেগ সেকেন্ডে ছয় মিটার। জলগতিবিদ্যার জটিল অঙ্কের নির্ভুল সমাধান—ত্রিমাত্রিক অঙ্ক। মা-তিমি ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার বেগে চার-পাঁচ ঘণ্টা নাগাড়ে সাঁতরাতে পারে। প্রথম দশ মিনিট গতিবেগে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে যাবে। ঝাঁকবাঁধা রাক্ষুসে তিমির সাধ্য নেই ওকে সাঁতরে ধরতে পারে। কিন্তু খোকন? সে যে মাত্র তিনমাসের চুন্নমুন্নু! সে পারবে কেন? একঝাঁক রাক্ষুসে তিমির আক্রমণে—আহ্! মা-তিমি আর ভাবতে পারে না!

দুশ, আড়াইশ, শেষমেশ তিনশ মিটার, মানে প্রায় হাজার ফুট! খোকনের রীতিমত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এত নিচে সে কখনও নামেনি। মনে হচ্ছে কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ চেপে ধরছে। বুকটা বুঝি এখনই ফেটে যাবে। কিন্তু উপায় নেই। মায়ের জঙ্গি হুকুম! ও অমান্য
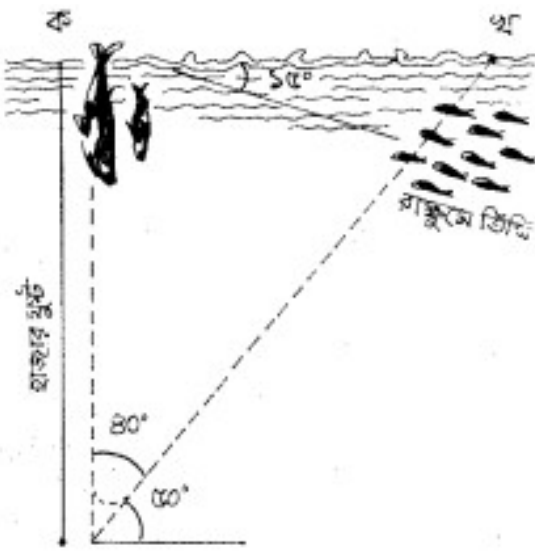
মা-তিমি কেমন করে রাক্ষুসে তিমির ঝাঁক এড়িয়ে গেল

করতে জানে না। ঐ অত গভীরে নেমে মা তিমি উপরপানে আবার একটা শব্দতরঙ্গ ছেড়ে দিল। কী যেন অঙ্ক কযে সে এবার উপর দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু না—সোজা নয়, পঞ্চাশ ডিগ্রি ত্যারচা হয়ে। দক্ষিণপানে। কেন গো? এমনভাবে ত্যারচা হয়ে ভেসে ওঠার মানেটা কী? এতে তো উপরে পৌঁছতে অনেক বেশি সময় লাগবে—ভাবলে খোকন। সে বেচারি তো জানে না—জলগতিবিদ্যায় ওর মা একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত। মা-তিমি জানে, সে যখন খ-বিন্দুতে ভেসে উঠবে আরও দশ-বার মিনিট পরে, ততক্ষণে রাক্ষুসে তিমির ঝাঁকটা পৌঁছে যাবে কবিন্দুতে সেই যেখানে ওরা মায়ে-পোয়ে প্রথম ডুব মেরেছিল। আর খ-বিন্দুতে ভেসে উঠেই ওরা দুজনে যে-নিঃশ্বাস ফেলবে সেই ফোয়ারা রাক্ষুসেদের নজরে পড়বে না—কারণ ঘটনাটা ঘটবে তাদের গতিমুখের বিপরীত প্রান্তে।

ফন্দিটা ভালোই। কিন্তু খোকনের যে আর দম নেই। ডুব মারার আগে তো আর জানত না। না-হলে যথেষ্ট বাতাস চারিয়ে নিত সারাদেহের রক্তকণিকায়। অনেক, অনেকক্ষণ আছে ওরা জলের তলায়। ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। চাই একমুঠো বাতাস। একটু বাতাস। এটু বাতা—! এট্....

আর পারল না। সহ্যক্ষমতার শেষ সীমা অতিক্রম করল। মরিয়া খোকন মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করল বাধ্য হয়ে। আর ত্যারচা নয়। খাড়াভাবে উঠবে এবার। মা জানত। সে সতর্ক ছিল। জানত খোকন পারবে না। ভুলটা করতে চাইবে। তাই তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হল। ঠাস করে এক প্রচণ্ড থাপ্পড়। হাতডানায়। মুখটা টনটন করে উঠল খোকনের। তীব্র যন্ত্রণা! ককিয়ে ওঠে! যতই কষ্ট হোক, আর অবাধ্য হল না। মায়ের পিছন-পিছন, অতঃপর। বুঝল মা বাধ্য হয়ে ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। কী, কেন, জানে না। না জানুক। প্রয়োজনটা মর্মান্তিক। মা তো বোকা নয়। কী সেই কারণটা?

দাঁতে দাঁত দিয়ে... না, ভুল বললাম— ওদের দাঁত নেই। কোনক্রমে দম ধরে। বাঁকা হয়ে উঠছে। চাপটা কমছে। জলের চাপ। কমছে। আরাম। কিন্তু? বাতাস? বাতা- -? আঃ! শেষ পর্যন্ত খোলা আকাশের নিচে পৌঁছেছে—কী আরাম! কী আরাম! ঘনঘন সাতআটবার নিঃশ্বাস নিল মায়ে-পোয়ে-ভরা বুক, ছড়িয়ে দিল শক্তিসঞ্চারী অক্সিজেন সারা দেহের রক্তকণিকায়। মা-ছেলে তালে-তালে শ্বাস ফেলে শান্ত হল।

এতক্ষণে মা-তিমি খোকনকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করল। মুখের যেখানটায় থাপ্পড় কষিয়েছিল সেখানে আলতো করে হাতডানার প্রলেপ দিল। যেন বলল হ্যাঁরে খোকন, মেরেছি বলে রাগ করেছিস? বোকা ছেলে! আমি কি ইচ্ছে করে তোকে কষ্ট দিচ্ছিলাম? উপায় কী ছিল বল্? এই শোন...

উচ্চ-উচ্ছায়ের কিছু শব্দতরঙ্গ ছুঁড়ে দিল উত্তরদিকে। প্রত্যাশিত সময়ের ব্যবধানে রাক্ষুসে তিমিগুলোর দেহে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি ফিরে এল ওদের প্রখর শ্রুতিতে। তীক্ষ্ণ অভিনিবেশের সঙ্গে শব্দের পার্থক্যটা সমঝে নিল খোকন। জীবনের আবশ্যিক পাঠ। ভুল হলে চলবে না। হ্যাঁ, শব্দতরঙ্গটা ভিন্ন জাতের বটে!

মা যেন বললে, তফাৎটা বুঝেছিস? একে বলে রাক্ষুসে তিমি। আমাদের যম! খোকন যেন ঘাড় নেড়ে সায় দেয় হ্যাঁ মা, বুঝেছি!

বল্ দিকিন— ক'টা রাক্ষুসে তিমি আছে?

দশটা।

হয়নি। আবার শোন...

ইতিমধ্যে রাক্ষুসে তিমির ঝাঁকটা আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। তা হোক, তবু এবার শব্দতরঙ্গের পার্থক্যটা সমঝে নিয়ে খোকন তার হোমটাস্কের অঙ্কটা শুধরে নিল। বললে, না মা, দশটা নয়, এগারটা।

মা-তিমি খুশি হল। বললে, ঠিকমত চিনে নিয়েছিস তো? এই হল আমাদের দু'নম্বর জাতশত্রু!

ওদের জাতের তিন-তিনটে জাতশত্রু। কায়দায় আক্রমণ করলে শূলনাসা অবশ্য ওদের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। করে না; কারণ শূলনাসার সঙ্গে ঝিল্লিমুখোর বিরোধ বাধার কোন কারণ নেই। অষ্টাপদ তো ওদের ধারেকাছে আসে না। ওদের জাতিগত তিনজন জাতশত্রুর প্রথমটাকে খোকন একেবারে শৈশবেই চিনে নিয়েছে। সে শিক্ষার শাশ্বত স্বাক্ষর লেখা আছে খোকনের পাঁজরে: হাঙর।

এই রাক্ষুসে তিমি হচ্ছে ওদের দু'নম্বর জন্মশত্রু। মাংসাশী জীব। স্তন্যপায়ী ঝিল্লিমুখোর মাংস খাওয়ার লোভ তাদের ষোল আনা; কিন্তু একা-একা লড়বার তাগদ নেই। তাই ওরা ঝাঁক বেঁধে এসে আক্রমণ করে বড় জাতির তিমিকে। ক্রিলপ্রাশনের আগেই আজ খোকনসোনার হাতেখড়ি হল। চিনে নিল ঐ মাংসাশী দানবটাকে। আর ভুল হবে না।

মা-তিমির একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তিন নম্বর জাতশত্রুটাকে কেমন করে চেনাবে? তিমিঙ্গিল!

খোকনের বাপ ছিল অসীম বলশালী। অথচ চোখের পলকে.... না! ঐ তিমিঙ্গিলের হাত এড়িয়ে কেমন করে বাঁচতে হয় সে তথ্যটা মা-তিমি নিজেই জানে না। খোকনকে কী শেখাবে?

এ যেন গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির মেলা।

নানান জাতির তিমি এসে জুটেছে পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে- দশনামী সম্প্রদায়ের কেউ বাদ নেই! নীল-ডানা-সেঈ-কুঁজি আরও হরেক সম্প্রদায়। কপিলমুনির এই আশ্রমে পৌঁছে আমাদের খোকন-তিমি একেবারে তাজ্জব! অকুস্থল বলতে দক্ষিণ জর্জিয়ারও দক্ষিণে, তিম্যাদিদের অভিধানে যাকে বলেছে 'ক্রিল পাড়া'। 'ক্রিল' মানে, আগেই বলেছি, খুব ছোট জাতের কুড়োচিংড়ি। সে ব্যাখ্যাটা ছিল দায়সারা, অবৈজ্ঞানিক। আসলে 'ক্রিল' কোন জাতের চিংড়ির বিজ্ঞানসম্মত নাম নয়! বলা যায় ক্রিল হচ্ছে ঝিল্লিমুখো তিমির সাধারণ খাদ্যের নাম, বিচালি যেমন গরুর, ভাত যেমন ভেতো বাঙালির। ঐ ক্রিলের সিংহভাগ দখল করে আছে প্রায়-চিংড়ি জাতের 'ইউফোরিয়া

সুপার্বা'। এ ছাড়াও নানান জাতের পোকা আছে মিশে, খোল ভুষি যেমন থাকে গরুর খাদ্যে, ডাল এবং হ্যাংচাপ্যাচাং তরকারি যেমন ভেতো বাঙালির অন্নভোগে। সেইসব সাইক্লোপস, টেরাপড় মোলাসেস প্রভৃতি মোটেই চিংড়িমাছের মত দেখতে নয়। সবটা মিলিয়েই 'ক্রিল'। ঝিল্লিমুখো তিমির প্রধান নয়, একমাত্র খাদ্য। দাঁতাল তিমির যে তা নয়, সেকথা আগেই বলেছি।

ক্রিল সব সমুদ্রেই কমবেশি আছে। সমুদ্র গভীরে নয়, উপরিভাগে বেশি। কিন্তু দক্ষিণমেরু অঞ্চলে এরা গ্রীষ্মকালে জন্মায়। কোটি-কোটি–দেওয়ালির সময় আমাদের দেশে বাদলাপোকার মত, যদিও হাজার-হাজার গুণ বেশি। এরা কী খায়? আরও ছোট জাতের কীট, যার সাধারণ নাম প্ল্যাংটন। দক্ষিণার্ধের গ্রীষ্মকালে, অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে—যখন দক্ষিণ মেরুবলয়ের বরফ অনেকখানি গলে যায়, আর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই আকাশে সূর্য থাকে, তখন নানান জাতের ঝিল্লিমুখো এখানে সমবেত হয়—মহাভোজের আসরে।

খোকন-তিমির মনে দু-দুটো খটকা লেগেছিল। কেন ওর মুখে ঐ ঝিল্লিগুলো গজাচ্ছে। উপরের চোয়ালে দশ-বার মিলিমিটার তফাতে গজানো ঐ ঝিল্লিগুলোকে ওর মনে হত অহৈতুকী আপদ। এখন ওর বয়স ছয় মাস – মানুষের বাচ্চার যে-সময় অন্নপ্রাশন হয়। ঝিল্লিগুলো এতদিনে প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার, মানে প্রায় ফুটখানেক লম্বা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, ওর গলায় এতগুলো খাঁজ কেন? কতগুলো? তা প্রায় শতখানেক। ক্রিলপাড়ায় পৌঁছে তার কারণটা বুঝল। ক'দিন ধরেই ও একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল—ওর মা আর অন্যান্য তিমিরা কী কাণ্ডটা করছে। প্রথমটা কিছুই ঠাওর হল না! ব্যাপারটা কী? ওরা অমন বেমক্কা বিরাশি সিক্কা হাঁ করে জল কেটে চলেছে কেন? আক্কেল হল মায়ের কাছে থাপ্পড় খেয়ে। অভ্যাস
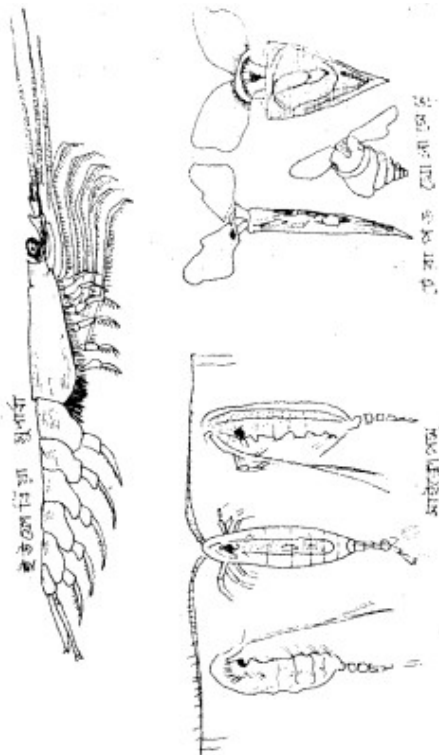
মত মায়ের তলপেটের কাছে ছোঁকছোঁক করতে গেছে-- মিনি খাওয়ার লোভে। মা-তিমি তার লেজের বাড়ি কষিয়ে দিল একটা। যেন বলতে চাইল ধেড়ে ছেলে! লজ্জা করে না। তখন যেন কিছুটা মালুম হল। যে-প্রেরণায় প্রথম মায়ের দুধ খেতে এগিয়ে গিয়েছিল সেই প্রেরণাতেই আর পাঁচটা তিমির দেখাদেখি ও হাঁ করে মায়ের মত এগিয়ে চলল। এখন বুঝল গলায় কেন অতগুলো খাঁজ আছে- যাতে সে বিরাশি সিক্কা হাঁ করতে পারে। অনেক, অনেকটা জল ঢুকে গেল ওর মুখে। এবার মায়ের দেখাদেখি ও মুখটা বন্ধ করল। ব্যস্! ঝিল্লির ফাঁক দিয়ে জলটা গেল বেরিয়ে। ক্রিলগুলো আটকে গেল মুখগহ্বরে। জিভটা টাকরায় ছোঁয়াতেই আহ্ কী আরাম! অদ্ভুত একটা স্বাদ। কোৎ করে ঢোক গিলেই আবার হাঁ। ক্রিলের স্বাদ পেয়েছে। যা এর সাধারণ খাদ্য। অন্নপ্রাশনে কেউ উলু দিল না, কেউ শাঁখ বাজাল না, খোকনের ক্রিলারম্ভ উৎসব উৎযাপিত হল। এরপর শুধু খাওয়া খাওয়া আর খাওয়া। দিবারাত্র নয়, রাতের বালাই-ই নেই— চৌপর দিনমান। তাই যতক্ষণ জেগে আছে ততক্ষণই খাচ্ছে। সব্বাই। নীল-ডানা-সেঙ্গি-কুঁজি।

ক্রিলপাড়ায় এসে খোকন তো বেজায় খুশি। আসবার পথে একটা জিনিস ও বেশ অনুভব করেছে। জলটা দিন-দিন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। আমরা যেমন টের পাই কেদার-বদ্রি যাওয়ার পথে। তীর্থপ্রান্তে যতই এগিয়ে যাই ততই শীতটা বাড়ে। চল্লিশ অক্ষাংশের সেই নীলচে সবুজ উষ্ণ স্রোত তখন স্বপ্নকথা। সমুদ্র বরফঠাণ্ডা। প্রকাণ্ড বড়-বড় পাহাড়ের মত বরফের চাঙড়। জলের উপর যতটুকু জেগে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি ডুবে আছে জলে। আরও অনেকগুলি পরিবর্তন। সেই তারায়-ভরা অবাক আকাশটা কোথায় বুঝি হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে চাঁদের হাসি। সমুদ্রের উপরতলা কোন সময়েই তেমন নীরন্ধ্র অন্ধকার হয় না। কিছুটা আলো থাকেই। কারণ একচোখো দৈত্যের মত ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে শীতকাতুরে সূর্যটা অষ্টপ'র চব্বিশ ঘণ্টাই দিগন্তের কাছাকাছি হামেহাল হাজির। একবারও দিগন্তের ওপারে ঘুম যায় না। সূর্যটা এখন ঘুমকাতুরে তো হবেই–এ পাড়ায় এখন সূর্যকে নাগাড়ে চার-পাঁচ মাস একটানা ডিউটি দিতে হবে। তারপর হবে তার কুম্ভকর্ণী ঘুমের আয়োজন—টানা সাত-আট মাস। মাঝরাতের সূর্য— সে এক অবাক কাণ্ড। ঐ ঘোলাটে সূর্যের আলোয় দিগন্তে যে রঙের বাহার হয়-অরোরা বোরিয়েলিসের বর্ণবৈচিত্র্যের আলিম্পন হয়, খোকন তিমি তা অবশ্য দেখতে পায় না। রং সে চেনে না – লাল-নীল-সবুজ-হলুদ সব একাকার। দশ কোটি বছর ধরে কর্ণেন্দ্রিয়টাকেই শুধু প্রখর করেছে, চোখটাকে নয়। তাই মানুষের শ্রুতিতে যে-শব্দ যন্ত্রের সাহায্যেও ধরা যায় না, ওরা তা শুনতে পায়; কিন্তু রঙের বাহার চোখ মেলে উপভোগ করতে পারে না। তা না পাক, তবু বরফের পাহাড়ে প্রতিফলিত রৌদ্রটা যে আরামদায়ক তা অনুভব করে। খোকন তিমি আরও লক্ষ করে দেখেছে, এখানে আছে আরও সব অদ্ভুত জীব-জন্তু— যা সে আগে দেখেনি। এক জাতের পাখি— এ্যালবাসের চেয়েও বড়, অথচ তারা উড়তে পারে না। থপথপ করে হেঁটে বেড়ায় বরফের উপর। পেটটা সাদা, ডানাদুটো কালো। আছে বড়-বড় শীল মাছ, সিন্ধুঘোটক। বড় মানে অবশ্য এমন কিছু বড় নয়। ওর চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোট। এখানে ওর নিত্য নতুন সাথী হচ্ছে। মনটা তাই খুশিয়াল, এতদিন মা ছাড়া আর কোন স্বজাতীয়কে সে বড় একটা দেখেনি। মাসির কথা তার মনেই পড়ে না। অতিশৈশবে মাসি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অথচ এখানে এখন অলিতে-গলিতে, সামুদ্রিক পথের বাঁকে-বাঁকে নানান জাতভাই। কেউ-কেউ এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাতডানা বুলিয়ে আদর করে। প্যারাম্বুলেটারে বসা ফুটফুটে বাচ্চাকে মায়ের সঙ্গে পার্কের চত্বরে বেঙ্গিবেঙ্গি যেতে দেখলে আমরা যেমন তার গালটা টিপে দিই। একসঙ্গে এত-এত তিমি দেখে খোকন-তিমি বেজায় খুশি।

ওর মায়ের অবস্থাটা ঠিক বিপরীত। মা-তিমির মনে হচ্ছিল –এ বছর ক্রিলপাড়ার বাৎসরিক মেলাটা যেন জমেইনি। আগেকার দিনে রীতিমত গায়ে গায়ে লাগা ভিড় হত। এর লেজের ঝাপটা, ওর হাতডানার গুঁতো— আর সবাই যেন মুখে বলত ‘সরি’! এ বছর মেলাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। কুঁজো তিমি একটাও নজরে পড়েনি। ওরা কি এ বছর আসেনি? নাকি ওরা আর অবশিষ্ট নেই? অত-অত কুঁজো তিমি একেবারে ফুরিয়ে গেল কেন? সেই তিন নম্বরের অত্যাচারে? মাত্র পাঁচসাত বছর আগেও সে ঝাঁকে-ঝাঁকে নীল তিমি দেখেছে, কী প্রকাণ্ড তাদের দেহ! কী রাজকীয় চালচলন! অগাধ জলসঞ্চারী তার স্বচ্ছন্দ গতি দেখবার মত। দেখলেই সম্ভ্রমে মাথাটা নিচু হয়ে যায়—হ্যাঁ, তিম্যাদিকুলের রাজা বটে' নিজের শৈশবে মা-তিমি যখন ক্রিলপাড়ার মেলায় আসত তখন হাজারে-হাজারে নীল তিমিকে বিচরণ করতে দেখেছে। ওর মা ওকে শিখিয়েছিল—নীল তিমি দেখলে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াতে উনি আমাদের রাজামহাশয়!

অথচ এ বছর, এতদিনে একটি মাত্র নীল তিমিও সে দেখেনি।

- মা-তিমি তো সমুদ্রবিজ্ঞানীদের প্রচারিত পত্রিকা পড়ে না, তাই পরিসংখ্যানটা তার জানা নেই; কিন্তু বেশ অনুভব করে দিন-দিন ওরা সব্বাই সবংশে শেষ হয়ে আসছে। একে-একে নিভিছে দেউটি। নীল-কুঁজি-রাইটদের একজনকেও দেখতে পায়নি—হয়তো তারা ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত; ওরা, অর্থাৎ ডানা তিমির সংখ্যাও যথেষ্ট কমে গেছে। এখন হত্যা-উৎসব চলছে রামদাঁতালদের পরিবারে। এই সাউথ জর্জিয়া দ্বীপের আশে-পাশে বছরে তিন থেকে চার হাজার নীল তিমি হত্যা করা হত পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। এখন সেটা হচ্ছে রামদাঁতাল বংশে। বিশ-ত্রিশ বছর আগে তিমি-শিকার ব্যবসা হিসাবে যত লাভবান ছিল এখন ততটা নয়— তিমিই নেই— তা লাভ হবে কী? তাই ক্রমে ক্রমে হত তিমির সংখ্যাটাও যেমন কমেছে তেমনি এ ব্যবসায় নিয়োজিত জাহাজের সংখ্যাটাও কমেছে। কী পরিমাণে সেটা কমেছে তা নিচের তালিকা থেকে খানিকটা আন্দাজ হবে

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের খতিয়ান:-

বৎসর	ভাসমান কারখানার সংখ্যা	তিমি জাহাজ সংখ্যা	কুঁজি ধৃত	নীল-তিমি ইউনিট(*) ধৃত	য... তে...
১৯৫৭-৫৮	২০	২৩৭	৩৯৬	১৪,৮৫১	৩০
১৯৫৯-৬০	২০	২২০	১৩৩৮	১৫,৫১২	২৮
১৯৬১-৬২	২১	২৬১	৩০৯	১৫,২৫৩	২৭
১৯৬৩-৬৪	১৬	১৯০	২	৮,৪২৯	২২
১৯৬৫-৬৬	১০	১২৯	১	৪,০৮৫	১৫
১৯৬৭-৬৮	৮	৯৭	০	২,৮০৪	অজ
১৯৬৯-৭০	৬	৮৫	০	২,৪৭৭	অজ

নীল তিমি ইউনিট একটি সংখ্যায় যা বোঝানো হয়, ১ টি নীল তিমি, ২টি ডানা তিমি, ২১/২ টি কুঁজিতিমি, অথবা ৬টি সেঈ তিমি।

১ ব্যারেল = ১৭০ কিলোগ্রাম।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৬-র পরে আর কুঁজি তিমি হত্যা করা যায়নি। অর্থাৎ হয়তো তারা নেই, তাই তাদের হত্যা করা হচ্ছে না।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটি সাম্প্রতিক সংখ্যা পড়ে বুঝতে পারছি, এতেও

মানুষের শিক্ষা হয়নি! কুঁজি, রাইট, নীল তিমিকে নিঃশেষ করে এখন রামদাঁতালদের নির্বংশ করতে মেতেছে মনুষ্যসমাজ! দক্ষিণ গোলার্ধে তিমি-শিকারী জাতির প্রধান দুই শরিক গত দু'বছরে যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সেটাও প্রতিফলিত হয়েছে ঐ পত্রিকায়।

		রাশিয়া	জাপান
১৯৭৫-৭৬ সালে নিহতের সংখ্যা	ডানা তিমি	৮৮	১১৮
	রামদাঁতাল	৬,৪৫৪	৫৯২
১৯৭৬-৭৭ সালে হত্যা-অনুমতি	ডানা তিমি	০	০
	রামদাঁতাল	৩,৮৪১	৩০১

হয়তো ভাবছ, এ খবরটা জানা থাকলে মা-তিমি নিশ্চিন্ত হত? মোটেই না। মা-তিমি জানে, 'তিমিরক্ষণ সমিতির' তোয়াক্কা না-রেখেই অনেকে ডানা তিমি শিকার করে, আর খবরটা বেমালুম চেপে যায়।

মা-তিমি ক্রিল খায় আর সর্বক্ষণ বাচ্চাটার দিকে নজর রাখে। তার শুধু ঐ এক চিন্তা — এই ক্রিলপাড়ার আনন্দমেলায় তিমিঙ্গিলের দল কখন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে। আসবেই! বছরে বছরে তারা আসে! তখনই শুরু হয়ে যায় হত্যা-উৎসব! আনন্দমেলা মূহুর্তে রূপান্তরিত হয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে---একতরফা যুদ্ধ! বরফের বলয়ে আটক-পড়া সমুদ্রের জল লালে লাল হয়ে যায়। গলিত শবের দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে যায়। মায়ের তাই শুধু ঐ এক চিন্তা এই তিন নম্বর জাতশত্রুকে খোকন এখনও চেনেনি। হাঙরকে চিনেছে, রাক্ষুসে তিমিকেও, বাকি আছে ঐ শেষ শিক্ষা। তাকে চিনিয়ে দিতে হবে। তার হাত থেকে পালাবার কায়দাটা—না, সে কায়দাটা সে নিজেই জানে না। তার মা তাকে শেখাতে পারেনি। কয়েকটি সাবধানতার ইঙ্গিত দিয়েছিল মাত্র— সেটুকুই ও শিখিয়ে দিতে পারে।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। তারা এল দলে-দলে। কালবৈশাখী মেঘের মত তাদের দেখা গেল দূর থেকে। তারপরেই তারা এসে গেল—ঝাঁকে-ঝাঁকে, তিমিঙ্গিলের ঝাঁক!

একদিন এক কাণ্ড হল। খোকন একটা প্রকাণ্ড, অতি প্রকাণ্ড, জীবকে দেখে ছুটে পালিয়ে এল মায়ের কাছে। এমন জীব খোকনসোনা জীবনে দেখেনি। মা-তিমি ঘুরে দেখেই চিনতে পারল। এই তো! রাজামহাশয় স্বয়ং! প্রকাণ্ড একটা মদ্দা নীল তিমি।

সসম্ভ্রমে মা-তিমি সরে গেল। নীল তিমিটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে আসছিল তার দিকে। হঠাৎ থমকে থেমে গেল। তারপর যেন নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। লজ্জা পেল! মা-তিমি ডানা তিমি। মাদী নীল তিমি নয়!

বলি-বলি করেও মা-তিমি সঙ্কোচে প্রশ্নটা পেশ করতে পারল না আপনি বুঝি একা?

হ্যাঁ, তাই হবে। ক্রিলপাড়ার এই প্রকাণ্ড মেলাচত্বরে দ্বিতীয় কোন নীল তিমি নজরে পড়েনি তখনও। বিজ্ঞানীরা বলেন, এখন সারা পৃথিবীতে নাকি মাত্র পাঁচ থেকে ছয় হাজার নীল তিমি অবশিষ্ট আছে। আর মানুষের তাড়নায় তারা এমন যূথভ্রষ্ট হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে যে একজন অপরজনের সন্ধানই পায় না। ওদের প্রজনন হার তাই অতি অল্প। হয়তো এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই নীল তিমি নির্বংশ হয়ে যাবে—যেমন

হয়ে গেছে ডোডো পাখি; যেমন হতে চলেছে—কোয়ালা, পাণ্ডা, অপোসাম, প্লাটিপাস।

মনটা খারাপ হয়ে যায় মা-তিমির। এই সুবিস্তৃত ক্রিলপাড়ার মেলায় হাজার-হাজার অন্য জাতির ক্ষুদ্রতর তিমির অরণ্যে ঐ নিঃসঙ্গ সঞ্চারী বিশাল মদ্দা নীল তিমিটা ক্রমাগত শব্দতরঙ্গ ছেড়ে চলেছে সাড়া দাও! সাড়া দাও! তুমি কি এসেছ?

রাজামহাশয়ের বয়স হয়েছে! প্রৌঢ় তিমি। বহু মৃত্যুকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কে জানে, তাঁর সঙ্গী-সাথী-সহচর-সন্তানেরা হয়তো একে-একে তাঁর চোখের সম্মুখেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে হারপুন গান-এর বিস্ফোরণে! অমোঘ মৃত্যুকে এড়িয়ে এই প্রৌঢ় বয়সে তিনি আজও টিকে আছেন। হয়তো আজও আছে তাঁর প্রজনন ক্ষমতা; হয়তো প্রজাতির ঋণ শোধ করে যেতে তিনি আজও সক্ষম। আর তাই তিমি-শিকারীদের জাহাজের ভিড়ে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে মহাসঙ্গম-প্রত্যাশী এসে উপস্থিত হয়েছেন এই ক্রিলপাড়ার মহাসঙ্গমে। একটিও স্বজাতিকে খুঁজে পাচ্ছেন না!

উদাসী বাউলের মত যেন একতারা বাজিয়ে হেঁকে চলেছেন সাড়া দাও! সাড়া দাও! তুমি কি এসেছ?

ক্রিলপাড়ার বাৎসরিক মেলা এবার শেষ হয়ে এল প্রায়। যাকে বলে ভাঙা হাট। শীত বাড়ছে একটু-একটু করে। বরফের পাহাড়গুলো ক্রমশ কোঁৎকা হচ্ছে। বরফের বলয়ের মাঝে মাঝে জেগে-থাকা নীল সমুদ্রের টুকরোগুলো শীতে ক্রমশ কুকুরকুণ্ডলী হচ্ছে, সাদা আলোয়ান জড়িয়ে যেন বেনের পুঁটুলিতে পরিণত হতে চায়। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওরা নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে; তখন দিগন্তজোড়া শুধু বরফ আর বরফ। ঐ বরফের বলয়ে আটকে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য! তাই রোজই যেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে তিম্যাদিদের নানান প্রজাতি উত্তরদিকে রওনা দিচ্ছে—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দিকে। ছয় মাসের জন্য। সকলেরই পেট এখন ভর্তি, ব্লাবারে সঞ্চিত হয়েছে আগামী দিনের রসদ। মা-তিমির সঙ্গে এ বছর ক্রিলপাড়ার মেলায় আরও কয়েকজনের আলাপ-পরিচয় হয়েছে। বস্তুত ওরা কয়জন এ কয়মাস একসঙ্গেই ঘোরাফেরা করেছে, ক্রিলপাড়ার পংক্তিভোজনে অংশীদার হয়েছে। এমনভাবে ঝাঁক বাধাটাও ওদের স্বভাব—এতে হাঙর বা রাক্ষুসে তিমির সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ হয়। একে ইংরাজিতে বলে pod of whales আমরা বলতে পারি তিমির ঝাঁক।

একটি পরিবারে আছে বাবা-মা-ছেলে, ছেলেটা প্রায় আমাদের খোকনের বয়সী। আর একজোড়া নব-দম্পতি। তাদের এখনও বাচ্চা হয়নি। বছর-দুই হল ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র—এখনও দুনিয়া ওদের চোখে রঙিন। মধুচন্দ্রিমার রাত্রিটাই যেন দীর্ঘ দু'বছর ধরে বিলম্বিত হচ্ছে! মা-তিমি ওদের কাণ্ড দেখে আর মনে-মনে হাসে। মনে পড়ে যায় নিজের কথা।

একটি দুর্ঘটনায় মাস-কয়েক আগে ঐ জুড়ির মাদী-তিমিটা, মারা গেল। সে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তারপর থেকেই নব-দম্পতির মদ্দা-তিমিটা কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েছে। তবু ওদের ঝাঁকের সঙ্গেই আছে। এখন ঝাঁকটায় আছে চারটি বড় তিমি আর দুটি বাচ্চা।

ইতিমধ্যে নরউইডিয়ান, রাশিয়ান, ডাচ আর জাপানী তিমি শিকারীদের চার-চারটে দল এসে জুটেছে ক্রিলপাড়ায়। ক্রমাগত ওদের তাড়া করে ফিরছে। এক-এক দলে আবার পাঁচ-সাতখানা জাহাজ। এতদিনে খোকন-তিমি ওদের ভালভাবে চিনে নিয়েছে। মৃত্যুকে বারে বারে দেখেছে চোখের উপর! বুঝেছে, ঐ যারা পেট আকাশপানে মেলে চিৎ হয়ে জলে ভাসে, ওরা আর কোনদিন উপুড় হবে না। বুঝেছে, ঐ যে অদ্ভুত ধাতৰ প্রতিধ্বনি—ওটা ভাসমান তিন নম্বরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা। বুঝেছে, ওরা হচ্ছে তিম্যাদিকুলের জন্মশত্রু! তিমিঙ্গিল!

মা ওকে নানাভাবে তালিম দিয়েছে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাথাটা জলের উপর

তুলবার আগে উচ্চ-উচ্ছ্বায়ের শব্দতরঙ্গ ছেড়ে বুঝে নিতে হবে কোন ধাতব তিমিঙ্গিল ধারে কাছে আছে কিনা। যদি থাকে---খবর্দার মাথা তুলবি না—ডুবসাঁতারে অনেক-অনেকটা এগিয়ে যাবি। তারপর আবার শব্দতরঙ্গ ছেড়ে বুঝে নিবি, সে পাড়ায় ঐ তিম্যাতর জীবগুলো আছে কিনা। যদি থাকে—আবার খবর্দার! মাথা তুলবি না। যতই শ্বাসকষ্ট হোক! আবার ডুবসাঁতার দিতে হবে। নাহলে, মনে নেই নতুন-মাসির কথা?

হ্যাঁ, মনে আছে। ভুলতে পারেনি। ভোলা যায় না। বীভৎস মৃত্যুকে সেবারই তো প্রথম দেখল খোকন। ধাইমা-মাসিকে ওর মনে নেই, কিন্তু এই নতুন মাসির সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছিল। নতুন মাসির দু বছর হল বিয়ে হয়েছে, আজও বাচ্চা হয়নি। আসলে খোকনসোনা টের পায়নি, নতুন মাসির পেটের মধ্যে তখন একটা বাচ্চা চোখ-কান বন্ধ করে ক্রমাগত দপদপ আওয়াজ শুনছে! নতুন মাসি ওকে খুব ভালবাসত। প্রায়ই মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এদিকে ওদিকে বেড়াতে যেত—শীল পাড়ায়, পেঙ্গুইন হাটে অথবা সিন্ধুঘোটকের মজলিসে। খোকন তো এখন আর মিনি খায় না, তাই মাসির সঙ্গে অনেক দূরে-দূরেও বেড়াতে যেত। আবার ফিরে আসত মায়ের কাছে।

মাস-দুয়েক আগের কথা। তখন পুরো মরশুম চলছে : খাওয়া, খাওয়া আর খাওয়া। পুরো মরশুম ঐ তিমি-শিকারীদেরও হত্যা, হত্যা আর হত্যা। দুটো মদ্দা, তিনটি মাদী আর দুটো বাচ্চার ঝাঁক তখন চলছিল দক্ষিণ সেটল্যান্ড দ্বীপের পুবদিক দিয়ে দক্ষিণমুখো ওয়েডেলসী বরাবর। ওদের অবস্থানটা প্রায় ৩০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ, মেরুবলয়ের উপর। সামনেই নিশ্ছিদ্র বরফের পাহাড়—মাইলের পর মাইল, যে বরফ গলে না সারা বছরে। গললে সারা পৃথিবীর সমুদ্র আড়াইশ-তিনশ ফুট উঁচু হয়ে উঠত—পশ্চিমবাংলার গোটা দক্ষিণাংশই ডুবে যেত সমুদ্রগর্ভে! সন্ধ্যা হয় হয়। মানে সূর্যের আলো বেশ কমে এসেছে। ওরা সাতজনে জল কেটে চলেছে দক্ষিণমুখো। বেশ অনেকক্ষণ জলের তলায় থাকার পর ওরা সন্তর্পণে শব্দতরঙ্গ ছেড়ে দিল। সর্বনাশ! খুব কাছেই একটা ধাতব জলজন্তু—অর্থাৎ জাহাজ! প্রশ্বাস নেওয়ার সুযোগ হল না—ওরা সাতজনেই চলল পুবমুখো। প্রায় মাইল-তিনেক দূরে গিয়ে দলপতির নির্দেশে—দলপতি ঐ পরিবারের বাপতিমি, সেই বয়ঃজ্যেষ্ঠ—আবার চারিদিকে শব্দতরঙ্গ ছাড়া হল। কী আপদ। এবারও শিকারী জাহাজের খোলে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল প্রতিশব্দ।

কী করা যায়? দুটো বাচ্চারই আর দম নেই, হাপসে পড়েছে। তার চেয়েও কাহিল অবস্থা নব-দম্পতির ঐ মাদী তিমিটার। ওরা জানত না, সে তখন গর্ভিণী। তাছাড়া ওর শরীরটাও বেজুতের এক রাক্ষুসে তিমির আক্রমণে। সকলের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে মাদী তিমিটা ভেসে উঠতে চাইল। হয়তো ভেবেছিল টুপ করে একটু শ্বাস টেনে নিয়েই ডুব দেবে। কিন্তু সেই খণ্ডমুহূর্তের সুযোগও বেচারি পেল না। জল থেকে মাথা তুলতে না-তুলতেই জাহাজ থেকে গর্জন করে উঠল হারপুন বন্দুক। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ! খোকন তখন তার নতুন মাসির থেকে মাত্র হাতকতক পিছনে। তাই ঘটনাটা সে সমস্তই দেখতে পেল। হারপুনটা বিঁধেছিল নতুন মাসির পিঠে, কিন্তু দমদম বুলেটের মত বোমাবিস্ফোরণ হল হৃদপিণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে। দেহের অনেকটা অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উৎক্ষিপ্ত হল আকাশে। আশ্চর্য! তা সত্ত্বেও সেই গর্ভিণীতিমি তার অন্তিম নিঃশ্বাসটা ছাড়ল আকাশে। বাতাস নয়, রক্তের যেন একটা বসান-তুবড়ি।

খোকন স্পষ্ট দেখতে পেল পরমুহূর্তেই একটা বল্লম এসে গিঁথে গেল ওর নতুন মাসির পিঠে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাসির দেহটা ফুলেফেঁপে উঠল। আস্তে আস্তে তার দেহটা উল্টে গেল। সাদা আঁজি-আজি কাটা তলপেটটা —যে-তলপেটে নিজের অজান্তেই অজাত শিশুটা এতক্ষণে মারা গেছে, ভেসে রইল জলের উপর। কয়েকটা সীগাল অহেতুক পাক খাচ্ছে তার উপর। অনিবার্য আকর্ষণে নতুন মাসির মৃতদেহটা ভেসে চলল জাহাজটার দিকে।

খণ্ডমুহূর্তের জন্য খোকন-তিমি বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিল। তারপর আত্মস্থ হল,

অনুভব করল নিজের দেহের যন্ত্রণাটা। সে নিজেও যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছে। মাথা জাগালেও মৃত্যু, না-জাগালেও তাই। কী করবে?

ঠিক তখনই ওর মা প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারল উপর থেকে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল খোকন। কিন্তু নির্দেশটা বুঝতে ভুল করেনি সে। এখানে কিছুতেই শ্বাস ফেলা চলবে না! যত কষ্টই হোক। ছয়জনের দলটা আবার ডুব দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে।

না! নব-দম্পতির মদ্দা তিমিটা তার জীবনসঙ্গিনীর অনুগমন করেনি। বিবর্তনই বল, অথবা প্রজাতিগত শিক্ষাই বল,— পঞ্চাশ বছর আগে ওরা যা করত, এখন আর তা করে না। সে আমলে হারপুন-বেঁধা সঙ্গিনীকে ফেলে কোন পুরুষ তিমিই পালিয়ে যেত না। কারণ সে যুগে দ্বৈরথ সমরটা দীর্ঘস্থায়ী হত। কখনও-কখনও তিন-চার ঘণ্টা ধরে। হারপুন-বেঁধা তিমিনী টেনে নিয়ে চলত শিকারীদের। মরণান্তিক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে সে ডুবিয়ে দিতে চাইত জাহাজটাকে। অব্যতিক্রম আইনে তার সঙ্গীও থাকত সাথে সাথে, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মাঝে মাঝে লেজের ঝাপটায় উল্টে দেবার চেষ্টা করত শত্রুপক্ষের জাহাজটাকে। তার সুনিশ্চিত ফলাফলটা হত শিকারীদের পক্ষে মুনাফার। মাদী তিমি শিকার করা মানেই জোড়া তিমি! নির্বোধ মদ্দা-শালা প্রাণ দিতে ছুটে আসবেই।

ইদানীং তা হয় না। মনুষ্যসমাজের আইন—'আত্মানং সততং রক্ষেং দারেরপি ধনৈরপিত মন্ত্রটা ওরা শিখে ফেলেছে বাধ্য হয়ে। কারণ এখন মানুষ বনাম তিমির লড়াইটা খণ্ডমুহূর্তেরশক্তির নয়, এলেমের। হারপুন-গান লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তো তিমি বাঁচল, না হল তো তাৎক্ষণিক মৃত্যু! তাই তিমিরা আর তিমিনীর জন্যে প্রাণ দিতে ছুটে আসে না। অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিয়ে অতলসমুদ্রে তলিয়ে যায়।

মরশুম শেষ হয়ে আসছে। আর এখন এখানে থাকা বিপজ্জনক। কখন না-জানি জমা বরফের বেড়াজালে আটক পড়ে যায়। এমন দুর্ঘটনার কথা ওরা জানে। তখন মাইলের পর মাইল শুধু চাপ-চাপ বরফ ভাসে সমুদ্রের উপরিভাগে। নাক-বিকল্পের ডগাটুকু আকাশপানে মেলে ধরারও সুযোগ মেলে না। তলা দিয়ে ডুবসাঁতারে এ বেড়াজাল যে এড়িয়ে যাবে তারও উপায় নেই এক ডুবে যতদূর যাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি দূরত্বের দিগন্ত পর্যন্ত তখন বরফে ঢাকা। ক্রিলপাড়ার আনন্দমেলা তখন এক বরফের মহাশ্মশান! তার আগেই ওদের পালাতে হয়।

অধিকাংশই চলে গেছে। এবার ওদেরও প্রস্তুত হতে হয়। রোজই দেখছে, যে যে-অঞ্চলে অভ্যস্ত সে সেই অঞ্চলেই চলে যাচ্ছে। বাপ-মা-ছেলের তিনজনের পরিবারটা এসেছিল প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে। ইস্টার দ্বীপের কাছাকাছি থাকে ওরা শীতকালে। তারা একদিন বিদায় নিয়ে সেদিকেই চলে গেল। নব-দম্পতির শীতকালীন বাসা ছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। আর আমাদের মা-তিমি তো, আগেই বলেছি, থাকত দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে।

বাপ-মা-বাচ্চার দলটা রওনা হয়ে যাবার পর মা-তিমি তার মৃতদার বন্ধুকে যেন বললে, এবার তুমি কী করবে? আর তো এখানে থাকা চলে না।

মৃতদার মদ্দা তিমিটা বুঝি লজ্জা পেল। এর জবাবটা সে জানে, বলতে সঙ্কোচ করছে। খোকনের সামনে কীভাবে কথাটা পাড়বে যেন বুঝে উঠতে পারে না। এর নীরবতা তে মা তিমি কী বুঝল তা সে-ই জানে। আবার তাগাদা দেয়, কোনদিকে যাবে? একা-একাই তো যেতে হবে তোমাকে!

মদ্দা তিমিটা যেন একটা সূত্র পেল। বললে, একা-একা কেন? এস না, তোমরাও এস না? আমার ও দিকটা বেশ নিরাপদ। হেরিং মাছও যথেষ্ট।

মা-তিমি বুঝল। না বোঝার কী আছে? দুজনেই নিঃসঙ্গ। অতীতকে আঁকড়ে থেকে লাভ নেই। প্রজাতির ঋণ শোধ করা কি সহজ? যে হারে ওরা নিঃশেষিত হচ্ছে তাতে

এমন ভাবালুতার শিকার হওয়া চলে না। কিন্তু খোকন? মা-তিমি, কোথাও কিছু নেই হাতডানা দিয়ে খোকনকে একটু আদর করল।

খোকা-তিমি ভিতরকার কথা কিছুই বোঝেনি। এখনও সে নেহাৎ বাচ্চা।

মদ্দা তিমিটা কিন্তু বুঝল। তৎক্ষণাৎ খোকনের গায়ে গা লাগিয়ে যেন বললে, খোকনকে নিয়েই এস না আমাদের দেশে?

যেন মহাপণ্ডিত, খোকন বুঝে ফেলেছে মেসোর প্রস্তাবটা। ওদের নতুন দেশে যেতে বলছে। খোকন-তিমি সমুদ্রের আকাশে অহেতুক একটা ডিগবাজি খেয়ে চুঁ মারল তার মাকে। যেন বললে, চল না মা, মেসোর সঙ্গে নতুন দেশে যাই?

মা-তিমি লজ্জা পেল। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বোকার হাসি হাসল।

তার সঙ্গী যেন কানে-কানে বললে, তোমার ছেলেটা কিন্তু ভীষণ বোকা! ও বুঝতে পারেনি—নতুন 'দেশ' নয়, নতুন 'বাপ' এর পছন্দ হয়েছে কিনা সে কথাই জানতে চেয়েছ তুমি।

মা-তিমি ওকে একটা লেজের ঝাপটা মারল!

বঙ্গভাষে তার অনুবাদ: মরণ! তোমার মুখে আর কিছুই বাধে না দেখছি!

দীর্ঘ পনের বছর পরের কথা।

এখন আর আমাদের কাহিনীর নায়ককে খোকা-তিমি বলা ভাল দেখায় না। সে এখন রীতিমত তরুণ! আকারে এখন সে পঞ্চাশ ফুট, ওজনে একশ টনের কাছাকাছি। বিবাহিত সে। আমাদের তরুণ-তিমি ইতিমধ্যে নিখিল তিমি সমাজে একটা নতুন বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছে। সে গোলার্ধ বদল করেছে। যা কেউ কখনও করে না।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দরকার। ঝিল্লিমুখোরা কখনও গোলার্ধ বদল করে না। দক্ষিণ গোলার্ধের তিম্যাদি উত্তর গোলার্ধে আসে না, উত্তরার্ধের তিমি যায় না দক্ষিণপাড়ায়। তার মানে ওরা যে বিষুবরেখা অতিক্রম করে না, তা নয়। মোটকথা গ্রীষ্মকালীন খাদ্যসংগ্রহের এলাকাটা ঝিল্লিমুখোর কাছে অপরিবর্তনীয়। ওদের গ্রীষ্মকালীন খাদ্য, আগেই বলেছি, ক্রিল—যা পাওয়া যায় মেরু ভাঞ্চলে। কিন্তু উত্তরমেরু অঞ্চলে খাদ্য-মরশুম হচ্ছে সেখানকার গ্রীষ্ম—এপ্রিল থেকে জুলাই; আর দক্ষিণমেরু অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন খাদ্য-মরশুম হচ্ছে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। ফলে প্রতিটি তিমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, মায়ের পিছু-পিছু জীবনের প্রভাতে যে-অঞ্চলে ক্রিলপ্রাশন করেছে, জীবনছন্দের আবর্তে প্রতি গ্রীষ্মকালে সেই মেরু অঞ্চলেই ফিরে-ফিরে আসে। ক্কচিৎ কখনও বিষুবরেখা অতিক্রম করলেও সে গ্রীষ্মকালে তার জীবনছন্দের সূত্রে বাঁধা নির্দিষ্ট মেরু অঞ্চলের ক্রিলপাড়ায় ফিরে আসতে বাধ্য। দুই গোলার্ধের তিম্যাদি—ঝিল্লিমুখো আর দাঁতাল, জীবনাবর্তের ছন্দ কী ভাবে মেনে চলে তা গ্রন্থারম্ভে ও গ্রন্থশেষে দুটি চিত্রে দেখানো হয়েছে। তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে— কেন আমাদের তরুণ নায়ক এক ব্যতিক্রম। কেন সে তিমিকুলে কলোম্বাস, ম্যাগেলান!

জন্ম তার রিও ডি-জেনিরো বন্দরের কাছাকাছি, কৈশোর কেটেছে আফ্রিকার পশ্চিমে গিনি উপসাগরে। জন্মসূত্রে তার গ্রীষ্মকালীন ক্রিল-চারণক্ষেত্র ছিল দক্ষিণমেরু অঞ্চলে। অথচ এখন সে চলেছে ব্রেজিলিয়ান বেসিন এবং বিষুববৃত্ত অতিক্রম করে সিধে উত্তর-পশ্চিমমুখো— উত্তরমেরুর দিকে, যেখানে ধ্রুব নক্ষত্র স্থির হয়ে আছে মধ্যগগনে। একা নয়, সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে তার চেয়ে আকারে কিছু বড় তার জীবনসঙ্গিনী —আমার কাহিনীর নায়িকা শ্রীমতী তিমিনী। আমি দুঃখিত। আমার কাহিনীর যে-অংশটা হতে পারত সবচেয়ে রোমান্টিক, সেই পর্যায়টা এক নিঃশ্বাসে অতিক্রম করে এসেছি। কী করব বলুন? ওদের সব কথা কি জানা যায়? তবে একেবারে নিরাশ করব না আপনাদের —অন্তত কী কারণে তরুণ-তিমি স্বদেশ ছেড়ে এমনভাবে গোলার্ধ বদল করল সেটুকু তথ্য আপনাদের জানাব।

জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর মায়ের সঙ্গে দক্ষিণ অতলান্তিকেই ঘোরাফেরা করেছে। সন্তান লায়েক হবার পর মা তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে নিয়ে যখন নতুন করে ঘর পাততে গেল তখন তরুণ-তিমি নিজের পথে বেরিয়ে পড়ে। কয়েকটি স্বজাতীয়ের ঝাঁকের সঙ্গে-সঙ্গে মোটামুটি ঐ অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করেছে। একবার তো একটা দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী ভাসমান সাগরেও কাটিয়ে এল একটা মরশুম। সেসব দলে ওর সমবয়সী তরুণী তিমি যে না-ছিল তা নয়। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার গায়ে-পড়া স্বভাবেরও ছিল। তবু আমাদের তরুণ নায়কের মন টলেনি। বন্ধুত্ব হয়েছে, ভাব হয়েছে— পাশাপাশি সাঁতার কাটা হয়েছে—তবে ঐ পর্যন্তই! 'প্রেম' বলতে যা বোঝায় তা হয়নি।

এই দশ-পনের বছরে নানান জাতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। দেখেছে টাইফুনের বিধ্বংসী রূপ—অথচ আশ্চর্য! সমুদ্রের গভীরে তার কোন প্রভাব পড়েনি। যত মাতামাতি শুধু উপরমহলে! দেখেছে জলস্তম্ভ। দূর থেকে। তবু ওর ঐ অত বড় দেহটাকেও টেনে এনে, ঠেলে, পাক মেরে সমুদ্র যেন গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। পাক খেতে-খেতে জলের স্তম্ভ উঠে গিয়েছিল আকাশপানে। হাজার-হাজার মাছ, এমনকি

হাঙর, ডালফিনগুলো পর্যন্ত সমুদ্র-সমতল থেকে উঠে গিয়েছিল দশ-পনেরতলা বাড়ির উপর! তারপর যখনই সেই জলস্তম্ভটা সশব্দে ভেঙে পড়ল— ভাগ্যিস ওর পিঠের উপর নয়—তখন ভয়ে ও ডুব দিয়েছিল অনেক-অনেক গভীরে। মিনিট পনের পরে শ্বাস নিতে উপরে উঠে দেখে—কোথায় কী! সমুদ্র আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি!

- আর একবার দেখেছে সেই বিচিত্র জন্তুটাকে ডুবে যেতে—সেই যে-জন্তুটার দেহ রক্তমাংস মজ্জায় গড়া নয়, ধাতব শব্দের তরঙ্গ প্রতিহত করে। যে-জন্তুটা একটু অন্য ধরনের... মা তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। জলচর জীব হলেও সেটা কখনও ডুবসাঁতার দিতে জানে না, সর্বদা পিঠটুকু আকাশপানে মেলে জল কেটে তরতরিয়ে চলে। ঐ জন্তুটা তাদের জন্মশত্রু। মা বলত—তিন নম্বর শত্রু, তিমিঙ্গিল! সে জন্তুটা কী খায় তা ও জানে না—ক্রিলপাড়ায় আসে আর পাঁচটা তিমির মত—ঠিক সময়েই আসে—অথচ আশ্চর্য! তাকে কখনও হাঁ করে ক্রিল খেতে দেখেনি। অথচ ওদের মত শ্বাস ফেলে— হ্যাঁ, ফেলে, তরুণ তিমি দূর থেকে লক্ষ করে দেখেছে—ঐ জন্তুটার নাক-বিকল্প থেকে কালো-কালো ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস গলগল করে বের হয়, সারা আকাশটা কালো করে ফেলে। একদিন সেই জন্তুটার মৃত্যুযন্ত্রণার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। অন্তিম মুহূর্তে সব জন্তুই সমান। তিন নম্বর শত্রুটা শেষ পর্যন্ত মরে গেল! সোজা নেমে গেল সমুদ্রের গভীরে। তরুণ-তিমি সেই তিমিঙ্গিলটার পিছন পিছন অনেকদূরে ধাওয়া করেছিল—তারপর আর পারল না। ও যতটা ডুবতে পারে তার চেয়েও গভীরে তলিয়ে গেল জন্তুটা। ওখানে কী আছে? সমুদ্রের এক্কেবারে তলাটা কেমন দেখতে? তা ও জানে না। মানে মহীসোপানের কাছাকাছি নয়, গভীর সমুদ্রের তলদেশ। আশ্চর্য! সেদিন কিন্তু সে ঐ তিমিঙ্গিলটার মৃত্যুদৃশ্যে খুশি হতে পারেনি। খুশি হওয়াই তো উচিত ছিল তার। তবু কেমন যেন বেদনা বোধ করেছিল। জল থেকে নিঃশ্বাস নিতে উঠে দেখে আর-এক কাণ্ড! বড় জন্তুটা মরে ডুবে গেছে বটে, কিন্তু দশ-পনেরটা বাচ্চা পেড়ে গেছে। সেগুলো উথালপাথাল ঢেউয়ে ভাসছে। প্রত্যেকটা বাচ্চার পেটে ঠাসাঠাসি সেই জীব যারা বজ্র মারে। তারা চিৎকার করছে, তারাও মৃত্যুভয়ে আর্তনাদ করছে। দুরন্ত বিস্ময়ে তরুণ-তিমি সেদিন ওদের খুব কাছে গিয়ে দেখেছিল—না! ওরা কেউ বজ্র ছুঁড়ে মারবার চেষ্টা করেনি তারা নিজেরাই তখন বাঁচতে চায়!

দু'তিন দিন ও তাদের সঙ্গ ছাড়েনি, কাছে-কাছেই ছিল। তারপর বাধ্য হয়ে ওকে সরে আসতে হয়! এক ঝাঁক হাঙর কেমন করে যেন টের পেয়ে গেল। তারাও এসে ঐ বাচ্চাগুলোর চারধারে পাক মারতে থাকে। বাধ্য হয়ে তরুণ-তিমি দূরে চলে যায়। ঐ বাচ্চাগুলোর শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা আর জানতে পারেনি।

ক্রিলপাড়ার বাৎসরিক মেলাটা দিন-দিন অসহ্য হয়ে উঠছে! ওকে বছরে বছরে সেখানে ফিরে আসতে হয়। দেখা পায় স্বজাতীয়দের। অনেক খুঁজেছে—মাকে কিন্তু আর কোনদিন দেখতে পায়নি। কে জানে এখন সে বেঁচে আছে কিনা। হয়তো ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে ঐ তিমিঙ্গিলের অত্যাচারে। প্রাণধারণের তাগিদে আসতে হয় ক্রিলপাড়ায়; কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওদের অত্যাচারে। দিন-দিনই ওদের অত্যাচার বাড়ছে। ইদানীং আর-এক নতুন জাতির পাখির উপদ্রব শুরু হয়েছে। তারাও বৎসরান্তে এসে হাজির হয় ক্রিলপাড়ার মেলায়। এরাও রক্তমাংস-মজ্জায় গড়া পাখি নয়, ধাতব পাখি। ধাতব পাখি সে আগেও দেখেছে, অনেক দেখেছে—সেগুলো অন্য জাতের। সেগুলো আর পাঁচটা পাখির মত, এ্যালবাট্রসের মতই আকাশে ভেসে চলে যদিও ডানাদুটো নাড়ে না। শব্দ করে প্রচণ্ড—তাদের হাতডানায় একজোড়া কী একটা বনবন করে ঘোরে। এই নতুন জাতের ধাতব পাখির ডানা নাকের ডগায় থাকে না, হাতডানার কাছেও নয়, থাকে মাথার উপর। আকাশপানে মুখ করে পাখাটা বন্ধ করে পাক খায়। আর সবচেয়ে অবাক করা খবর এরা এক জায়গায় স্থির থেকে উড়তে পারে, মোড় ঘুরবার দরকার হলে আকাশে প্রকাণ্ড চক্কর মারতে হয় না। এই নতুন জাতের ধাতব

পাখির অত্যাচার আরও বেশি। ওদের জ্বালায় নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশটুকুও পাওয়া যায় না। যেখানেই মাথা তুলবে ঐ ধাতব পাখি এসে হাজির। পাখির পেটে ঐ ক্ষুদে-ক্ষুদে তিন নম্বর শত্রুগুলো বসে আছে। চোখে চোঙ লাগিয়ে বসে থাকে সারাক্ষণ। যেই তুমি উঠেছ নিঃশ্বাস ফেলতে, যেই তোমার নাক-বিকল্পের ছ্যাঁদা থেকে নিঃশ্বাসের ফোয়ারা বার হবে অমনি ছুঁড়ে মারবে বজ্র। তরুণ-তিমি এতদিনে বুঝেছে-তিমিরা যেমন বৎসরান্তে ক্রিল খেতে এখানে আসে, তেমনি ঐ ধাতব জলজন্তু আর ধাতব পাখির দলও আসে তিমি খেতে! তাই মা বলত তিমিঙ্গিল'।

বছর-দুই আগে শ্রীমতী তিমিনীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। নাটকীয় ভাবে। আফ্রিকার গিনি উপসাগরের উত্তরে প্রায় বিষুব বৃত্তের কাছাকাছি। তরুণ-তিমি একা-একাই ভাসছিল জলে। আপন খেয়ালে। এখন তার কোন দায়-ঝক্কি নেই, সে কোন ঝাঁকের অংশীদার নয়, নিঃসঙ্গ-সঞ্চারী। হঠাৎ প্রতিহত শব্দতরঙ্গে মনে হল একটা তিমিনী অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটে আসছে তার দিকে—ঠিক তার পিছন পিছন একটা ধাতব জলজন্তু! মাঝ সমুদ্রে সাধারণত জলজন্তুগুলো তিমিদের আক্রমণ করে না। তরুণ-তিমি অনেকবার দেখেছে দূর থেকে, এমন কি সাহস করে কাছে গিয়েও। আকাশপানে কালো ধোঁয়ার নিঃশ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে আপন মনে তারা চলে যায়। তবে কে বলতে পারে? তিন নম্বর জাতশত্রুদের কাণ্ডকারখানা সবই অদ্ভুত।

স্বজাতীয়ের বিপদে সাহায্য করতে ছুটে যাওয়ার শিক্ষা ওর রক্তে। সেটা ওর ধর্ম। পলাতকাকে ও চেনে না, চোখেও দেখেনি কোনদিন—তবু স্বজাতীয় তো! প্রজাতির জন্মগত সংস্কারে——বৃহত্তর বিবর্তনের তাগিদে—ও তীব্রবেগে ছুটে চলল অপরিচিতা তিমিনীর দিকে। কয়েক মিনিটের ভিতরেই তার সমীপবর্তী হল। হ্যাঁ, একটা মাদী তিমি —ডানা তিমিই; ওরই বয়সী। দৈর্ঘ্যে ওর চেয়ে কিছুটা লম্বা, [প্রাণীজগতে ঝিল্লিমুখো তিমি এদিক থেকে এক দুর্লভ ব্যতিক্রম, সমবয়সী মাদী তিমি আবশ্যিকভাবে মদ্দা তিমির চেয়ে আকারে বড় যার বিপরীতটাই দেখা যায় যাবতীয় জীবের ক্ষেত্রে] কাছাকাছি আসতেই সেই অপরিচিতা যে শব্দতরঙ্গ নিক্ষেপ করল তার বঙ্গানুবাদ পালাও! পালাও! তিমিঙ্গিলটা পিছন-পিছন তাড়া করে আসছে!

সেটা আর নতুন কথা কী? তরুণ-তিমি তা অনেকক্ষণ আগে থেকেই জানে। সে শুধু বললে তাহলে ডুব দিচ্ছ না কেন? এস! আমার পিছু-পিছু এস দিকিন।

তিমিনীটার বোধহয় আতঙ্কে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল। ধাতব জলজন্তুরা যে ডুবসাঁতার দিতে জানে না এই সহজ কথাটাও ভয়ে ও ভুলে গিয়েছিল। এতক্ষণ বোকার মত সে জলের উপরিভাগ দিয়েই নক্ষত্রবেগে ছুটে আসছিল। ওর কথায় এতক্ষণে পালাবার পথ দেখতে পেল। দু'জনেই ডুব দিল একসঙ্গে। তরুণ-তিমি সামনে, তরুণী তার পিছে-পিছে। ডুবছে তো ডুবছেই। কুয়োর গভীরে দড়ি-বাঁধা বালতির মত। একশ —দেড়শ--দুশ—তিনশ—সাড়ে-তিনশ মিটার নিচে নেমে গেল। এই পর্যন্তই ওরা নামতে পারে। তিমিনীর হিম্মৎ আছে! ঠিক নেমে এসেছে ওর পিছন-পিছন। এবার ভেসে ওঠার পালা। কিন্তু না, খাড়াভাবে নয়—-ওর মনে পড়ে গেল মায়ের শিক্ষা—শৈশবে কীভাবে একঝাঁক রাক্ষুসে তিমির আক্রমণ এড়িয়ে ত্যারচাভাবে উঠেছিল। এবারও তাই উঠতে থাকে—ধাতব জলজন্তুটা যেদিক থেকে ছুটে আসছে সেই দিক পানেই। ও জানে, এভাবেই ওরা যখন ভেসে উঠবে ততক্ষণে ঐ জন্তুটা ওদের মাথার উপর দিয়ে বিপরীতে দিকে চলে যাবে। ওরা দু'জনে যখন শ্বাস ফেলবে তখন ঐ জন্তুটা তা দেখতে পাবে না, কারণ ঘটনাটা ঘটবে ওদের গতিমুখের বিপরীত দিকে।

ভেসে ওঠার পর বারকতক শ্বাস নেবার পরে তিমিনী ঘনিয়ে এল ওর কাছে। হাতডানা দিয়ে ইঙ্গিত করে কী যেন দেখাল। তাই তো, কী একটা গেঁথে আছে ওর পিঠে। এটা কী? তীরের মত একটা কিছু। অনেকখানি গিঁথে আছে। তরুণ-তিমি অনেক চেষ্টা করল, হাতডানা দিয়ে, লেজের বাড়ি মেরে। গায়ে গা ঘষে ঘষে। কিন্তু কিছুতেই

সেটাকে ছাড়াতে পারল না। এটা কী হতে পারে? বজ্র তো নয়। তাহলে এতক্ষণে বিস্ফোরণ হত। ওর সঙ্গিনী উপুড় হয়ে নয়, চিৎ হয়ে ভাসত সমুদ্রের উপর, তার অস্পর্শিত স্তনবৃত্তদুটি আকাশপানে মেলে দিয়ে। তরুণ তিমি জানতে চাইল, এটা কখন লাগল? কীভাবে?

এই তো এখনই। ঐ তিমিঙ্গিলটা ছুঁড়ে মারল।

যন্ত্রণা হচ্ছে?

না। ওটা যে গিঁথে আছে, তা টেরও পাচ্ছি না।

তরুণ-তিমির মনে পড়ল, এক রামদাঁতালের কথা। তার পিঠে গাঁথা ছিল শূলনাসার বিচ্ছিন্ন শূলটা। ব্লাবার ভেদ করে গভীরে না-পৌঁছলে এসব আঘাত ওদের কোন ক্ষতি করে না। তাই বললে, তবে থাক না। যন্ত্রণা যখন হচ্ছে না তখন থাক।

না! ওটাকে তুলে দাও।

কী করে তুলব? উঠছে না যে--

আবার গায়ে গায়ে ঘষতে থাকে। হাতড়ানা দিয়ে জাপটে ধরে, জড়িয়ে ধরে। তরুণী বাধা দেয় না, গা এলিয়ে দেয়। কী মসৃণ ওর দেহটা। কী নরম ওর স্পর্শ!

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কাঁটাখানা তুলতে পারল না। সব চেষ্টাই নিরর্থক হল। একেবারে নিরর্থক? না। তা তো নয়! ঐ বাদী তিমিটার মসৃণ গায়ে গা ঘষতে ঘষতে ওর এক নতুন জাতের অনুভূতি হচ্ছিল। এমনটা আগে তো কখনও হয়নি। ভারি ভালো লাগছিল ওকে হাতডানা দিয়ে জাপটে ধরতে, গায়ে গা ঘষতে। কিন্তু তীরটা যখন উঠবেই না তখন এভাবে সময় নষ্ট করে কী লাভ? বললও সে কথা।

ওটা বার করা যাবে না। একেবারে সেঁটে বসে গেছে। ব্যথা যখন লাগছে না তখন—বাধা দিয়ে তিমিনী বললে, না! থাকবে না! তুমি আরও জোরে-জোরে গা ঘষ! তিমি বললে, তাতে কী লাভ?

লাভ-লোকসান জানি না! যা বলছি কর! আরও জোরে-জোরে গা ঘষ!

তরুণ-তিমি বুঝতে পারল। ব্যাপারটা আগেও লক্ষ করেছে—অর্থ বোঝেনি। আজ হঠাৎ বুঝে ফেলল। দুষ্টু বুদ্ধি এল মাথায়। বললে, একটা কথা বলব?

কী?

আসলে ঐ আপদটাকে তাড়াবার জন্য নয়, তুমি অন্য কারণে অমন করতে বলছ। তিমিনী সড়াং করে সরে গেল দূরে। চোখ ঘুরিয়ে বললে, তার মানে?

তার মানে একটা পুরুষ-তিমির গায়ে গা ঘষতে তোমার ভাল লাগছে।

তিমিনী লেজের একটা ঝাপটা মেরে বললে মরণ। মুখে আর কিছুই বাধে না দেখছি। তরুণ-তিমি হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার প্রকাণ্ড মস্তিষ্কের কোন রন্ধ্রে স্মৃতির অনুরণন জেগেছে। নৃত্যাভাস! ঠিক এই কথা এই পরিবেশে সে যেন আগেও কোথায় শুনেছে! কোথায়?

পথ ওদের জীবনে বন্ধনহীন গ্রন্থি বেঁধে দিল মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। ফাল্গুন তখন শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ হলে বলতুম, তখন পলাশ ফুটছে, লালে লাল হয়ে গেছে শিমুল গাছে-গাছে, কোকিল খুঁজছে তার সঙ্গিনীকে। মধ্য-অতলান্তিকে সে-ফাল্গুনের ক্ষীণতম ছায়াও পড়েনি, পড়ে না—তবে বসন্ত তো বসন্তই। সেই কোন বিস্মৃত অতীতে এক ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী অনঙ্গদেবতাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—তারপর থেকে জীবজগতে সবাই এ সময় সাথীকে খোঁজে! তরুণ-তিমি তখন সদ্য এসেছে বিষুব অঞ্চলে, দক্ষিণমেরুর বৎসরান্তিক ক্রিলমেলার ভোজন মহোৎসবান্তে। এখন তার ব্লাবার পুরু, এখন সে তিন-চার মাস এই বিষুব অঞ্চলের উষ্ণ আবেশে খেয়ালখুশিতে কাটিয়ে যাবে। প্রতি বছরই তা-ই যায়; এবার সেই নিঃসঙ্গ জীবনে লেগেছে প্রথম প্রেমের ছোঁয়া!

ভেবেছিল, নবীন সাথীর সঙ্গে এই কমাসে ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় হবে। ওদের জীবনসঙ্গীর নির্বাচন তো সহজ কথা নয়—আজ ভাল লাগল বিয়ে করলাম, কাল খারাপ লাগল তালাক-তালাক বলে ডিভোর্স করলাম, তা হবে না। তাই ওদের প্রাকবিবাহ প্রণয়ের পর্যায়টা বেশ দীর্ঘস্থায়ী। অনেক বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে আসতে হয়। তরুণ-তিমি তাতে ঘাবড়ায়নি, ভেবেছিল এই তিন-চার মাসে সঙ্গিনীর হৃদয় জয় করে নেবে। দুর্ভাগ্য বেচারির – সাতদিন যেতে না-যেতে তিমিনী কেমন যেন উদাসী হয়ে ওঠে। প্রশ্বাস নিতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে কী একটা হিসাব বুঝে নিল। তারপর যেন বললে সময় হয়েছে। চল, বাই।

তরুণ-তিমি অবাক হয়ে যায়। বলে, কোথায় গো?

বা রে! দেখছ না, দুপুরে সূর্য মাঝ-আকাশ পার হয়ে উত্তরে চলেছে? এখনই রওনা না হলে সময়ে পৌঁছতে পারব না। ক্রিলপাড়ার দূরত্ব তো বড় কম নয়।

ও যেন তিমিঙ্গিলের ভাষায় কথা বলছে! মাথা-মুণ্ডু বোঝাই যায় না। মাঝ-আকাশ পার হয়ে সূর্য যখন দক্ষিণে ঢলবে (সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের পরে) তখনই তো ক্রিলপাড়ায় যাবার লগ্ন। তিমিনী কী বলতে চায়? এই তো সবে সে ফিরে এল ক্রিলমেলা থেকে। এই অসময়ে ও এ কী বকছে পাগলের মত?

তরুণীও ঠিক ঐ কথাই ভাবছে এ কী হাবা গো! এতটা বয়স হয়েছে এখনও বুঝতে পারে না কখন কোন্ দিকে রওনা হতে হবে!

ঘটনাচক্রে একঝাঁক ডানা তিমি এসে পড়ল ঐ সময়! সবাই দল বেঁধে উত্তরমুখো চলেছে, উত্তর মেরুবলয়ের দিকে। ওরা দল বেঁধে এল হৈ হৈ করতে-করতে, যেন এক ঝাঁক এয়োস্ত্রী চলেছে জলসইতে। ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে দলটা খুশিয়াল হয়ে ওঠে। যেন ডাক দিয়ে বলে, চল, চল, আর দেরি করা নয়। সময় হয়ে গেছে।

তিমিনী যেন বললে, দেখলে তো? আমিই ঠিক বলেছি! সময় হয়ে গেছে! ঐ দেখ সবাই চলেছে। তোমার হিসাবটা ভুল—ক্রিলপাড়া দক্ষিণে নয়, ঐ উত্তরে—আর এখনই সেখানে রওনা দেবার সময়।

মা-তিমি ঠিকই বুঝেছিল এ ছেলে বড় হয়ে লায়েক হবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তরুণ তিমি বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। শুধু দক্ষিণে নয়, উত্তরদিকেও তাহলে আর-একটা ক্রিলপাড়া আছে। যার খোঁজ সে জানত না এতদিন। শুধু সে একা নয়, তার মা-মাসি-আত্মীয়স্বজন কেউই সে খবর জানে না। আর সেই ক্রিলপাড়ায় মেলাটা বসে একেবারে অন্য সময়। সে সময় ওরা, দক্ষিণপন্থীরা, অশ্ব-অক্ষাংশের উষ্ণ আবেশে হেসে-খেলে দিন কাটায়। বুঝল, কিন্তু স্বভাবের বিরুদ্ধে সে যায় কেমন করে? তার জীবনছন্দ যে অন্য সুরে বাঁধা!

দলটা চলে গেল। আর-একটা দল এল, তারাও চলে গেল উত্তরমুখো। তিমিনী আর কী করে? শেষ পর্যন্ত বিদায় চাইতে এল একদিন। বললে, তুমি যদি নেহাৎই না-যাও তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও! বিদায় বন্ধু!

তা-ও যে পারে না।

এ কয়দিন ওর সাহচর্যে, ওর সাথিত্বে, ওর তৈলচিক্কণ বরাঙ্গের উষ্ণ স্পর্শে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জাগছিল যে! একটু-একটু করে একটা রহস্য যবনিকা সরে যাচ্ছে ওর বোধ থেকে। জীবনের অনেক পাঠই, অধিকাংশ শিক্ষাই সে পেয়েছিল মায়ের কাছ থেকে। প্রজাতির ঋণ শোধ করার এই শিক্ষার কোন ইঙ্গিত পায়নি। তবে এমন কাণ্ড সে আগে অনেককেই করতে দেখেছে—জড়াজড়ি, জাপটা-জাপটি, মাদী তিমির হঠাৎ চিৎ হয়ে যাওয়া। তার কারণটা এতদিন বুঝতে পারেনি। আজ পারছে। খুব ভালো হত যদি তিমিনী হত দক্ষিণপাড়ার মেয়ে। কিন্তু তা তো হবার নয়। বিধির বিধান তা নয় —তিনি একজনকে বেঁধেছেন ভৈঁরোয়, আর একজনকে পূরবীতে ওরা ঐকতানে মিলবে

কেমন করে? তিমিনী কোনদিন দখিনে হতে পারবে না! এর যখন শুরু, ওর তখন সারা। মাস চার-পাঁচ তিমিনী অনাহারে আছে এই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে—এখানে না-আছে ক্রিল, না মাছের ঝাঁক। তার ব্লাবার দিনদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। বর্তমানে সে রীতিমত তন্বী। আরও পাঁচ-ছয় মাস তাকে অনাহারে থাকতে বলা যায় না, সে-চেষ্টা করলে তিমিনী হয়তো মারাই পড়বে। তার চেয়ে তরুণ-তিমি বরং নিজেই জাত দেবে। এ যেন দত্ত বাড়ির বনেদী ঘরের ছেলে ভাবছে রেবেকা যদি হিন্দু না হতে পারে তাহলে সে নিজেই খ্রিস্টান হবে।

তরুণ-তিমি তার ফলাফলটাও যে না-বুঝেছে তা নয়। ওদের সঙ্গে উত্তর পাড়ার ক্রিলমেলায় না-গেলে বর্তমান মরশুমে সে প্রায় কিছুই খেতে পাবে না। সেটা ওর শরীর ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া। তার মানে পরবর্তী বৎসর দীর্ঘ একটানা অর্ধাশন! একমাত্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের হেরিংই ভরসা। কী করবে তরুণ-তিমি?

ঐ সময়ে ঘটল আর-একটা ঘটনা—দুর্ঘটনাই বলা উচিত। একটা নতুন দলে এল আরও একজন মদ্দা তিমি। ঐ ওদেরই বয়সী। অনায়াসে সে বুঝে নিল আমাদের নায়িকা নিঃসঙ্গ -সঞ্চারিণী, অর্থাৎ জুড়ি বাঁধেনি। স্বভাবতই সে ভাব জমাবার চেষ্টা করল তিমিনীর সঙ্গে। ব্যাপারটা তরুণ-তিমির নজর এড়ায়নি। এটাও লক্ষ করেছিল, প্রথমটায় তিমিনী ঐ নবাগতকে পাত্তা দেয়নি। আর এখন যেন তরুণ-তিমিকে দেখিয়ে-দেখিয়ে সে ঐ নবাগতের সঙ্গে নানান খেলায় মেতেছে। যে-খেলাগুলো এতদিন সে খেলত ওর সঙ্গে, একমাত্র ওরই সঙ্গে। সেই একসঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে সাঁতার কাটা, একই ছন্দে ডুব দেওয়া আর ভেসে ওঠা, হাতডানা দিয়ে হাত কাড়াকাড়ি করা, অথবা ধর তো দেখি আমাকে!

তরুণ-তিমি বুঝল। এ শুধু তাকে উত্তেজিত করা, তাকে তাতানো—তার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করা। দু'একবার তরুণ-তিমি যেন বলতেও গেল এসব কী হচ্ছে?

তিমিনী লেজের ঝাপটা মেরে যেন সাফ জবাব দেয় আমি কী করব? তুমি যে আমাদের দলে আসতে রাজি নাও!

প্রেম মানুষকে দিয়ে অনেক অসাধ্য সাধন করায়। পাঁড় মদ্যপ ভেঙে ফেলে তার মদের পাত্র, জীবনে আর স্পর্শ করে না মাদকদ্রব্য। ঘোর সংসারী একতারা হাতে ঘর ছেড়ে পথে নামে। রাজার ছেলে তার হ্যারো-ইটনের দীক্ষা, জন্মগত সংস্কারের তোয়াক্কা না-রেখে সিংহাসন ত্যাগ করে কোন এক অজ্ঞাতকুলশীলার হাত ধরে বেরিয়ে আসে উইন্ডসর প্যালেস থেকে। ভেব না, প্রেমের সে-ক্ষমতা শুধু মানুষের আঙিনাতেই সীমাবদ্ধ। ক্রৌঞ্চীর বিরহে ক্রৌঞ্চও রচনা করতে পারে, করে, ছন্দোবদ্ধ শ্লোক---তার ঐ কাঁ-কাঁয় আমরা তার অর্থ বুঝি না এই যা। মনুষ্যেতর প্রাণীও পারে প্রেমের আকর্ষণে স্বভাবকে অতিক্রম করতে, সংস্কারকে জয় করতে। তেমন ব্যতিক্রম জীবজগতেও অসম্ভব নয়। যদিও তোমরা বলবে এগুলো মনুষ্যেতর জীবের পাশব বৃত্তি।

তরুণ-তিমিও সিদ্ধান্তে এল। যা কেউ কখনও করে না, সে তাই করবে। জীবনসঙ্গিনীকে সে বেছে নিয়েছে—জীবনসঙ্গিনী তো শুধু নর্মসহচরীই নয়, সে যে সহধর্মিণী। তাই সে নতুন ধর্মে দীক্ষা নিল। স্থির করল—সে বরং তার স্বভাবকে অতিক্রম করবে, জীবনচক্রের ছন্দটাকেই বদলে ফেলবে—তাতে যদি তার মৃত্যু হয় তা-ও মেনে নেবে।

ভুল বলেছিলাম তখন। তরুণ-তিমি কলোম্বাস নয়, ম্যাগেলান নয়- -সে তিমি-কুলে অষ্টম এডওয়ার্ড!

তরুণ-তিমি গোলার্ধ বদল করল।

তিমির রাত্রি নিষ্প্রভাত!

মাপ করবেন, আমার এ অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দটা বিশেষণ পদ নয়, যষ্ঠী বিভক্তিতে। আজ বছর-পাঁচেক তিমি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। এককালে 'গজমুক্তা'য় ষষ্ঠীচরণের মত হাতি নিয়ে লোফালুফি করেছিলাম—তাতেই সাহস বেড়ে গেছে। আরও বড়, আরও বড় কিছু—এই তো আজকের দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি। বাস্তবে তা কিন্তু নয়। তিমির দিকে আমার ঝোঁকটা পড়ে নিতান্ত ঘটনাচক্রে ১৯৭৪ সালের মে সংখ্যা রিডার্স ডাইজেস্ট-এ একটি 'বুক চয়েস' পড়ে 'এ হোয়েল ফর দ্য কিলিং।' লেখকের নাম ফার্লে মোয়াট। ঐ সত্য ঘটনাটি পড়ে আমি অভিভূত হয়ে যাই। মনে পড়ে আমার সেই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের কথা, যাঁরা মূল ইংরাজিতে ঐ কাহিনীটির রসগ্রহণ করতে পারবেন না। স্থির করলাম, বাংলায় ঘটনাটা লিখব। অনুবাদ নয়, মূল তথ্যটা বাঙালি-ঘরানার জারকরসে জীর্ণ করে। রিডার্স ডাইজেস্টে তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র। মূল গ্রন্থটি পড়বার আশায় কলকাতার যাবতীয় নামকরা গ্রন্থাগারে ব্যর্থ অনুসন্ধান করি! কোন বইয়ের দোকানে পাইনি। বিলাতে প্রকাশককে চিঠি লিখেছিলাম, তাঁরা জানালেন—ভারতীয় মুদ্রায় গ্রন্থটি বিক্রয় করবেন না। বিদেশী মুদ্রা আমার মত সামান্য মানুষ কোথায় পাবে? জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানিয়ে অনেকদিন অপেক্ষা করেছি, কোন ফল হয়নি। এ রোগের একমাত্র যিনি ধন্বন্তরী ছিলেন, অগত্যা তাঁরই দ্বারস্থ হলাম—আশ্বাসও পেলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ব্যবস্থা করে ওঠার পূর্বেই আচার্য সুনীতিকুমার লোকান্তরিত হলেন।

হতাশ হয়ে এ গ্রন্থ রচনার কথা মন থেকে সরিয়ে দিই।

ঠিক তখনই ঘটনাচক্রে একটা সুযোগ হয়ে গেল। লন্ডনপ্রবাসী বন্ধু শ্রীরামেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী ঐ বইটি নিজ ব্যয়ে বিলাতে ক্রয় করে আমাকে ডাকযোগে উপহার পাঠান। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। গল্পটি ভালো লাগলে পরোক্ষভাবে আপনাদেরও কিন্তু।

ফার্লে মোয়াট-এর জন্ম অন্টারিওতে। ১৯২১ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিসিলি ও ইটালিতে ছিলেন। পরে ইউরোপ ও বিশেষ করে রাশিয়ায় দীর্ঘকাল ভ্রমণ করেন। কানাডার উত্তরে এসকিমোদের মধ্যে অনেকদিন বসবাস করেন, তাদের নিয়ে কিছু লিখবেন বলে।

যে-ঘটনার কথা লিখতে বসেছি, সেটি ফার্লে মোয়াট-এর জীবনে ঘটেছিল ১৯৬৭ সালে। ঘটনাস্থল—নিউফাউন্ডল্যান্ডের দক্ষিণাংশ। সেখানে তিনি সস্ত্রীক বসবাস করছিলেন, ঐ অঞ্চলের ধীবরদের জীবন নিয়ে কিছু লিখবেন বলে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের দক্ষিণে ছোট একটি দ্বীপ, নাম বার্জিয়ো। তার পূর্বাংশে বসতি ঘন, অধিকাংশই মৎস্যজীবী—যদিও লেখক বাস করতেন ঐ দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে এক নির্জন টিলার উপর। ঐ দ্বীপে অন্তেবাসীর জীবনে নিতান্ত ঘটনাচক্রে ফার্লে মোয়াট এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বসলেন! তিনি দেখতে গেলেন মানুষ, তাদের কথা লিখবেন বলে—কিন্তু দেখে এলেন প্রকাণ্ড একটি তিমিকে, দেখালেন তাকেই। না, ভুল বললাম বোধহয়। তিমির দর্পণে তিনি দেখলেন, দেখালেন মানুষকেই।

ঘটনাচক্রে তিমিটা—না, আবার ভুল করছি, তিমিনীটা আটক পড়ে গিয়েছিল একটা প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক চৌবাচ্চায় 'অল্ডরিজেস পন্ড'-এ! লম্বায় সেটা আধ মাইল, চওড়ায় মাত্র কয়েক শ গজ—তিমির পক্ষে ছোট চৌবাচ্চাই। বাঘ-সিংহ-হাতি-গণ্ডার, মায় গরিলাকে পর্যন্ত মানুষ চিড়িয়াখানায় বন্দী করে খুব কাছ থেকে লক্ষ করে দেখেছে অক্টোপাস-সীহর্স- হাঙর- শঙ্কর মাছকে রেখেছে এ্যাকোয়ারিয়ামে, ডলফিন এবং কিলার হোয়েলদের ওশানিয়ামে পোষ মানিয়েছে। কিন্তু বড় জাতের তিমি? তাকে বন্দী করবার মত জলাশয় কোথায়?

মানুষ তাই এতদিন জীবন্ত তিমিকে দেখেছে দূর থেকে। জাহাজ বা ডুবোজাহাজ থেকে তার ক্ষণিক সান্নিধ্যলাভ করলেও ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে মিতালি পাতাবার অবকাশ মানুষ এতদিন পায়নি।

ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করার আগে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলটার কিছু পরিচয় প্রয়োজন। ঐ অকৃত্রিম হ্রদ—'অল্ডরিজেস পন্ড'-এর সঙ্গে মুক্ত-সমুদ্রের দুটি ক্ষীণ যোগসূত্র। উত্তরদিকে একটি সংকীর্ণ জল-যোজক পুশ-থ্রু। চওড়াতেও সামান্য। গভীরতাও অত্যল্প। দক্ষিণদিকের যোগসূত্র সাউথ চ্যানেল বা সাউথ গাট। হ্রদের গভীরতা গড়ে পাঁচ ফ্যাদম, অর্থাৎ কিনা
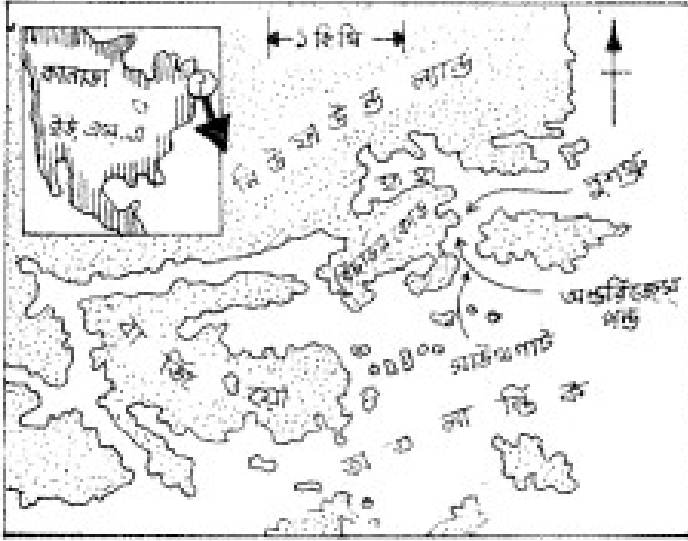
ত্রিশ ফুট। উত্তরের পুশ-থ্রু দিয়ে কোনক্রমে ছোট জাতের নৌকা চলাচল করে; বরং দক্ষিণের ঐ সাউথ চ্যানেল প্রণালীটা কিছু গভীর। জোয়ারের সময় আরও কিছুটা বাড়ে। ২০ জানুয়ারি ১৯৬৭ তারিখে ছিল পূর্ণিমা। তখন ঐ তিমিনী একঝাঁক মাছকে তাড়া করতে করতে সবেগে হ্রদের ভিতর ঢুকে পড়ে। বেচারি ফেরার পথে দেখে ভাঁটার টানে জল অনেক নেমে গেছে। তখন আর হ্রদের নির্গমদ্বার দিয়ে মুক্ত-সমুদ্রে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয়! অর্থাৎ সে বন্দিনী। কে জানে, সে বুঝতে পেরেছিল কি না যে তার বন্দীজীবনের মেয়াদ পুরো একমাস---অমাবস্যায় যদি পার হতে না-পারে, পরবর্তী ভরা পূর্ণিমায় সে অতিক্রম করতে পারবে ঐ প্রণালী, অবশ্য যদি-না ইতিমধ্যে আশপাশের তিমিঙ্গিলের দল খবরটা জানতে পারে।

ফার্লে মোয়াট-এর অভিজ্ঞতাটা তাঁর নিজের জবানিতেই শুনুন

দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর প্রবাসে কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম বার্জিয়োতে। আমাদের সেই বাড়িতে। হ্যাঁ, বাসা নয়, বাড়িই। আমি এখন বার্জিয়োর বাসিন্দা। ঠিক দশ বছর আগে, ১৯৫৭ সালে যখন নিউফাউন্ডল্যান্ডের এই জনবিরল দক্ষিণ প্রান্তে প্রথম আসি তখনই ঐ ইচ্ছাটা জেগেছিল—এই ধীবর পল্লীতে বেশ কিছুদিন বাস করব, জীবনে জীবন যোগ করে ওদের সুখদুঃখ, হাসি-অশ্রুর ভাগীদার হব। ওদের নিয়ে কিছু লিখব। ক্লেয়ার সেদিক থেকে আমার যোগ্য জীবনসঙ্গিনী।

শহরের নানান সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে ওর আপত্তি হলো না। কিংবা কি জানি

সেও বোধ করি বিশ্বাস করতো ওই মন্ত্রে: আমরাও বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে!

ভেবেছিলাম একটা বাসা ভাড়া করব। পাওয়া গেল না। ভালোবাসা পাওয়া যত সহজ, ভালো বাসা পাওয়া তত সহজ নয়। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে একটা দ্বিতল বাংলো অবশ্য পাওয়া গেল। মালিক বললে ভাড়া দেবে না। তবে বিক্রয় করতে রাজি। অগত্যা তাই টিলার মাথায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা সেই উদাসীন বাড়িটাকে কেমন যেন ভালো লেগে গেল। এক ঝাঁক সিরিয়াল আমাদের লোভ দেখালো। কিনেই ফেললাম বাড়িটা।

প্রথম যখন আসি, তখন দ্বীপের এই অংশে ধীবরদের কুটির গুলি ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, বেশ দূরে দূরে। শতকরা শতজনই মৎস্যজীবী। সাত-আট হাত লম্বা 'ডোরি'তে মানে মাছ ধরা নৌকায় ওরা সমুদ্রে মাছ ধরে। তিন চারশো বছর ধরে বংশানুক্রমে। শীত প্রচন্ড। বরফ পড়ে বছরের বেশ কয়েক মাস। তখন শীত কাতুরে দ্বীপটা সাদা কম্বল মুড়ি দেয়। তারপর থ। আমরাও থ। বরফ গলতে শুরু করলেই পথঘাট কর্দমাক্ত। ওরই মধ্যে মৎস্যজীবীরা দুকুড়ি সাতের এর খেলা খেলে চলে। কাক না ডাকা ভোরে পুব আকাশটা লালচে হওয়ার আগেই শোরগোল পড়ে যায়। ওরা বেরিয়ে পড়ে মাছ ধরতে; ফিরে আসে সূর্য্যি ডুবলে। কখনো কখনো ভুল্কো তারা যখন মাছ আকাশে। যারা সমুদ্র যায় না, তারাও বসে থাকে না- জাল বোনে, জাল শুকায়, মাছের পাহাড় প্যাকিং বাক্সে লাদ দেয়। এসব কাজ মেয়েদের, বুড়োদের আর বাচ্চাদের। তবে এদেশে সাত আট বছর পাড়ি দিলেই বাচ্চারা আর বাচ্চা থাকে না, দাদুর সঙ্গে নৌকা নিয়ে বের হয় আর সত্তোর পার হলেও ওরা বুড়ো হয় না। তখনও নাতির হাত ধরে নৌকো নিয়ে বের হয়। তাই মাছ ধরার মরশুমে মেয়েরা ছাড়া আর যারা ডাঙ্গায় থাকে তারা আবশ্যিক-ভাবে নিদন্ত - হয় এপারের, নয় ওপারের। ওরা সুখী ছিল কিনা? তা তো জানি না। সারাদিন ওরা এত ব্যস্ত থাকতো যে, কথাটা জেনে নেওয়া হয়নি। আর ব্যস্ত যখন থাকত না, তখন তো নাচ গান হৈ-হল্লা। শুধু যে রাতে ঝড় হত- সমুদ্রের দিক থেকে বড় বড় ঢেউ বুক-ফাটা হাহাকারে আছড়ে পড়তো পাড়ের পাথরে, সী-গালের মৃতদেহ ঝাপটে পড়তো পাষাণ চত্বরে, সে রাতে ওরা নিশ্চুপ বসে প্রহরের পর প্রহর গুনে যেত শুধু। কারণ ওরা জানত, নিশ্চিতভাবে জানতো, - দু একটা নৌকো ফিরবে না। সেটা কোন পরিবারের?

দশ বছর পরে, এই এখন, দ্বীপের চেহারাটা কিন্তু আমুল পাল্টে গেছে।

লিখতে যখন বসেছি, তখন একেবারে গোড়া থেকেই বলি:-

সভ্য দুনিয়ার মানচিত্রে বার্জিয়ো দ্বীপ প্রথম স্থান পায় ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে-পর্তুগিজ পর্যটক তোয়াজ আলভোরেজ ফাশান্দেজ যখন একে প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন: I lhas Onze Mill Vierges. অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণী! বঙ্গভাসে যার অর্থ: 'সেন্ট উর্সুলার দ্বীপপুঞ্জ।' সেন্ট উর্সুলাকে মনে আছে নিশ্চয়ই? চতুর্দশ শতাব্দীতে জার্মানির কোলন শহরের এই অপরিণামদর্শী মহীয়সী মহিলা বিশ্ব ইতিহাসে একটা অদ্ভুত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। জেরুজালেম কে বিধর্মীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে য়ুরোপের খৃষ্টান রাজন্যবর্গ তখন একের পর এক ক্রুসেড অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ইতিহাসের একটি অধ্যায় রচনা করলেন সেন্ট উর্সুলা- তিনি অবতীর্ণ হলেন দশ সহস্র অপাপবিদ্ধ কুমারী কন্যাকে নিয়ে ক্রুসেড অভিযানে যাবেন বলে। তার ধারণা ছিল, ওইসব অপাপবিদ্ধা কুমারী কন্যার সতীত্বের তেজে মাথা নত করতে বাধ্য হবে শয়তানের পাশবশক্তি। তাই গিয়েছিলেন তিনি। বাস্তবে এগারো হাজার অনাঘ্রতা কুমারী কন্যা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে জেরুজালেমের দিকে রওনা দেয় সেন্ট উর্সুলার সৈনাপত্যে। আর ফিরে আসে না। বলা বাহুল্য, রামদানের সৌভাগ্য তাদের হয়নি। বর্বর বিধর্মীদের হারেম আলোকিত করেছিল দশ সহস্র কুমারী কন্যা! সমুদ্রের বুকে জেগে থাকা অসংখ্য কৌতুহলী দ্বীপকে দেখে, সেই পর্তুগিজ পর্যটকের মনে পড়ে গিয়েছিল

সেন্ট উর্সুলার বাহিনীর সেই হতভাগিনীদের। তাই এই নামকরণ। তিন চারশো বছরে নামকরণটা যে এমনভাবে সার্থক হবে - আরো ব্যাপক অর্থে তা নিশ্চয়ই সেই পর্যটক আন্দাজ করতে পারেননি। ওই ছোট ছোট দ্বীপগুলিও যথারীতি আজ পাশবশক্তির হারেম আলোকিত করছে। তারাও যৌথভাবে ধর্ষিতা।

১৯৪৯ সালে বার্জিয়ো দ্বীপপুঞ্জ কে কানাডার শাসনে আনা হলো। এতদিন ওরা ছিল বস্তুত স্বাধীন, প্রতিটি দ্বীপের মোড়ল ছিল সেই দ্বীপের সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রক। সমুদ্র উপকূলের পাঁচ হাজার মাইল ব্যাপী ভু-ভাগে এমন প্রায় তেরোশো ছড়ানো-ছিটানো জনসমষ্টি ছিল। প্রতিটি ধীবরের বাড়ি থেকে তার নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়ি অন্তত মাইল চারেক দূরে। হলে ওরা ছিল সেই যাকে বলে: আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রান্ডি দ্বীপ। সেখানে বসতি ঘন, কাছাকাছি ছোট ছোট মহল্লা: মেসার্স কোভ, মাডি হোল, ফার্বি কোভ, দ্য হারবার। এর দক্ষিনে কতগুলো দ্বীপ সমুদ্রের কপালে চন্দনের ফোঁটার মতো উত্তরে রিচার্ডস হেড আর গ্রীনহিল। দ্বীপের মধ্যে আটক পড়া অকৃত্রিম হ্রদ অল্ডরিজেস পন্ড - যেন একটা রোমান এম্পিথিয়েটার। চারদিকে পাহাড় উঠে গেছে ঢালু হয়ে, তাতে যেন খাঁজকাটা দর্শক দলের আসন। ওই অকৃত্রিম হ্রদের উত্তরে হা-হা প্রণালী। নামটা অদ্ভুত - শুনেছি, পৌরাণিক যুগে ওই নামে এক দৈত্য ছিল জম্বুদ্বীপে - তার প্রতাপ এখনো শেষ হয়নি। এই আকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দটির শব্দরূপ মুখস্ত করতে হয় সংস্কৃত শিক্ষার্থীকে - অর্থাৎ হা-হা দৈত্যের বিরহে আজও টোলের ছাত্র ‘হাহা-হাহৌ-হাহাঃ করে বিলাপ করে। নিউফাউন্ডল্যান্ডে হাহা-দৈত্যের নাম মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই পৌঁছায়নি তবু ওর নাম হাহা প্রণালী। সেখানে কড আর হেরিং পাওয়া যায় প্রচুর। দক্ষিণ থেকে মৎস্যজীবীরা এই হাহা প্রণালীতে যাওয়া আসার একটা শর্টকাট পথ খুঁজে পেয়েছিল ওই অকৃত্রিম হ্রদের মধ্য দিয়ে। পুশথ্রু আর সাউথ চ্যানেলের পথে অল্ডরিজেস পন্ড দিয়ে।

কানাডার শাসনকর্তার হারেমে প্রবেশের ইচ্ছা ওই কুমারী কন্যাকুলের আদৌ ছিল না। তারা খুশি হতো ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন স্টেটস হিসেবে তাদের ভার্জিনিটি বজায় রাখতে পারলে। কিন্তু তা হলো না। হবে কেমন করে? ওরা তো জানেনা, ষোড়শ গোপিনীর জন্য এক কৃষ্ণ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, কলির কেষ্টঃ ছোট্টখাট্টো মানুষটি, অদম্য উৎসাহ, দুরন্ত উচ্চাভিলাশ এবং দক্ষ শাসক। নাম স্মল উড।

তার হৃদয়টাও কাঠের, বৃহৎ কাষ্ঠ নয় - স্মল উড। তারই প্ররোচনায় দীপবাসী একদিন চৌকো চৌকো বাক্সে টিপ ছাপ দিয়ে, কি জানি কি কাগজ ফেলে এলো। শোনা গেল -বার্জিয়ো দ্বীপপুঞ্জের যাবতীয় কুমারী কন্যা সেন্ট উর্সুলার সেই অক্ষতযোনির দল জোসেফ স্মলউডের হারেমজাত হয়ে গেছে—-বার্জিয়ো দ্বীপপুঞ্জ এল কানাডার শাসনে এবং গোটা নিউফাউন্ডল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হলেন যোশেফ স্মলউড।

এর পর দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তিনি, বলা যায় প্রায় একা হাতে, দ্বীপগুলোকে গড়ে-পিটে মানুষ করেছেন। ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞা কুমারী কন্যাদের পরিয়েছেন ব্রেসারী, প্যান্টি, মিনি স্কার্ট! যান্ত্রিক সভ্যতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারে মন দিলেন তিনি। বলতেন, সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াও দিকিন! না, আর মাছ-ধরা নয়, এবার নতুন করে বাঁচতে শেখ—যেভাবে বাঁচতে শিখেছে আধুনিক দুনিয়া। কল-কারখানায় আমি ছেয়ে ফেলব দেশটাকে। কাউকে বেকার থাকতে দেব না। সবার আগে ভেঙে ফেল ঐ বাপ-পিতেমোর আমলের ডোরিগুলো, ছিঁড়ে ফেল মাছ ধরার ঐ জীর্ণ জালগুলো।

আধুনিকতার একটা মোহ আছে—অনেকেই ছেঁড়া জাল ফেলে দিল সমুদ্রে; খেয়াল করে দেখল না, মাছের বদলে নাগরিক সভ্যতার বীতংসে নিজেরাই ধরা পড়ল তাতে। সত্যই গড়ে উঠল কল-কারখানা। স্মলউড বিদেশী বেনিয়াদের ডেকে আনলেন, দ্বীপের

যাবতীয় সম্পদখনিজ, বনজ, সবকিছুই জলের দামে ইজারা দিয়ে দিলেন। বিদেশী পুঁজিপতিদের তাতে পোয়া বারো। মুশকিল হল অন্যদিক থেকে! এমন ছড়ানো-ছিটানো জনসমাজে কারখানার কর্মী যোগাড় হবে কেমন করে? স্মলউড সমাধান বাতলালেন সহজেই। তৈরি হল বস্তি। নাগরিক সভ্যতার জারজ সন্তান—কল-কারখানা ঘিরে। দূর-দূর দ্বীপ থেকে নগদ প্রাপ্তির লোভে ছুটে এল মানুষ।

কেউ-কেউ মুখ বাঁকাল। বুড়োর দল মাথা নেড়ে বললে, এ তোরা ভালো করছিস না। বাপ-পিতেমো যা শিখিয়েছে, যা করে জন্ম-জন্ম দিন গুজরান করছিলি তাতেই লেগে থাক। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় কই? সমুদ্রে ভাসতে শুরু করেছে কারখানার তেল——মাছের ঝাঁক আর এ পাড়া মাড়ায় না। মাছ আসে না খাঁড়িতে, তাই মানুষই ছোটে কারখানামুখো। কালো হয়ে ওঠে সমুদ্র-মেখলা দ্বীপের ইন্দ্রনীল আকাশ।

আমরা প্রথম যখন ওখানে যাই তখন রাস্তা বলতে কিছু ছিল না, সুইচ টিপলে বাতি জ্বলে এমন তাজ্জব কথা ওরা শোনেনি। ১৯৬৩-তে প্রথম এল মোটর গাড়ি। আর তার চার বছরের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল টিন-বন্দী মাছের কারখানা। গড়ে উঠল নগর এবং আবশ্যিকভাবে একটি নাগরিক পৌরসভা। তার সভ্যবৃন্দ স্মলউডের ধামাধরা হ্যাঁ-মানুষ। মেয়র বা নগরপ্রধান হচ্ছেন ঐ কারখানার মালিক—স্মলউডের চামচা-কুলতিলক! তাঁর ইষ্টমন্ত্র ছিল যা আমার ভালো, তাই গোটা বার্জিয়োর পক্ষে ভালো।

আমাদের দু'জনের মত বহিরাগতকে বাদ দিলে দ্বীপে মুষ্টিমেয় তথাকথিত সভ্যমানুষ। কারখানার মালিক, তাঁর উচ্চবেতনের কয়েকজন সহকারী আর এক ডাক্তার-দম্পতি। ডাক্তার দম্পতির সঙ্গে ঐ মেয়র-মেয়রানির একটা প্রতিযোগিতা কৌতুকের খোরাক যোগাত। কে কত প্রকটভাবে আধুনিকতার পরিচয় রাখতে পারেন বৈভবের মাপকাঠিতে। ইনি যদি ক্যামেরা কেনেন, উনি আমদানি করেন মুভি ক্যামেরা; ইনি যদি ভাল জাতের ঘোড়া কেনেন তো উনি আমদানি করেন সিডানবডি মোটর গাড়ি। টাকার গরম কারখানার মালিক তথা মেয়রেরই বেশি, কিন্তু তাঁকেও সমীহ করে চলতে হত—বেমক্কা অসুখে পড়লে ঐ ডাক্তার-দম্পতিই এ দ্বীপে একমাত্র ভরসা।

ঐ দুটি পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতা হয়নি। না-হবারই কথা। বরং আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল হান-পরিবারের, আর বার্টখুঁড়োর সঙ্গে। হানরা দু'ভাই—বড় কেনেথ এবং ছোট ডগ্‌লাস। বড়দা বিয়ে করেছে, ছোটভাই কী জানি কেন এখনও অবিবাহিত। ওরা কিন্তু ওদের জাত-ব্যবসা ত্যাগ করেনি। বহু প্ররোচনা সত্ত্বেও নাম লেখায় নি কারখানার হাজিরার খাতায়। দু'ভাই আজও ডোরি নিয়ে সমুদ্রে যায় রাত থাকতে। ফিরে আসে ডোরিবোঝাই মাছ নিয়ে। আজকাল মাছটা আর বরফজাত করতে হয় না, বেচে দিয়ে আসে কারখানায়।

বার্টগুড়ো অদ্ভুত মানুষ। সে যে কার খুড়ো, এ প্রশ্নটা প্রথমেই জেগেছিল আমার মনে। বার্টখুড়োর ভাইপো তাহলে কে? পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম— গোটা গাঁ-টাই তার ভাইপো। যাটের উপর বয়স হলে এখানে সবাই 'খুড়ো'; মহিলা 'খুড়ি'। আঙ্কল বার্ট তো দশ-পনের বছর আগেই সার্বজনীন খুড়ো হয়েছে। সংসারে আছে ওর 'মেয়েমানুষ'—কী জানি কেন সে ধর্মমতে বিবাহিত তার পত্নীকে 'স্ত্রী' বলত না কখনও -'মাই ওয়াইফ' নয়, 'মাই উয়োম্যান' অথবা 'দ্যাট উয়োম্যান'। আর ছিল তার একটা লোমওয়ালা কুকুর সীজার। শুনেছি ঐ দ্যাট উয়োম্যান' খুড়োকে অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি উপহার দিয়েছিল। তারা কেউ নেই—কিছু গিয়েছিল সমুদ্রে মাছ ধরতে, আর ফেরেনি। কিছু চলে গেছে বিদেশে চাকরি করতে, আর আসেনি।

বার্টখুঁড়ো প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় আমার বৈঠকখানায় এসে বসত। চেয়ারে সে কিছুতেই বসবে না। ক্লেয়ার তাই ওর জন্য একটা প্যাকিং বাক্স রেখেছিল বৈঠকখানায়! তার উপর জাঁকিয়ে বসত খুড়ো, মন দিয়ে আমার রেডিওতে সান্ধ্য সংবাদটা শুনত।

সংবাদ শেষ হলেই বলত শুয়োর! শুয়োর। শালা শুয়ার-কা বাচ্চা।

ক্লেয়ার ক্রমশ এসব গ্রাম্য গালে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে হয়তো সাড়া দেয় কী খুড়ো? কাকে গাল পাড়ছ অমন করে?

ধপধপে চুলদাড়ি-সমেত মাথাটা নেড়ে খুড়ো বলত না গো ভালো-মানুষের বেটি, গাল দিইনি। গাল দেব কেন? শুয়োরকে শুয়োর বললে কি গাল দেওয়া হয়?

আমাকে তখন প্রশ্ন করতেই হত, কিন্তু কাদের কথা বলছ তুমি?

সব্বাই! কে নয়? ঐ তোমার রেডিওর ভেতরের বক্তিয়ার খিলজি থেকে শুরু করে ডাক্তার, মেয়র, স্মলউড, কে নয়? লর্ড যিসাস জানেন আমরা এখানে সবাই দিব্যি সুখে ছিলাম। সব্বাই এককাট্টা। কারও কোন বিপদ হলে প্রতিবেশী হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ঐ মেয়েমানুষটার, মানে তোমাদের খুড়ির যখন প্রথম বাচ্চা হল, টমের বাপ, ও!, টমকেই তোমরা দেখনি, তার বাপকে কোথা থেকে চিনবে? সে যাই হোক, তখন আমাকে কি কেউ কিছু করতে দিল গা? ওরাই দাই ডেকে আনল, জল গরম করল, নাড়ি কাটল, তাপ-সেঁক দিল। আর আজ? কোন শালা খবর রাখে না তার পাশের বস্তিঘরে কে থাকে। যদি কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় কঁকায় তবে ওরা বড়জোর উঠে গিয়ে সেদিকের জানালাটা বন্ধ করে দেয়! বাস!

আমাকে সহানুভূতি দেখাতে হয় যুগের হাওয়া।

যুগের নয় গো ভালো-মানষের পো। হুজুগের হাওয়া! ঐ কারখানা বানানোর হুজুগ। কী চতুর্বর্গ লাভ হল এতে?

ক্লেয়ার এসে ফায়ারপ্লেসটা উস্কে দেয়। কেন? কত কী হল! রাস্তা হয়েছে, বিজলি বাতি হয়েছে, রেডিও শুনছ, সিনেমা দেখছ! উন্নতি হচ্ছে না?

খুড়ো যেন গনগনে ফায়ারপ্লেস। লাফিয়ে উঠে বললে, এমন হাড়-জ্বালানি কথাটা তুমি বলতে পারলে গা ভালো-মানষের বেটি? একে তুমি উন্নতি বল? বেল পাকলে কাকের কী? রাস্তা কী জন্যে দরকার? ওদের মোটরগাড়ির জন্য। বিজলি আছে আমাদের কারও ঘরে? রেডিও না-শুনে, সিনেমা না-দেখে কি আমাদের এতদিন চলছিল না? সারা এলাকাটায় পা ফেলার জো নেই--সব ঠাঁই তোবড়ানো টিন আর ভাঙা বিয়ারের বোতল। আকাশটাকে পর্যন্ত কালো-নিগার করে ছেড়েছে চিমনির ধোঁয়ায়! অমন যে সর্বংসহা সমুদ্দুর তাকেও তেলচিটে মাদুরের মতো নোংরা করে ফেলেছে গা।

কেনেথ হানও মাঝে-মাঝে আসে- যেদিন নৌকা নিয়ে বার হয় না। আমাকে বলত, আপনি স্যার একবার বুঝিয়ে বলুন না ড্যাগকে। দু-কুড়ি পাঁচ বয়স হয়ে গেল—-আর কবে সংসার পাতবে?

আমি বলতুম, তার আমি কী করতে পারি? ড্যাগ যদি বিয়ে না করতে চায় তাতে তুমিই বা অমন জোর-জবরদস্তি করছ কেন?

কেনেথ মাথা নেড়ে বলত সে অনেক কথা, স্যার। একদিন সময়মত বলব। আমি নিজেকেই অপরাধী মনে করি এজন্য। বলব, সব কথা বলব একদিন!

কেনেথ অবশ্য বলেনি। তবু কথাটা আমার কানে গিয়েছিল। কেনেথের স্ত্রী জানিয়েছিল ক্লেয়ারকে—তরুণ বয়সে ডগলাস হান একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। গ্রামেরই মেয়ে। তখন ড্যাগের বয়স বাইশ-তেইশ, মেয়েটির উনিশ-কুড়ি। বিবাহে বাধা ছিল না; কিন্তু হঠাৎ এক মূর্তিমান বাধা উপস্থিত হল। জানা গেল, ঐ কুমারী মেয়েটি মা হতে চলেছে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও স্মলউড বার্জিয়োকে আধুনিক করেননি। গ্রাম্য সমাজে মেয়েটিকে একঘরে করা হল। ড্যাগ নাকি তার দাদাকে এসে বললে, তা সত্ত্বেও সে মেয়েটিকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। বললে, অজাত সন্তান নাকি তারই! কিন্তু মেয়েটি নিজেই অস্বীকার করল। কে তার সর্বনাশ করেছে তার নাম কিছুতেই বললে না। নামটা জানা যায়নি। শেষ পর্যন্ত গর্ভিণী মেয়েটি নাকি আত্মহত্যা

করে।

এদের নিয়েই কেটে যাচ্ছিল দিন। ডাকহরকরা, দুধওয়ালা, মুদি, রুটিওয়ালা, ধোপানিরাও আমাদের বন্ধু। মাঝে-মাঝে তারা আসত। যদিও সম্ভ্রমের একটা কৃত্রিম দূরত্বের অস্তিত্বকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারতাম না—ওরা সোফায় বসবে না, সামনে-সমানে কথা বলবে না। তবু নানান প্রয়োজনে ওরা পরামর্শ নিতে আসত এই লেখাপড়া-জানা মানুষদুটির কাছে। মেয়েরা মেয়েলি পরামর্শ নিতে, আমার নজর এড়িয়ে কখনও কখনও আসত ক্লেয়ারের কাছে।

পাঁচ বছর পরে দেশে ফিরে দেখলাম, অনেক কিছুই বদলে গেছে—কিন্তু ওদের সেই সম্ভ্রম-নেশানো ভালবাসাটায় ভাঁটার টান ধরেনি। যাবার সময়, পাঁচ বছর আগে বাড়ির চাবিটা রেখে গিয়েছিলাম প্রতিবেশিনী ধোপানির কাছে! জাত-ধোপানি নয়, সে ছিল মৎস্যজীবী মরদের ঘরণী। স্বামীকে সমুদ্র টেনে নিল, তাই ও গ্রামের আর পাঁচজনের কাপড় কেচে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফিরে এসে দেখলাম - ঘরদোর ঝক্‌ঝক্ তকতক করছে; মায় পর্দাগুলো পর্যন্ত সদ্য কাচা, রান্নাঘরে বালতিতে জল। দল-বেঁধে প্রতিবেশীরা এল স্বাগত জানাতে। পাঁচ বছরের জমা খবর দিল তারা-ফ্রেডখুড়ো সাগর পেয়েছে, কেনেথ হানের একটি কন্যা হয়েছে, গত বছর ক্যারিবু (এক জাতের হরিণ) বিশেষ ধরা পড়েনি, মাছের ঝাঁক এ মরশুমে কম, জালের সুতোর দাম ঊর্ধ্বগামী, প্রতি শনিবার কারখানার প্রাঙ্গণে সিনেমা দেখানো হয়। ক্লেয়ার তার ঝোলা থেকে বার করল ক্যান্ডি আর কেক – বিদেশ থেকে আনা। ভাগ করে সবাইকে দিল। বার্টখুড়োর জন্য সে একটা ওক কাঠের পাইপ এনেছিল, খুড়ির জন্য ঘাসের চটি। খুড়ো তো উপহার পেয়ে খুব খুশি।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, বার্টখুড়ো বলে ওঠে ও হো! ভুলেই যাচ্ছিলাম। ভালো-মানষের বেটি। আজ আর তুমি উনানে আঁচ দিও না! ঐ মেয়েমানুষটা বলেছে— তোমরা দু'জন আজ আমাদের বাড়িতে খাবে। প্রথম দিন তো! গোছাতে-গাছাতে সময় লাগবে।

সে রাত্রে বার্টখুড়োর বাড়িতেই আমাদের নৈশাহার সারতে হল। খুড়ি একা বেশি কিছু আয়োজন করে উঠতে পারেনি। ভাঁড়ারেও তার নিত্য-ভবানী! হাতে-গড়া ব্রাউন রুটি, কড়া করে ভাজা হেরিং মাছ, ম্যাকারেল মাছের গ্রেভি, আর ঘরে করা মদ।

তাই তৃপ্তি করে খাওয়া গেল। ক্লেয়ার রান্নার প্রশংসা করতেই হো-হো করে হেসে উঠল বার্টখুড়ো। বললে, আসলে তোমাদের ক্ষিধে পেরেছিল প্রচণ্ড! সস্ ইস্ দ্য বেস্ট হাঙ্গার—

খুব ছেলেবেলা থেকেই তিমি জন্তুটার প্রতি আমার দুরন্ত কৌতূহল। যতদূর মনে পড়ে, অতিশৈশবে ঠাকুর্দার কোলে বসে একটা ছড়া শুনতাম, তখন থেকেই আমার চরিত্রে এই তিমিপ্রেমের সূচনা। ছড়াটা আদ্যন্ত মনে নেই, তবে শুরুটা আছে

In the North Sea lived a whale,
Big of bone and large of tail...
ছিল এক তিমি সেই উত্তুরে সাগরে
খানদানি বপু তার, ফিরত সে হাঁ করে.......

যতদূর মনে পড়ে, ছড়াটায় বর্ণনা করা হয়েছিল—কীভাবে সেই তিমি সমস্ত সমুদ্রের অধীশ্বর হয়ে ওঠে। সবাই তাকে সেলাম জানায়, খাতির করে তারপর একদিন সে হঠাৎ লক্ষ্য করল একটা বিজাতীয় বিশালকায় জলজন্তু তাকে পাত্তা না-দিয়ে পাশ কাটাচ্ছে। তিমিরাজের মেজাজ গেল বিগড়ে। হাতডানা দিয়ে সে কষিয়ে দিলে এক থাপ্পড়। ফল হল মারাত্মক! কারণ ঐ জলজন্তুটা ছিল একটা ডুবোজাহাজের টর্পেডো!

ছোটদের ছড়ায় একটা করে নীতিবাক্য থাকবেই; এক্ষেত্রে বোধ-করি ছড়াকার

শিশুমনে একটা প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন অহৈতুকী কৌতূহল ভালো নয়। আমার ক্ষেত্রে প্রভাবটা ঘটল বিপরীত—আমার কৌতূহল গেল বেড়ে, ঐ তিমির বিষয়ে। আর আমার সহানুভূতিও গেল ঐ তিমিটার দিকে। আমার মনে হয়েছিল—ঐ ডুবোজাহাজটা তিমিরাজের সরলতার অন্যায় সুযোগ নিয়েছে।

ক্রমশ যখন বড় হলাম, non-human form of life [*প্রসঙ্গত, এর বাংলা কী? 'মনুষ্যেতর' নয়, 'non'-এ কোন 'ইতরামি' নেই 'অমানুষ' শব্দটাতে আমরা যে যোগরূঢ় ব্যঞ্জনা আরোপ করেছি সে 'ভামানুষিকতার' সঙ্গে 'non-human' শব্দটা সমার্থক নয়*]-এর দিকে আমার তীব্র আগ্রহ জন্মাল। আর জীবজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণীটির প্রতি জন্মাল এক দূরন্ত কৌতূহল। অনেক বই ঘেঁটেছি ওদের কথা জানতে। তখনও, অর্থাৎ এই নিউফাউন্ডল্যান্ড আসার আগে পর্যন্ত আমি কখনও কোন বড় জাতের তিমি দেখিনি।

সেটা দেখলাম ১৯৬২ সালে। ক্লেয়ার আর আমি দু'জনেই ছিলাম রান্নাঘরে। আমাদের প্রতিবেশী ওনী স্টিকল্যান্ড হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বললে, শিগগির বাইরে আসুন স্যার। ওরা এসে গেছে!

ওরা! ওরা কারা?

সেই যাদের কথা সেদিন বলছিলেন। একঝাঁক তিমি!

একঝাঁক তিমি! বাইনোকুলারটা তুলে নিয়ে আমরা দু'জনেই ছুটে বাইরে আসি। আশ্চর্য! তীর থেকে সিকি মাইলও হবে না—কয়েকটা জলজন্ত ঘোরাফেরা করছে। তিমিই তো? চোখে যেটুকু দেখছি তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—ঐ যখন শ্বাস নিতে উঠেছে—এ্যাত্তটুকুন দেহ একনজর ঝাঁকিদর্শনে দেখাচ্ছে। তবে নিঃশ্বাসের ফোয়ারাটার জোর আছে বটে। কী জাতের তিমি ওরা? কত বড়? আমরা দু'জনেই স্তম্ভিত! মহাসমুদ্রের সেই দুরন্ত বিস্ময় অযাচিত এসেছে আজ আমাদের দোরগোড়ায়!

ক্লেয়ার বললে, কী মনে হয়, কোন বড় জাতের তিমি?

আমাকে জবাব দিতে হল না, দিলেও আন্দাজে বলতে হত। আমার পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল হ্যাঁ গো ভালো-মানষের বেটি। ওগুলো ডানা তিমি। Fin-whale!

ক্লেয়ার বলে, কী করে বুঝলে?

ও শ্বাস ফেলবার কায়দা দেখে। পর্বতাং বহ্নিমান ধূমঃ!

কত বড় হবে এগুলো?

অন্তত ছয়-ডোরি তো হবেই।

ছয়-ডোরি! তার মানে?

বার্টখুড়ো ফুট-ইঞ্চি বোঝে না; মিটার সেন্টিমিটারও নয়। তার দুনিয়ায় দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি 'ডোরি'---মাছ ধরা নৌকা। আমি মনে-মনে হিসাব কষে পাদপূরণ করি—তার মানে প্রায় সত্তর ফুট!

খুড়ো বললে, দেখে নিও। ওরা সারাটা শীতকাল এখানে থাকবে। রোজই ওদের দেখতে পারে—আশেপাশে হু-হুম্ করে শ্বাস ফেলছে। ওরা হেরিং খেতে আসে এ পাড়ায়— বাধা দিয়ে বলি, কিন্তু আমি তো জানতাম ডানা তিমি শুধু ক্রিল খায়।

হো-হো করে হেসে ওঠে বার্টখুড়ো, গোপাল চিনেছেন শালুক ঠাকুর! না হে ভালো-মানষের পো, সে হল গিয়ে নীল তিমি। তারা সাত-আট ডোরি লম্বা। ডানা তিমি গ্রীষ্মকালে ক্রিল খায়, শীতকালে হেরিং। এসব কথা তোমাদের ঐ কেতাবে লেখা থাকে না।

সেদিনই নানান আলাপে বুঝতে পারলাম, ঐ নিরক্ষর মৎস্যজীবীর জ্ঞানের পরিধি। সমুদ্রের নানান খবর সে সংগ্রহ করেছে জীবনে জীবন যোগ করে। দেখেছে নিজের চোখে, শুনেছে নিজের কানে। সমুদ্র তার অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে--তিন-তিনটি

পুত্র, দুটি পৌত্র; তবু ওর কোন অভিমান নেই। সমুদ্রকে সে অভিশাপ দেয় না। সমুদ্রকে সে ভালবাসে। অনেক সময় দেখেছি কর্মহীন অবসরে ও চুপ করে বসে থাকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। এখনও—-এই বৃদ্ধ বয়সেও সে ডোরি নিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে। আমার বিশ্বাস, মাছ ধরার অছিলায় ও ঐ তরঙ্গ-স্বনিত সমুদ্রের বুকের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে চায়; অন্তেবাসীর মত পাড়ে বসে যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন মাছ ধরার অছিলায় ও বেরিয়ে পড়ে। হয়তো দিগন্তঘেরা বাল্যসহচরীর সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলে আসে। খুড়ি সেটা বোঝে, জানে, ঐ নীলাম্বরী-পরা নিত্যনবীনাহ খুড়োর জীবনে প্রথম প্রেম, খুড়ির সতীন! তাই ফিরে এলে জানতে চায় না: মাছ পেলে নাকি কিছু? বরং বলে, কী প্রাণটা ঠাণ্ডা হল?

সে বছর সারা শীতকাল ধরে আমরা ঐ তিমিগুলোকে দেখেছি। সেই ১৯৬২ সালে। প্রায় প্রতিদিনই সান্ধ্য আসরে তিমির প্রসঙ্গ উঠে পড়ত, বার্টখুড়ো, খুড়ি, ওনী, হান ভাইরা যখন এসে বসত আমাদের বাইরের ঘরে। ওরা সবাই বসবে কার্পেটের উপর পা-মুড়ে। শুধু বনগ্রামের শিবাসম্রাট বসতেন তার নির্দিষ্ট প্যাকিং বাক্সের সিংহাসনে। ওরা সন্ধ্যাবেলায় এখানে জমায়েত হত—আমার মনে হয়—দুটি কারণে। প্রথমত আমাদের বৈঠকখানায় ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলে; ওদের জ্বালানি কেনার পয়সা নেই। দ্বিতীয়ত এই বহিরাগত পরিবারটির কাছে ওরা হয়তো এমন কিছু পেত, যা এ-দ্বীপের আর পাঁচটা ভদ্রলোকের পরিবারে গিয়ে পেত না। আলোচনাটা ঘুরে-ফিরে তিমির দিকে মোড় নিলেই বার্টখুড়ো তার অভিজ্ঞতার ঝুলি ঝেড়ে নানান গল্প শোনাত। মনে আছে, কথাপ্রসঙ্গে একদিন খুড়োকে একটা কঠিন প্রশ্ন করেছিলাম— নিশ্চিত জেনে যে, খুড়ো এবার কাৎ হবে! উত্তরটা তার জানা নেই। কারণ এই রহস্যের কোন কিনারা বিজ্ঞান এখনও করতে পারেনি। অনন্ত জীববিজ্ঞানীদের নানান গ্রন্থ ঘেঁটে এই অসঙ্গতির কোন যুক্তিনির্ভর সমাধান আমি খুঁজে পাইনি। আমাকে সেদিন খুড়োই বরং কাৎ করেছিল! আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে খুড়ো তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যে সমাধান বাতালাল, সেটাকে অস্বীকার করতে পারিনি।

ব্যাপারটা খুলেই বলি:

আমি বলেছিলুম, খুড়ো, একটা কথা তো মানবে— জীবজগতে প্রত্যেকটি প্রাণীর দক্ষিণ অঙ্গ তার বাম অঙ্গের দর্পণ-প্রতিবিম্ব? মানে, ডান দিকে কান, পাখনা, হাত থাকলে, তা বাঁ দিকেও থাকবে? ডান গালে দাড়ি-কেশর-আজি দাগ থাকলে, তা বাঁ গালেও থাকবে? পশুপাখি- মাছ- কীট- পতঙ্গ সর্বত্রই এ আইন সমানভাবে প্রযোজ্য। মানো তো?

খুড়ো তার সদ্যোপ্রাপ্ত ওক-কাঠের পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে বললে, না। সব ঠাঁই নয়। Rules prove the exception! অর্থাৎ পরিচায়কই নিয়মের ব্যতিক্রম। ডানা তিমির বেলায় তা নয়। তার ডান দিকের ঝিল্লি এই আমার দাড়ির মত ধপধপে, কিন্তু বাঁ চোয়ালের ঝিল্লি ঐ ভালো-মানষের বেটির চুলের মত কুচকুচে!

অর্থাৎ খুড়ো আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়েছে। আমি লেঙ্গি মারবার উপক্রম করতেই সে যেন বলে বসল লেঙ্গি মারতে চাইছো বুঝি?

ফলে চেপে ধরলাম তাকে। এবার বল তো, সেটা কেন? ডানা তিমি কেন এমন দুর্লভ ব্যতিক্রম?

খুড়োর ফুটিফাটা মুখে হাসিটা ছড়িয়ে গেল। দাঁতে পাইপটা কামড়ে ধরেছে। ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে-- হুম। জব্বর প্রশ্ন তুলেছ! তা তোমাদের কেতাবে কী বলে?

একটু চটে উঠে বলি, কেতাবে কিছু বলে না। তুমি কী বল? জান তার কারণটা? সাগরনীল চোখের মণিদুটো ঢাকা পড়ে গেল। চোখ বুজে মিটিমিটি হাসি মিশিয়ে বললে,

জানি।

কী? বল দিকিনি?

ফায়ারপ্লেসের দিকে বলিরেখাঙ্কিত হাতদুটো বাড়িয়ে আগুনের তাপ নিতে-নিতে বললে, তাহলে একটা গল্প শোন। অনেক—অনেক দিন আগেকার কথা। আমার বয়স তখন দশ-বার। ঠাকুর্দার সঙ্গে ডোরি নিয়ে মাছ ধরতে যেতাম। তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে ডানা তিমি আসত এই বার্জিয়ো পাড়ায়। দলছুট কুঁজি তিমি, রামদাঁতাল, এমনকি নীল তিমিকেও দেখেছি। তবে ডানা তিমিই আসত বেশি। তারা আমাদের ডোরির আশেপাশে শ্বাস ফেলত। এত কাছে যে, বৃষ্টির ছাটের মত তা আমাদের গায়ে এসে লাগত। ওরা জানত, আমরাও ওদের মত মাছ ধরতে আসি। একদিন সন্ধ্যা হয়-হয়, আমি বসে আছি ডোরির মাথায়, ডোরি-বোঝাই হেরিং—হঠাৎ গ্র্যান্ড-পা বললে, দ্যাখ দ্যাখ খোকন! কান্ডটা দ্যাখ!'—তাকিয়ে দেখি তিন-চার ডোরি তফাতে একটা প্রকাণ্ড ডানা তিমি অদ্ভুত কায়দায় হেরিং মাছ ধরছে। সে সমুদ্রে পাক খাচ্ছে। প্রথমে বড়-বড় পাক—তার বেড়াজালে হেরিংগুলো ইতি-উতি ছুটছে! তারপর তিমিটা তার পরিক্রমাবৃত্তের ব্যাসটা ক্রমশ ছোট করে আনতে থাকে—অর্থাৎ মাছগুলোকে সঙ্কুচিত পরিসরে ঠাসবুনোট করে ফেলে। শেষে দ্যাখ-না- দ্যাখ সাঁৎ করে ছুটে আসে সেই কেন্দ্রের দিকে, বিরাশি সিক্কা হাঁ করে। বললে, না-পেত্যয় যাবে ভালো-মানষের পো! এক হাঁ-এ সে সব ক'টা মাছকে গিলে ফেলল। ব্যস্। চোখের পলক না-ফেলতে তলিয়ে গেল সমুদ্রের তলায়!

বার্টখুড়ো থামল! হেলান দিয়ে বসল! আর ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।

আমি প্রশ্ন করি, তাতে কী হল?

গম্ভীরভাবে খুড়ো বললে, তিমিটা পাক খাচ্ছিল ক্লকওয়াইজ চালে! মানে ঘড়িটাকে টেবিলে চিৎ করে রাখলে কাঁটা যেদিকে পাক খায়!

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, তাতেই বা কী হল?

খুড়ো তখনও নির্বিকার। বললে, ডানা তিমি এভাবেই মাছ ধরে। আমি বহুবার দেখেছি। মাছ ধরবার সময় ওরা কখনও এ্যান্টিক্লকওয়াইজ পাক খায় না। সব সময়েই ঘড়ির কাঁটার মত। আমার ততক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ধমকে উঠি তা তো আমি অস্বীকার করছি না! কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নটা কী ছিল?

খুড়োরও এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কেতাব পড়ে-পড়েই তোমার এমন নিরেট বুদ্ধি হয়েছে ভালো-মানষের-পো। শোন, বুঝিয়ে বলি—

খুড়ো তার অমার্জিত ভাষায় যে-ব্যাখ্যা দিয়েছিল সেই যুক্তিটাই বোধ করি প্রযোজ্। হয়তো কেন—এটাই নিশ্চিত প্রকৃত ব্যখ্যা। তিমি যখন চক্রাকারে মাছগুলোকে বন্দী করে তখন ঐ বৃত্তের কেন্দ্রটিকে আলোকিত করার প্রয়োজন দুটি কারণে। প্রথমত মাছগুলো আলোকবিন্দুর দিকেই কেন্দ্রীভূত হয় দ্বিতীয়ত তিমি নিজেও দেখতে পায় মাছগুলোকে। যেহেতু ডানাতিমির দক্ষিণ চোয়ালের ঝিল্লিগুলো শ্বেত বর্ণের এবং যেহেতু সে দক্ষিণাবর্তে পাক খাচ্ছে তাই সূর্যের প্রতিফলিত আলোকে বৃত্তের কেন্দ্রস্থ জলরাশি আলোকিত হয়। সে যদি 'প্রদক্ষিণ' না-করত, বামাবর্তে পাক খেত তাহলে এটা হত না। অর্থাৎ লক্ষ-লক্ষ বছরের বিবর্তনে জিরাফ যেমন গাছের উঁচু ডালের পাতা খাওয়ার প্রয়োজনে গলাকে লম্বা করেছে, গঙ্গাফড়িং তার গায়ের রং করেছে ঘাসের মত সবুজ, জেব্রা, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার গায়ে জড়িয়েছে ডোরাকাটা চাদর, তেমনি ডানা তিমি তার মুখবিবরের দক্ষিণ প্রান্তের ঝিল্লিকে করে তুলেছে মসৃণ, এ্যালুমিনিয়াম দর্পণের মত ধপধপে সাদা! তাই সে শুধু দক্ষিণাবর্তেই 'প্রদক্ষিণ' করে।

এসব কথা কোন কেতাবে লেখা নেই। বার্টখুড়োর জীবনে জীবন যোগ-করা অভিজ্ঞতার অনুবেদন। এ-নিয়ে আপনারা একটা থিসিস লিখতে পারেন। জীববিজ্ঞানে ডক্টরেট পাওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৬৭ ছিল শনিবার। কৃষ্ণা প্রতিপদ। কেনেথ আর ড্যাগ দু'ভাই যথারীতি তাদের সাবেক মাছ-ধরা ডোরিটা নিয়ে যখন বের হয়, তখনও পুব আকাশের গায়ে ঘুমজড়ানো কুয়াশা। মাড়ি হোল থেকে ওরা গিয়েছিল হা-হা প্রণালীর দিকে। সারাদিন সেখানে মাছ ধরে পড়ন্ত বেলায় ডোরি-বোঝাই হেরিং নিয়ে বাড়ি ফিরছে- গ্রীণহিল দ্বীপ পাক মেরে নয়, অন্ডরিজেস্ পন্ড-এর শর্টকাট পথে। যাওয়ার সময়েই সাউথ গাট দ্বীপের কাছাকাছি ওরা একঝাঁক ডানা তিমির অস্তিত্ব টের পেয়েছিল, ভ্রূক্ষেপ করেনি। এ বছরও গোটাকয়েক ডানা তিমি যে শীতকালীন ড্যানচি-বাবুর মত বার্জিয়োর ধারেকাছে থানা গেড়েছে, এ সংবাদ ওদের অজ্ঞাত ছিল না। তারা কোন ক্ষতি করে না।

আকাশে দুধছানা-কাটা মেঘ। পশ্চিমদিকটা গ্র্যানাইট কালো। আবহাওয়ার খবর ঝড় হতে পারে। তাই পাঁচ অশ্বশক্তির ডোরিটা নিয়ে দিনের আলো থাকতে-থাকতে ওরা ডেরায় ফিরতে আগ্রহী। পুশ্ থু প্রণালীর ভিতর দিয়ে সাবধানে ডোরিটাকে নিয়ে অল্ডরিজেস পন্ডে ঢুকেও ওরা কিছু টের পায়নি। কিন্তু হ্রদের মাঝামাঝি আসতেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে গেল: হু -হুস।

মুক্ত সমুদ্রে এ শব্দে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এখানে? এই বদ্ধ হ্রদে?

কেনেথ পরে আমাকে তার অনুভূতিটা বর্ণনা করেছিল হক্ কথা বলব কর্তা, আমি স্রেফ চুপসে গেলাম, এখানে অমন 'হু-হুস্' করে কোন্ সুমুন্দির-পো! ঘুরে দাঁড়াতেই নজর হল— ই-য়া এক পেল্লায় তিমি। লম্বাতে কিছু না-হয় তো পাঁচ ডোরি। আমি বললুম, ড্যাগ মা মেরীর নাম জপ কর।

তিমিটা কিন্তু ওদের আক্রমণ করেনি। ভু-স্ করে ডুব দিল। ড্যগ পুরোদমে এঞ্জিন চালাল দক্ষিণ প্রণালীর দিকে। কিন্তু কয়েক কদম যেতে না-যেতেই এক কাণ্ড। মাঝদরিয়ায় তিমিটা ভেসে উঠল। প্রশ্বাস ছাড়ল, তারপর দম ধরে নক্ষত্রবেগে ছুটে গেল ঐ দক্ষিণ প্রণালীর দিকে। কেনেথ ভাবছিল—জন্তুটা মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে—কিন্তু পারবে না—নির্ঘাত ধাক্কা খাবে ডুবোপাথরে। কিন্তু না! একেবারে শেষ মুহূর্তে সে গতি সম্বরণ করল। যেন বুঝে নিল তার বিরাট দেহটা গলবে না। তলপেট খান-খান হয়ে যাবে ঐ সংকীর্ণ অগভীর প্রণালীর ডুবোপাথরে। তিমিটা ফিরে গেল মাঝদরিয়ায়। থামল না কিন্তু। মোড় ঘুরে আবার ছুটে এল ভীমবেগে—আশ্চর্য! শুধু একেবারে একই ভাবে শেষ মুহূর্তে আচমকা থেমে পড়তে।

যে-সত্যটা হান-ভাইরা অনুধাবন করেছিল, সেটা তিমিটাও বুঝল। ঐ অগভীর জলপথে তার দেহটা যেতে পারবে না। তাহলে সে ঢুকল কেমন করে? এল কোন্ পথে? এসেছিল ঐ দক্ষিণ প্রণালী দিয়েই। শুক্রবার রাতে যখন পূর্ণিমার ভরা কোটালের জলস্ফীতিতে অগভীর প্রণালীটা গভীরতায় সাময়িকভাবে পাঁচ-ছয় ফুট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে অনেকটা—আবার জোয়ার আসবে, তিমিটা জানে, কিন্তু ভরা কোটাল নয়, প্রতিপদের জোয়ারের জল অতটা বাড়বে কি, যাতে তার দেহটা গলতে পারে? কেনেথ আন্দাজ পায় না। ততক্ষণে ওরা ডোরিটা এপারের ঘাটলার কাছে এনে ফেলেছে। কারণ আটক-পড়া তিমিটা যখন ঐ একমাত্র নির্গমনদ্বারের দিকে প্রভঞ্জনবেগে তেড়ে আসছে তখন যে জলস্ফীতি হচ্ছে তাতে ওদের ডোরি উল্টে যেতে পারে।

বারকয়েক ব্যর্থ চেষ্টা করে তিমিটা যেন বুঝল—বুঝল, এভাবে হবে না। সে আসলে বন্দী হয়ে পড়েছে। পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট হ্রদে। এক মাসের জন্য পরবর্তী চান্দ্রমাসের ভরা কোটাল তক্। তিমিটা তার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দেওয়া মাত্র কেনেথ তার ভাইয়ের কানে কানে বললে, ও ব্যাটা হাঁপিয়ে পড়েছে—এই সুযোগে—খুব ধীরে-ধীরে খাঁড়িটা পাড়ি দে।

বললে না-পেত্যয় যাবেন কর্তা, ঠিক তখনই যে কাণ্ডটা ঘটল!—কেনেথ পরে,

অনেক পরে, আমাকে বলেছিল তিমির হুস-হুসানি কারবার আমার ভালমতই জানা—না-হোক হাজারবার তাদের ঐ হুস-হুসানি সমুদ্রে শুনেছি—- প্রতিবারই দেখেছি, শুধু ব্রহ্মতালুটা জলের উপর জাগিয়ে হু-উস্ করে। পিঠটা দেখা যায় কি না-যায়! আর এবার ও বেটা জল থেকে উঠল প্রকাণ্ড একটা হাতিশুঁড়োর মত—সিধে! খাড়া! যেন মনুমেন্ট!

'আমি তখন আদর খাওয়া নেড়িকুত্তার ন্যাজের মত'

শ্বাস ফেলতে নয়, আমাদের সমঝে নিতে। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাজ্জব বনে গিয়ে দেখি সে একটা চোখ মেলে আমাদের দেখছে। যেন বলতে চাইছে—তোমরা তো এ পাড়ার লোক, জান—এখান থেকে বেরুবার কোন সুলুক-সন্ধান? ভয়? তা বলতে পারেন কর্তা—আমি তখন আদর-খাওয়া নেড়িকুত্তার ন্যাজের মত তুর তুর করে কাঁপছি! ওর হাঁ-মুখটা বন্ধ ছিল, কিন্তু সেটা এত প্রকাণ্ড যে হাঁ করলে ডোরি-সমেত আমাদের দু'ভাইকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। আমি বললুম, ড্যগ! যা থাকে বরাতে, ইঞ্জিন চালু কর! দু'ভায়ে কী করে যে পালিয়ে এসেছি, তা প্রভু যিসাসের মালুম। এ শুধু আপনাদের বাপ-দাদার আশীর্বাদ।

বন্দরে ফিরে এসে তারা সবিস্তারে ওদের অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করে অনেকেই বিশ্বাস করে না, করার কথাও নয়—ঐ অল্ডরিভেস পন্ডে কখনও তিমি ঢুকতে পারে? শুধু বার্টখুড়ো ওদের বলেছিল, না তিমি নয়, ওটা তিমিনী-

তুমি কেমন করে জানলে? তুমি তো চোখেই দেখনি!

তা দেখিনি। তবে আমি আনপড় গাঁওয়ার তো! আমাকে ওসব জানতে হয়। কেন জান? যে তিমিনীর পেটে বাচ্চা আসে তার ক্ষিদে বেড়ে যায় প্রচণ্ড। দেখনি? চার-চারটে সীনার [Seiner—হেরিং মাছ ধরার বড় জাহাজ] এ তল্লাটে আজ সাত-আট দিন ধরে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। তাই হেরিং-এর ঝাঁক ঐ অল্ডরিজেস পন্ডে দল বেঁধে গা-ঢাকা দিতে চায়। ওরা জানে—ঐ অগভীর সংকীর্ণ পথে সীনার যেতে পারে না, তিমিও না। এ বেটি—মা হবে তো, তাই ক্ষিদের জ্বালায়, মানে নিজের জন্য নয়, পেটের ঐ শত্রুরটার জন্য, মাছের পিছনে তাড়া করে এসে আচমকা ঐ হ্রদে ঢুকে পড়েছে। প্রাণভরে খেয়েছেও। তারপর জল সরে যেতে বন্দী হয়ে পড়েছে। বেচারি!

কে বুঝি সুযোগ বুঝে খুড়োকে তাতায় তা হ্যাঁ খুড়ো, হেরিং ধরায় কে বেশি দড়? সীনার, না তিমি?

খুড়ো বুঝতে পারে না, ওরা তার ঠ্যাং টানছে। বিজ্ঞের মত বলে, তফাত আছে। সীনার যেসব মাছ ধরে—হেরিং, কাপেলিং, কড সেগুলো ধরে জলের ওপরতলায়। আর

তিমি তাদের ধরে নিচে থেকে তাড়া করে এনে। কিন্তু আসল তফাতটা সেখানে নয়, বুয়েছ, আসল ফারাকটা কী সে জান? পেট ভর্তি হয়ে গেলে তিমি মাছ ধরার ক্ষান্ত দেয়। ক্ষিদে না-থাকলে সে মাছ ধরে না, তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও গ্রাহ্য করে না। অথচ তোমাদের ঐ সীনার? তাদের অ-ভর পেট ভরতেই চায় না। তিমি যেখানে এক টন হেরিং-এ খুশ, সীনার সেখানে দুশ টন বোঝাই দিয়েও তৃপ্ত নয়। তফাতটা সেখানেই।

বেশ খোশগল্প হচ্ছে, হানরা দু'ভাই হাতে-হাতে মাছগুলো ডোরি থেকে নামিয়ে রাখছে। হঠাৎ তাদের মাঝখানে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জনা-পাঁচেক উটকো লোক এসে হাজির। উটকো মানে ওরা মেছো-মানুষ নয়, ঐ কারখানার মজদুর। ওদের দলপতি জর্জি প্রশ্ন করে, হ্যাঁ গো! তোমাদের মধ্যে কে নাকি অল্ডরিজেস পন্ড-এ আটক-পড়া একটা তিমিকে দেখে এসেছে? খুড়ো বললে, তিমি নয়, তিমিনী-

কেনেথ আগ বাড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, আমি। কেন?

তুমি কী দেখছ, বল তো?

এ কেচ্ছা বারে বারে বললেও ক্লান্তি আসে না। কেনেথ আবার সবিস্তারে ঘটনাটা বিবৃত করে। জর্জি বলে, কী মনে হয়? এখনও গেলে দেখতে পাব?

খুব সম্ভব। আবার জোয়ার আসার আগে ও-বেটা—

বার্টখুড়ো ধমকে ওঠে, আবার বলে 'বেটা'! বলছি না ওটা তিমিনী-

হ্যাঁ, ও বেটি পালাতে পারবে না।

খুড়ো আরও বলেছিল, পোয়াতি নাতবৌকে দেখতে চাও? তা এই অবেলায় কেন ছুটোছুটি করবে? কাল যেও, ও এখন একমাস ওখানে থাকবে।

এক মাস! তুমি কেমন করে জানলে? কোন্ মহাভারতে লেখা আছে?

খুড়ো খ্যাঁক-খ্যাক করে হেসে ওঠে, এ্যাই দ্যাখ পাগলের কথা। এসব কথা কি কেতাবে লেখা থাকে? আমি আনপড় গাঁওয়ার তো, এসব আমাকে জানতে হয়। নাতবৌয়ের এনগেজমেন্ট প্যাডে লেখা আছে, "১৯শে ফেব্রুয়ারি অল্ডরিজেস পন্ড ত্যাগ!"

লোকটা হাঁ হয়ে যায়!

খুড়ো বলে, বুঝলে না? তখন ফিরে-কিস্তি পুন্নিমে আসবে যে নাতবৌ জানে, তার আগে ওর ঐ খানদানি বপুটা সাউথ চ্যানেল দিয়ে গলবে না। ও এমন কিছু কিছুতেই করবে না, যাতে ওর তলপেটে ধাক্কা লাগে। মা হতে যাচ্ছে যে! বুঝলে না? পেটে যে শত্রুরটা রয়েছে! অনেক—অনেকদিন পরে বার্টখুড়ো আর হানভাইরা স্বীকার করেছিল বিশ্বাস করুন কর্তা! তখন যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দ হত ওদের আসল মতলবটা কী—তাহলে এসব কথা কখনই বলতাম না।

সে কথা আমি বিশ্বাস করি! ওরা--ঐ বার্টগুড়ো, কেনেথ আর ড্যাগ স্বপ্নেও আন্দাজ করতে পারেনি লোকগুলোর আসল উদ্দেশ্য। তারা পাঁচজন তৎক্ষণাৎ রওনা দিল মোটরবোট নিয়ে। সোজা অল্ডরিজেস্স পন্ডে গেল না কিন্তু। প্রথমেই গেল নিজের-নিজের ডেরায়। বাড়ি ছেড়ে ফের যখন রওনা দিল, তখন ওদের সঙ্গে তিন-তিনটে বন্দুক। ০.৩০৩ লী এনফিল্ড সার্ভিস রাইফেল!

ওরা যখন সাউথ চ্যানেলের কাছাকাছি, তখন ঠিক গোধূলি লগ্ন। পশ্চিম আকাশটা লালে লাল। যেন ঐ পশ্চিমের আকাশ-সমুদ্রে এখনই কোন নীল তিমির গায়ে হারপুন বন্দুকের বোমা একটা প্রচণ্ড লাল রঙের হাহাকারে ফেটে পড়েছে। আলো কিন্তু তখনও বেশ আছে। ঠিক তখনই ওরা চমকে উঠল অদ্ভুত একটা শব্দে! তিমিনীটা ডাকছে! অদ্ভুত শব্দ করে! ত্রিসীমানায় জনমানব নেই। ও কাকে ডাকছে অমন করে? তিমি যে এমন শব্দ করে ডাকতে পারে তাই তো জানা ছিল না। শব্দটা কেমন তা বোঝাতে ওরা

পরে বলেছিল— like a cow bawling into a big empty tin barrel -- যেন বিয়ান গাইয়ের মুখে একটা শূন্যগর্ভ ক্যানেস্তারাটিন বেঁধে দেওয়া হয়েছে, আর সন্তানহারা গাভী তার বৎসকে ডাকছে হ্বা—আ-আ-আ!

আলো থাকতে-থাকতেই যেটুকু করে নেওয়া যায়। ওরা পাঁচজনে লাফ দিয়ে তীরে নামল। ততক্ষণে তিমিনীটা বেশ অস্থির হয়ে পড়েছে। পাগলামো শুরু করেছে যেন। জালে আটকানো প্রকাণ্ড রুইমাছের ঘাই-মারার পদ্ধতিটাকে সহস্র গুণ বর্ধিত করে তোলপাড় করছে শান্ত হ্রদের জল। দারুন দৃশ্য। ওরা কালক্ষেপ করল না। পাঁচজনে তিন দিকে পজিশন নিল। আর তার পরেই শান্ত ঝিমন্ত হ্রদটা সচকিত হয়ে উঠল দ্রুম-দ্রুম-দ্রুম!

একঝাঁক সী-গাল উড়ে গেল বিপদ বুঝে। পাহাড়ের মাথায়-মাথার প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হল—কেউ কর্ণপাত করল না। অস্তসূর্য এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। তলিয়ে গেল সমুদ্রের গভীরে।

একজন পরে বলেছিল, 'টিপ ফসকাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না! কী প্রকাণ্ড তার দেহ। প্রতিটি বুলেট গিয়ে বিঁধছে তার দেহে! আমি যিসাস-এর নামে শপথ করে বলতে পারি —একটা গুলিও ফসকায়নি। তবে আমি টিপ করেছিলাম ওর চোখে। চোখটা প্রমাণসাইজ ডিনার প্লেটের মত বড়! তবু জুৎসই করে মারতে পারছিলাম না।

'গুলি খেয়েই বাঞ্চোৎটা ডুব মারে। আমরা বলি- যা না শালা! যা, জলের তলায় সেঁদো! কিন্তু কতক্ষণ? ভেসে তোকে উঠতেই হবে। ঠিক তাই। নিঃশ্বাস নিতে ওঠামাত্র আমরা একসঙ্গে টিগার টানি। বাঞ্চোৎটা অমনি ঘাই মেরে ডুব দেয়!'

তিমিনীটা—হ্যাঁ গর্ভিণী তিমিনীই, ঠিকই আন্দাজ করেছিল বার্টখুড়ো—সেই অস্তসূর্যউদ্ভাসিত সন্ধ্যায় কত ডজন গুলি হজম করেছিল তার হিসাব আমি জানি না।

পরদিন ছিল রবিবার। সাবাথ-ডে। স্বয়ং ঈশ্বরই সপ্তাহের ছয়দিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারখানার কর্মীরা তো পড়বেই। এদিনটা ছুটির, খেয়াল-খুশির, নির্মল আনন্দের। তিমিনীটার কথা মুখে-মুখে চাউর হয়ে গেছে। তাই সেদিন গ্রাম্য গির্জায় উপস্থিতি কম। দলেদলে সবাই 'সান্ডে বেস্ট'-সাজে চলেছে নৌকা নিয়ে আটক-পড়া তিমি দেখতে। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে আমরা সেসব কিছুই জানি না। সূর্য ওঠার আগেই বিশ-পঁচিশজন বাহাদুর শিকারী হ্রদের বিভিন্ন প্রান্তে পজিশন নিয়েছে। সঙ্গে এনেছে প্রচুর টোটা। গতকাল রাত্রেই স্থানীয় দোকানদারকে জর্জির দল বাধ্য করেছিল দোকান খুলতে—শেষ টোটাটিও বিক্রি হয়ে গেছে তার।

চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলায় নিরুপায় তিমিনীটা হ্রদের মাঝামাঝি এলাকায় সরে এল! ঘাটের দিকে আর আসেই না! দক্ষিণ প্রণালী দিয়ে মুক্ত-সমুদ্রে ফিরে যাবার প্রচেষ্টা আর সে করছে না—জলের গভীরতা অনেক কমে গেছে সেখানে। বোধের নিরিখে সে বুঝে নিয়েছিল—যেমন করেই হোক, অন্তত একমাস তাকে এই অন্ধকূপের বন্দী-আবাসে টিকে থাকতে হবে—নিজেকে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচাতে।

বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে সমুদ্রের গভীরে বেঁচে থাকার এক অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে তিমির দেহযন্ত্রের ব্যবহারে। মানুষ একবুক বাতাস টেনে নিয়ে বেশি গভীরে ডুবতে পারে না। কারণ ঐ বাতাসটাই তাকে ঠেলে উপরদিকে তুলে দেয়। ফুসফুসে বাতাস ভরে ডুবুরিরা জলের ভিতরে যাতায়াত করায় অনেক সময় একটা বিশেষ অসুখে আক্রান্ত হয়, তাকে বলে Caisson disease। হাতে-পায়ে-ঘাড়ে খিল ধরে যায়, মানুষ মারাও যায়। তিমির কিন্তু তা হয় না। যদিও সে মানুষ-ডুবুরির চেয়ে অনেক-অনেক গভীরে যায়, অনেক-অনেক বেশি সময় ডুবে থাকে। তার কারণ ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট জলের তলায় থাকার পর তিমি যখন ভেসে ওঠে, তখন সে প্রশ্বাস নেয় একটা বিশেষ কায়দায়। প্রথমেই এক সেকেন্ডের ভিতর নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দেয়। ঠিক তখনই সে পুরো

নিঃশ্বাস নেয় না—অল্প কিছুটা নেয় এবং দু-তিন মিনিট পরে ভেসে ওঠে দ্বিতীয়বার, আবার দু-তিন মিনিট পর-পর তৃতীয়-চতুর্থবার শ্বাস নেয়। আসলে ঐ ছসাত মিনিটের ভিতর তার ফুসফুসে টেনে-নেওয়া নতুন বাতাসের অক্সিজেন তার রক্তকণিকায় মিশে যায়। কেমন করে এত দ্রুত এ কান্ডটা ঘটে তা বিজ্ঞান আজও ঠিকমত ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেনি। মোটকথা, তারপর যখন সে আবার ডুব মারে তখন কিন্তু তার ফুসফুসটা আদৌ বিস্ফারিত নয়। তার আগেই অক্সিজেনটুকু ছড়িয়ে যায় তার সমস্ত শরীরে! এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য প্রক্রিয়া। তাই মানুষের মত, অথবা স্থলচর অন্যান্য জীবের মত তিমির দেহে অক্সিজেনের ভাঁড়ার ঘর তার ফুসফুস নয় – সারা দেহের লোহিত রক্তকণিকা! জীব-বিবর্তনের পথে সে বুঝে নিয়েছে এই ভাবে ফুসফুসের বাতাসটাকে সারা দেহে ছড়িয়ে না-দিতে পারলে সমুদ্রে বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে পারবে না।

সেদিন, সেই রবিবারের সকালে যারা হত্যা-উৎসবে মেতেছিল তারা এত কথা জানত না; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ঐ বন্দিনীর শ্বাসগ্রহণের ছন্দটা বুঝে ফেলল। বিশপঁচিশ মিনিট পরে সে যখন নিঃশ্বাস ফেলতে ওঠে তখন কেউ গুলি ছোঁড়ে না, তাক্ করে অপেক্ষা করে। কারণ তারা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে— মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঐ হতভাগিনীকে আরও দু'তিনবার মাথা জাগাতে হবে। ঠিক তখনই একসঙ্গে গর্জে ওঠে ওদের বন্দুক-সাবাথডের নির্মল প্রভাতের নৈঃশব্দ খানখান হয়ে যায় পাহাড়ের গায়ে তার প্রতিধ্বনিতে।

সমস্ত অল্ডরিজেস পন্ডটা যেন উৎসব-সাজে সেজেছে। কয়েকশ নর-নারী, বুড়ো, বাচ্চা এসেছে। সারাদিনের মত। আশেপাশের দোকানদার ঠেলাগাড়ি করে খাবার বেচতে শুরু করল। এমন অদ্ভুত নিরাপদ শিকার-দৃশ্য সপরিবারে দেখার দুর্লভ সুযোগ ওরা কখনও পায়নি।

না। সবাই যে আনন্দ পেয়েছিল সে কথা বলতে পারি না। মাডি হোল-এর এক বৃদ্ধ ধীবর অনেকদিন পরে আমাকে বলেছিল, না কর্তা! আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমার নাতনিটা তো কেঁদেই ভাসাল। আমি কুন তাল করতে পাল্লাম না! কেনে? এভাবে অরা অডারে মারে কেনে? মরলে ওডারে করবেডা কী? অর মাংস কেউ খাবে না, অর চামড়ায় জুতো হবে না। তাইলে? *আসলে কী জানেন কর্তা? টাকার গরম! পয়সা অদের কাছে খোলামকুচি!* তাই বেহুদ্দা গুলি করে গেল চোপরদিন!

জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এভাবে চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে সে কি ক্ষেপে গিয়েছিল? আজ্ঞে না। কাউরে কিছু বলেনি—কারও দিকে তেড়েও আসেনি। তামাম দিনভর মার খেয়ে গেছে আর মার খেয়ে গেছে!

ডাকছিল? আর্তনাদ করছিল?

না তো। টু শব্দটি করে নাই। তবে হ্যাঁ-দক্ষিণ খাড়ির বাইরে থিকে, কোভ থিকে অর মরদটা বারে বারে ডাকতিছিল।

ওর মরদ' কেমন করে জানতে পারলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তারই মরদ। সারাদিন সে ঘোরাঘুরি করিছে? আমি হলপ খায়ি কইতে পারি সেটা অরই মরদ—'You can say what you likes, but the one outside knowed t'oher was in trouble, or I am a Dutchman's wife' [আপনি যা-খুশি কইতে পারেন কর্তা, বাইরে সায়রের সেই মদ্দা তিমিটা নিয্যস্ সমঝে নিইছিল যে তার মাগ্ বেকায়দায় পড়িছে! কথাডা যদি ব্যত্যয় হয় তয় আমারে শাঁখা শাড়ি পরাবেন।]

ঘটনার অনেকদিন পরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঠিক সংখ্যাটা কত, তা জানতে পারিনি— অর্থাৎ সেদিন কতগুলি গুলি বিদ্ধ হয়েছিল ঐ বন্দিনী গর্ভবতীর শরীরে। স্থানীয় দোকানদার আমাকে জানায়নি, শনিবার সে কত ডজন অথবা কত গ্রোস টোটা বিক্রি করে। যারা গুলি ছুঁড়েছিল তারা ছিল আমার শত্রুপক্ষে—কেমন করে তারা

আমার বিরুদ্ধ পক্ষে চলে যায়, তা এখনই বলব—মোটকথা, তাদের কাছ থেকেও খবরটা জানতে পারিনি। তবে আমি আর ক্লেয়ার পরে ঐ অল্ডরিজেস পন্ডের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে ৪০৩টি খালি টোটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ০.৩০৩ বোর বন্দুকের। যদি ধরে নিই তার আধাআধি গুলি ঐ হতভাগিনীর শরীরে বিদ্ধ হয়েছিল তাহলে বুঝতে হবে সেদিন অন্তত দুশ গুলির আঘাত সে নীরবে সহ্য করে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নীরবে। আর্তনাদ করেছিলো — প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, সেই বাহির-সাগরের মদ্দা তিমিটা। তিমিনী টু শব্দটি করেনি।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে বসে আমরা এত বড় সংবাদটা আদৌ জানতে পারিনি। আমরা সেদিন পিকনিক করছিলাম—নির্জন এক পাহাড়ের চূড়োয়, আমি আর ক্লেয়ার।

সোমবারের সারাটা দিন ছিল ঝোড়ো হাওয়ার চাদরমুড়ি দেওয়া। অশান্ত সমুদ্রের দিক থেকে ধেয়ে এল একটানা একটা গুমরানি আর বৃষ্টির ছাট। ঢেউ-এর পর ঢেউ অশান্তভাবে আছাড়ি পিছাড়ি আর্তনাদ করল বার্জিয়োর সমুদ্র সৈকতে। কীসের এ প্রতিবাদ? সমুদ্র কী বলতে চায়? আমরা এ প্রান্তে বসে তা বুঝতে পারিনি।

মঙ্গলবার আবহাওয়া একটু সাফ হতেই আবার কয়েকজন অতি-উৎসাহীর টনক নড়ল। তিমিটার খবর নিতে হয়। এতক্ষণেও কি তার মৃতদেহ ভেসে ওঠেনি? না কি দুশ বুলেট হজম করে ব্যাটা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ব্যাপারটা দেখতে হয়। কিন্তু গুলি নেই যে! বার্জিয়োর ছোট্ট দোকানির যাবতীয় বাক্সবন্দী কার্তুজ ততক্ষণে তিমির শরীরে স্থানান্তরিত হয়েছে। কী করা যায়?

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বিশেষত সৎ কাজে। বুদ্ধি বাতলাল দলপতি জর্জি। বার্জিয়ো দ্বীপের একান্তে আছে ছোট্ট একটি প্লেটুন। কানাডা সরকারের তরফে তারা নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতিভূ। বেশ কিছু রাইফেল আর কার্তুজ সেখানকার মালখানায় জমা আছে। ঘটনাচক্রে ঐ প্লেটুনের কিছু নওজোয়ান রবিবারের হত্যা-উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের নিয়ে জর্জি উপস্থিত হল বড়কর্তার কাছে। উপরোধে পড়ে বড়কর্তা শেষমেশ ঢেঁকি গিললেন, বেশ কিছু কার্তুজ ইস্যু করলেন—ঠিক কত তা জানা যায়নি!

মোটকথা সেগুলি নিয়ে জর্জির দল মঙ্গলবার আবার সমবেত হল অন্ডরিজেস পন্ডে। না, তিমিটা মরেনি। কড়া জান! সহ্য করবার ক্ষমতা আছে বলতে হবে। ওরা প্রাণ খুলে গালমন্দ করল। বিয়ার খেল এবং গুলি চালাল—সকাল থেকে সন্ধ্যা। দেখা যাক! কত সইতে পারিস তুই?

মঙ্গল এবং বুধ! পুরো দুটি দিন। রবিবারের সঙ্গে তফাৎ এই যে, এবারে আর্মি-কার্তুজের আঘাত হচ্ছিল অনেক বেশি অন্তর্ভেদী। ইতিপূর্বে ব্লাবার অতিক্রম করে দেহযন্ত্রে মারাত্মক আঘাত হয়নি, এখন হচ্ছিল! তবু, যতদূর জেনেছি—গর্ভিণী সেই তিমিনী একবারও আর্তনাদ করেনি—সেই প্রথম দিনের বিয়ান গাইয়ের মত।

বৃহস্পতিবার বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ভিন্নধর্মী কয়েকজনের। আনপড় গাঁওয়ার মৎস্যজীবীদের একটি দল। তারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুটিগুটি এসে হাজির হল আমার ডেরায়। বিপদে-আপদে ওরা প্রায়ই আসে পরামর্শ নিতে, উপর-মহলে আর্জি পাঠাবার প্রয়োজন হলে দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে। অথচ আশ্চর্য! এবার পুরো পাঁচ-পাঁচটা দিন ওরা আমার কাছে আসেনি। হাজার হোক, আমি বাইরের লোক। আসলে ওরা বার্জিয়ো দ্বীপের এই কেলেঙ্কারির কথাটা জানাতে সঙ্কোচ বোধ করছিল। এ অনুমান যে সত্য তা বুঝতে পারি ওদের আচরণে। বৃহস্পতিবার ওরা পাঁচসাতজন দল-বেঁধে এল বটে কিন্তু মুখ খুলতে পারল না কেউ। খোশগল্প যতক্ষণ চলল এ-ওর মুখ তাকাতাকি করছিল, যেন বলি-বলি করেও কী-একটা কথা বলতে পারছে না।

রাত বাড়ছে! ওরা উঠল। আমি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছি। হঠাৎ একজন বললে, ভাল কথা কর্তা, তিমিটার কথা নিশ্চয় শুনেছেন। সেটা এখনও বেঁচে আছে। আমি বললুম, কোন্ তিমি? এ বছর যে-ঝাঁকটা এসেছে?

আজ্ঞে না। আমি ঐ অল্ডরিজেস পন্ডের তিমিনীটার কথা বলছি।

অল্ডরিজেস পন্ডে! তিমি! কী তিমি? বাচ্চা?

আজ্ঞে না। পেল্লায় তিমি। কী জাতের জানি না....কালো মত....ইয়া বড়....আচ্ছা! পরে কথা হবে—

প্রায় তোতলামি করতে-করতে লোকটা যেন পালিয়ে বাঁচে।

ক্লেয়ারের দিকে ফিরে বলি, কী ব্যাপার বল তো? পেল্লায় তিমি! অল্ডরিজেস পন্ডে। ক্লেয়ার বলে, তুমিও যেমন! ওরা তিলকে তাল করছে। ডলফিন হবে বোধহয়! ঐ সরু খাঁড়ি দিয়ে কখনও বড় জাতের কোন তিমি ঢুকতে পারে পন্ডে?

তাই হবে। কিন্তু লোকগুলো অমন করছিল কেন? ওরা এলই বা কেন অমন দল বেঁধে? তিমির কথা বলতে? তাহলে প্রশ্ন করা মাত্র পালিয়ে গেল কেন? ঐ সঙ্গে মনে পড়ল আজ তিন-চারদিন বার্টখুড়োও আসেনি রেডিও শুনতে। ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে। আমি তখনই বের হলাম পথে। কাছেই হান-ভাইদের ছাপরা। তারা দু'ভাই সাত-সকালে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। কেনেথের বউ ঢোক গিলল তিমির প্রসঙ্গে। মনে হল সে কিছু চেপে যেতে চাইছে। রাত হয়েছে, তবু হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেলাম আরও কয়েক কদম। বার্টখুড়ো বাড়িতেই ছিল, মদে চুর হয়ে তার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। তাই বেচারি ক'দিন রেডিও শুনতে আসছে না। জিজ্ঞাসা করি, এ কী খুড়ো মাথা ফাটালে কী করে?

বুনো শুয়োর।

বুনো শুয়োর! এ তল্লাটে বুনো শুয়োর কোথায় হে?

ধমকে উঠল বার্টখুড়ো কানা না কি হে তুমি? চাদ্দিকে শুয়োরেরপাল! দেখতে পাও না— বলেই আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল বৃদ্ধ মাতালটা।

খুড়িও কোন আলোকপাত করতে পারল না। শুধু বললে, পরশু বার্টখুড়ো নাকি কী-একটা খবর পেয়ে ঐ অল্ডরিজেস পন্ডের দিকে যায়। মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে ফিরে এসেছে। কৌতূহল ঘনীভূত হয়। কী একটা খবর পেয়ে? ..... . সেই অল্ডরিজেস পন্ড!

ফেরার পথে দেখি, ওনী স্টিকল্যান্ডের দোকানটা খোলা আছে। স্টিকল্যান্ড আমাদের পাড়ার মুদি কাম কফিওলা। টেমি জ্বেলে ক্যাশ মেলাচ্ছে। আমার প্রশ্নে যেন বাধ্য হয়েই স্বীকার করল তিমিটার কথা। হ্যাঁ, শুক্রবার থেকে সেটা আটক পড়ে আছে ঐ অল্ডরিজেস পন্ডে। তিমি নয়, তিমিনী। তার পেটে বাচ্চা আছে। জাত? আজ্ঞে বার্টখুড়া তো বললে— ডানা তিমি।

স্তম্ভিত হয়ে যাই। বার্টখুড়ো তো ভুল করবার মানুষ নয়। গর্ভিণী ডানা তিমি হলে সেটা না-হোক পঞ্চাশ ফুট লম্বা। ঢুকল কেমন করে? সে কথাও ওনী সবিস্তারে জানাল —মানে বার্টখুড়োর থিওরিটা।

উত্তেজনায় ওর হাতটা চেপে ধরে বলি কী আশ্চর্য! আমাকে এতদিন বলনি কেন?

কী বলব কর্তা! লজ্জায় বলতে পারিনি। ছোঁড়াগুলো যে-কেলেঙ্কারিটা করল...

কেলেঙ্কারি! কীসের কেলেঙ্কারি?

যত্তসব পাগলামি! ওরা গুলি করছিল তিমিটাকে-

কথাটাকে আমি আদৌ কোন গুরুত্ব দিইনি। কোন হস্তিমূর্খ যদি ০.২২ বোরের স্পোর্টসগান দিয়ে দু-দশটা গুলি করেও থাকে তাতে একটা ডানা তিমি ভ্রূক্ষেপও করবে না। যা হোক, কাল সকালেই খবরটা নিতে হবে।

পরদিন ভোর না-হতেই ড্যানী গ্রীণকে টেলিফোন করলাম। গ্রীণ থাকে পূর্ব

উপকূলে; রয়্যাল ক্যানাডিয়ান মাউন্টেন্ড পুলিসের একটি নিজস্ব মোটরলঞ্চ আছে, তারই ক্যাপ্টেন। আমার প্রশ্নে বললে, তুমি ঠিকই শুনেছ ফার্লে, বড় জাতের তিমিই। ডানা তিমি কিনা? ... তা জানি না.... আমি দেখিনি। হাম্পব্যাকও হতে পারে, তবে পেল্লায় মাপের। সেটা এখনও বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। আজ তিন-চার দিনে শ'দু-তিন গুলি খেয়েছে বেচারি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম বিস্তারিত শুনে। আর্তনাদ করে উঠি, কী বলছ গ্রীণ! তোমরা বাধা দাওনী? অল্ডরিজেস পন্ডে যদি ঐভাবে একটা জ্যান্ত তিমি আটকে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা তো একটা ওয়ার্ল্ড নিউজ। বার্জিয়োর নাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়া, জাপান থেকে জীববিজ্ঞানীরা ছুটে আসবেন! আর তোমরা ওটাকে গুলি করছ! তোমার কনস্টেবলটা কী করছে?

গ্রীণ জানালো কনস্টেবলটা ছুটিতে গেছে, তার বদলে অবশ্য নতুন একজন এসেছে; কনস্টেবল মাউক। সে বেচারি আনকোরা নতুন, ঝামেলা এড়াতে চেয়েছিল। আমার অনুরোধে গ্রীণ জানাল, মার্ডককে সে এখনই ব্যবস্থা করতে বলবে। আর যাতে কেউ গুলি না-ছোঁড়ে।

একটু পরে মার্ডক নিজেই টেলিফোন করল। জানাল সে, দুঃখিত। যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, তবে এখন থেকে সে দেখবে কেউ যাতে তিমিটাকে বিরক্ত না করে।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দু'জন রওনা দিলাম একটা ডোরি নিয়ে। আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু ক্লেয়ার তার মনের ভারসাম্য হারায়নি। তার প্রমাণ ওর ডায়েরির পাতা:

"রীতিমত ঝড় বইছিল। ঘণ্টায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল বেগে। তাই প্রথমটায় ওকে বলেছিলাম, তুমি একাই যাও। ও বললে, এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েও যদি অবহেলা করি তাহলে সারাজীবন আপসোস করতে হবে। অগত্যা আমাকেও যেতে হল। যদিও মনে-মনে ভাবছিলাম—লাখ টাকা লাখ টাকার যোগফল দাঁড়াবে দু'কুড়ি দশ টাকা- অর্থাৎ দেখতে পাব বিশ-পঁচিশ ফুট লম্বা একটা ডলফিন। -

"দক্ষিণ প্রণালী দিয়ে হ্রদে প্রবেশ করে মনে হল—সকালের রোদে পাহাড়তলীটা যেন ঝিমোচ্ছে। ত্রিসীমানায় মানুষজন তো দূরের কথা, প্রাণের কোনও সাড়া নেই। না, আছে— নীল আকাশের নিঃসীমায় চক্রাকারে পাক খাচ্ছে একঝাঁক সী-গাল। আমার মনে হল, যদি কোন তিমি এ হ্রদে আদৌ এসে থাকে তবে সে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেছে অনেক আগেই।

"হঠাৎ চমকে উঠে দেখি কালো-মত কী একটা ভেসে উঠল আমাদের নৌকার সামনেই। কী ওটা? হ্যাঁ, তিমিই—প্রকাণ্ড তিমি—কত বড়? পঞ্চাশ, না ষাট ফুটও হতে পারে' বার তিনেক নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ডুব দিল। আমরা স্তম্ভিত!

"তারপর শুরু হল প্রতীক্ষা। ঘণ্টাগুলো মিনিটের গতিতে অতিক্রান্ত হতে শুরু করল। সকালের সূর্য উঠে এল মাথার উপর। ইতিমধ্যে গ্রীণ আর মার্ডকও এসে উপস্থিত হয়েছে। দুটি নৌকাই আমরা হ্রদের মাঝামাঝি নোঙর করে নিশ্চুপ অপেক্ষা করছি। ক্রমে ক্রমে তিমিটার যেন সাহস বাড়ল, যেন বুঝে নিল আমরা ওকে গুলি করতে আসিনি, আমরা ওর বন্ধু। তিল তিল করে ও কাছে, আরও কাছে এসে ভেসে উঠছে। যেন আড়চোখে দেখছে আমরা কী করি! শেষ পর্যন্ত ও সাহস করে একেবারে কাছে এল, আমাদের নৌকাদুটির ঠিক তলায়, পাঁচ-সাত ফুট গভীরে। এখন ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমনকি ওর দেহে অসংখ্য গুলির চিহ্নও! কী আশ্চর্য! এমন নিরীহ সুন্দর জীবটিকে ওরা হত্যা করতে চেয়েছিল কেন?

"ড্যানী গ্রীণ পরে আমাকে বলেছিল ইচ্ছে করলে তিমিটা আমাদের নৌকাজোড়াকে

গুঁড়িয়ে শেষ করে ফেলতে পারত লেজের এক ঝাপটায়—ঠিক যেভাবে আমরা অনায়াসে
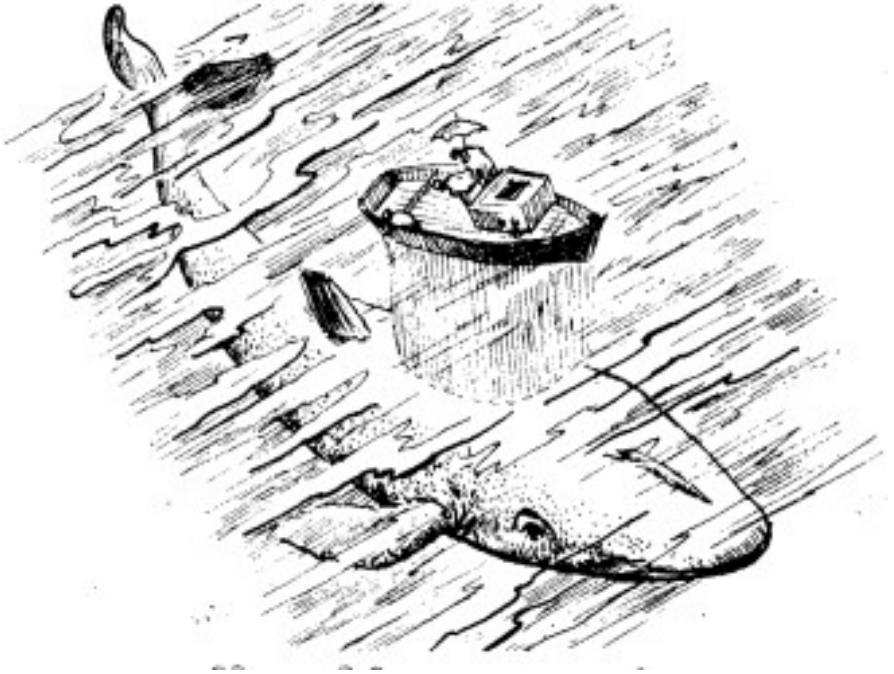
এমন নিরীহ সুন্দর জীবটিকে ওরা হত্যা করতে চেয়েছিল কেন?

একজোড়া মুরগির ডিম ভেঙে ফেলতে পারি। কিন্তু তা সে করেনি। কেন? চার-পাঁচদিন ধরে ওর উপর মানুষে যে-অত্যাচার করেছে সেজন্য কোন প্রতিশোধস্পৃহা জাগল না কেন? ওর মনে? কোথায় পেল ও এমন তিতিক্ষা? তাহলে কি মেনে নেব শুধু দৈহিক বিশালতাতেই নয়, সহনশীলতায়, তিতিক্ষায়, হৃদয়ের প্রসারতাতেও সে মানুষকে ছড়িয়ে গেছে?"

ক্লেয়ারের ঐ দার্শনিক মন্তব্য, বাড়ি ফিরে ভেবে-চিন্তে লেখা। তখন ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের ওসব মনে হয়নি, কিন্তু আমার অন্তত মনে হচ্ছিল তিমিনীটা যেন কী একটা কথা বলতে চায়। সে নিঃসঙ্গ, সে বন্দিনী, সে আমাদের সাহায্য চাইছে। ইতিমধ্যে হান ভাই দু'জনও ডোরি নিয়ে এসেছে। মাছ ধরছে না, তিমিটাকে দেখছে। জলজন্তুটা ঐ তিনটি নৌকার তলা দিয়ে বারে বারে চলে যাচ্ছে সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে। মাঝে-মাঝে জল থেকে মুখটা তুলছে স্পষ্টতই আমাদের দেখতে।

মার্ডক হঠাৎ বললে, "আমি সত্যিই দুঃখিত মিস্টার মোয়াট। কথা দিচ্ছি, আর কেউ ওকে গুলি করবে না। দরকার হলে দিবারাত্র আমি এখানে ক্যাম্প করে পাহারা দেব।

Murdoch's words brought me my first definite awareness of a decision which I must already have arrived at below-or perhaps above —the limited levels of conscious thought. As we headed to Messers, I knew I was committed to the saving of that whale, as passionately as I had ever been committed to anything in my life. I still do not know

why I felt such an instantaneous compulsion. Later it was possible to think of a dozen reasons, but these were after-thoughts-not reasons at the time. If I were a mystic, I might explain it by saying I had heard a call, and that may not be such a mad explanation after all. In the light of what ensued, it is not easy to dismiss the possibility that, in some incomprehensible way, alien flesh had reached out to alien flesh, cried out for help in a wordless and primordial appeal which could not be refused."

[মার্ডকের কথায় সিদ্ধান্তটা সম্বন্ধে আমি সচেতন হলাম –এ সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়ে বসে আছি অন্তরের অবচেতনের ও পারে, অথবা কে জানে হয়তো এ পারেই। আমরা যখন বাড়ির দিকে ফিরে আসছি ততক্ষণে আমি বুঝে নিয়েছি—ঐ তিমিটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাতে বর্তেছে–হয়তো সারা জীবনে এমনভাবে কোন দায়িত্বে নিজেকে জড়াইনি। আমি আজও জানি না, কেন অমন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তটাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে ফেললাম। পরে হয়তো অনেকগুলো হেতু খুঁজে বার করতে পারতাম। কিন্তু সেগুলো হত উত্তর-চিন্তার ফসল—তদ্দণ্ডের মানসিকতার প্রতিফলন নয়। যদি অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী হতাম, তাহলে হয়তো বলতাম—আমি একটা আর্ত আহ্বান শুনেছিলাম; হয়তো সে কথাটা নিছক পাগলামিও নয়। পরে যা ঘটল, তাতে সে সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না—হ্যাঁ, একটা আদিম আর্তনাদে আমার অন্তরাত্মা বিচলিত বোধ করেছিল! বিজাতীয় একটা জীবাত্মা আর একটা বিজাতীয় প্রাণবন্তের কাছে আদিম অন্ধ বাণীহীন আর্তনিনাদে অন্তিম আকৃতি জানাচ্ছে—যে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব।]

বাড়ি ফেরার পথে আমি ডুবেছিলাম অন্তর্লীন চিন্তায়। দায়িত্ব আমি নিয়েছি, মনে মনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ঐ হতভাগিনীকে। কোন কিছুতেই আমি আমার প্রতিজ্ঞা থেকে বিচলিত হব না। কিন্তু কেমন করে বাঁচাব ওকে! আশা এবং আশঙ্কায় আমার মনটা দুলছিল-আমাদের ডোরিটার মতই। একটা কথা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হবে আমি একা ওকে বাঁচাতে পারব না। আমাদের দলে ভারি হতে হবে, আরও সহকারী চাই, আরও সাহায্যকারী। আমাদের একাধিক বন্ধুর প্রয়োজন—আমার এবং ঐ বন্দিনী হতভাগিনীর।

বাড়ি ফিরে এসেই মাছের কারখানার ম্যানেজারকে ফোন করলাম। যাবতীয় মজদুরের সে 'বস', সাহেব, ফলে তাকে প্রথমেই দলে টানতে হবে। আমি তাকে বোঝাতে চাইলাম অনেক করে, কিন্তু পারলাম না। লোকটা আমাকে যেন পাত্তাই দিতে চায় না—একটা তিমি মরল কি বাঁচল তাতে কার কী? যা হোক, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে সে রাজি হল—একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিতে, কেউ যেন ঐ জলজন্তুটাকে বিরক্ত না-করে।

ওর ঐ নিরুত্তাপ উদাসীনতায় আমার কিন্তু অন্য ধরনের উপকার হল। আমি বুঝতে পারলাম, যে-যুক্তির প্রেরণায় আমি অভিভূত হয়েছি সেটা ওদের মগজে ঢুকবে না। ওদের বোধগম্য ভাষায়, ওদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লাভজনক কোন যুক্তি আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। সহজেই সেটা খাড়া করা গেল।

এ একটা দুর্লভ সুযোগ। ডানা তিমিকে এত কাছে থেকে মানুষ কখনও দেখবার সুযোগ পায়নি। এ খবরটায় বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন জাগবে—হাজার-হাজার মানুষ ছুটে আসবে তিমিটাকে দেখতে, ট্যুরিস্ট বাড়বে, বিজ্ঞানীরা আসবেন। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন - বার্জিয়োর নাম বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে।

এর পরে বহু চেষ্টায় ট্রাঙ্ক-লাইন টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম সেন্ট জন-এর ফেডারেল ফিশারিস অফিসের বড় কর্তার সরকারী ভাফিসে। সেই সরকারী অফিসের

সিনিয়র বায়োলজিস্ট সবটা শুনে বললেন, "মিস্টার নোয়াট, আপনি গোড়ায় গলদ করেছেন। অবশ্য আপনার দোষ নেই, অনেকেই এ ভুল করে থাকে। এটা মৎস্য বিভাগের সরকারী দপ্তর—মাছ নিয়ে আমরা গবেষণা করি। ডানা তিমি মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জন্তু। আয়াম সরি।"

—বলেই লাইনটা কেটে দিলেন তিনি। সরকারী দপ্তরের পাশ করা সিনিয়র বায়োলজিস্ট! মনে-মনে ঐ জীববিজ্ঞানীর মুণ্ডপাত করে আমি তাঁর বড়কর্তাকে ধরবার চেষ্টা করলাম। মন্ত্রিয়লের হেড অফিসের বড়সাহেবকে। অর্থাৎ তা-বড় জীববিজ্ঞানীকে। ঘণ্টাতিনেক ধস্তাধস্তি করার পর টেলিফোনে তাঁকে পাওয়া গেল। এ ভদ্রলোক অতটা কাঠগোঁয়ার নন, মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন, কিন্তু তাতে কাজ হল না কিছু। পরিশেষে তিনি জানালেন, হেড অফিসে একজন তিমি-বিশারদ আছেন বটে, কিন্তু তিনি বর্তমানে আমেরিকার কয়েকটি যাদুঘরে মৃত তিমির কঙ্কাল নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। অন্তিমে তিনি জানালেন—সেই তিমিবিশারদকে অবিলম্বে বার্জিওতে আসার আদেশ তিনি দিতে পারবেন না। তাঁর গবেষণার কাজটা নাকি জরুরি। জ্যান্ত তিমি নয়, তিনি মৃত তিমি নিয়ে ব্যস্ত।

আমার অবস্থাও ক্রমে ঐ তিমিটার মত হয়ে পড়ছে। জোয়ারের জল সরে যাওয়ায় যেন সংকীর্ণ পরিবেশে বন্দী হয়ে পড়ছি। কী অপরিসীম আশ্চর্য! এত বড় দুর্লভ সুযোগ বিজ্ঞান নেবে না? জীববিজ্ঞানীরা মুখ ফিরিয়ে থাকবে? কিন্তু আমি কে? আমি কতটুকু? কেমন করে বিজ্ঞানকে কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে সচেতন করে তুলতে পারি?

অবশেষে মনে পড়ল মসজিদের কথা! সাহিত্যিক মোল্লার ঐ মসজিদ পর্যন্তই তো দৌড়। তাই এর পর ট্রাঙ্ক-টেলিফোন করলাম টোরেন্টোতে পি. পি. কল টু মিস্টার জ্যাল ম্যাকক্লিল্যান্ড, আমার গ্রন্থের পাবলিশার। জ্যাক বুঝল। ধুরন্ধর ব্যবসায়ী সে। মধ্যরাত্রে বিছানা থেকে টেনে তোলায় মোটেই রাগ করল না। বললে, ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। এ হতে পারে না। যতক্ষণ না কোন প্রথম শ্রেণীর জীববিজ্ঞানীকে তোমার ওখানে পাঠাতে পারছি, ততক্ষণ আমি থামব না। পরে শুনেছিলাম—জ্যাক সে রাত্রে কম-সে-কম সাত-আটজন প্রথম শ্রেণীর জীববিজ্ঞানীর অভিশাপ কুড়িয়েছিল, মাঝরাতে টেনে তোলায়। তাঁদের মধ্যে একজন, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার জনৈক তিমি-বিশারদ, জ্যাককে একটি ছোটখাটো বক্তৃতাও শুনিয়েছিলেন ট্রাঙ্ক টেলিফোনে:

ডানা তিমি হেরিং-মাছ আদৌ খায় না। ওরা প্ল্যাংটন খায় মের অঞ্চলে। সুতরাং বন্দী-অবস্থায় ওটাকে খাওয়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ ডানা তিমি তার ব্লাবারে সঞ্চিত খাদ্যে আগামী ছয় মাস অনায়াসে টিকে থাকতে পারবে। প্রশ্ন সেটা নয়, আসল কথা— ডানা তিমি আহত অবস্থায় শুধু মরতেই উপকূলভাগে আসে। বার্জিয়োর তিমিটা, যদি আদৌ ডানা তিমি হয়, তবে তার মৃত্যু আসন্ন। সুতরাং এ নিয়ে হৈ-চৈ করার কিছু নেই।"

ব্যস্! এক কথায় খতম!

জ্যাক উপসংহারে শনিবার সকালে আমাকে বলেছিল, "লুক হিয়ার ফার্লে। হতাশ হয়ো না! সত্যিই যদি একটা আশি টন ওজনের ডানা তিমি তোমার আস্তিনের তলায় লুকিয়ে থাকে, আছে বলেই আমি বিশ্বাস করেছি, আর কেউ এখনও করেনি—তাহলে সেটাকে জীবন্ত রেখো। এ হতে পারে না! কেউ না-কেউ ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝবেই। আমি সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ছাড়ব—*unitil I find some way to get these silly bastards off their asses!*"

সারা রাত জেগে জ্যাকের মনের যা অবস্থা তাতে খিস্তি ছাড়া আর কী প্রত্যাশা করতে পারি? আমার হাতের কাছেই আছেন একজন আনপড় গাঁওয়ার তিমি-বিজ্ঞানী। তাঁরই দ্বারস্থ হওয়া গেল! বার্টখুড়ো সবটা শুনে বললে, সবগুলোই ভুল কথা! ডানা তিমি

হেরিং মাছ খেয়ে থাকে, ছয় মাস উপোস করে না নীল তিমির মত। ওরা ডাঙার দিকে মরতেই শুধু আসে না—এমনিতেও আসে। তোমার তিন-তিনটে কাজ রয়েছে ভালো-মানষের পো! এক নম্বর: ঐ দাঁতাল বুনো-শুয়োরগুলোকে ঠেকানো, দুনম্বর নাতবৌকে খাওয়ানো। হেরিং মাছ! খুড়ো থামল তার পাইপটা ধরাতে।

আমি বলি, আর তিন নম্বর?

সেটা পরে বলব। এখন নয়! আগে জরুরি কাজদুটো সারি। দুপুরের দিকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে ধরতে পারলাম সর্বময় বড় কর্তাকে গোটা নিউফাউন্ডল্যান্ডের মৎস্য মন্ত্রকের মন্ত্রীমহোদয়কে। ভাগ্যে আমি সাংবাদিক, মন্ত্রীমহোদয় আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! শেষ পর্যন্ত তিনি জানালেন— নিউফাউন্ডল্যান্ড সরকারের মৎস্য মন্ত্রকের অনেক অনেক জরুরি কাজ আছে। কোথায় একটা তিমি আটক পড়েছে, এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় তাঁর নেই। সাফ কথা!

ক্লেয়ার সেদিন দিনপঞ্জিকায় লিখে নিল, পরে দেখেছি: "ওকে পাগলের মত লাগছিল।" তা হতে পারে। হয়তো পাগলামিতেই পেয়ে বসেছিল আমাকে! হয়তো এটা একটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা... একটা তিমির মৃত্যু! তাতে আমার নাক গলানোর অধিকারই হয়তো নেই! কিন্তু বাধা যতই প্রচণ্ড হয়ে উঠছে, আমার অস্থিরতাও যেন সেই মাত্রায় বাড়ছে। আমি যে মনে-মনে ঐ বন্দিনীকে কথা দিয়েছি, শেষ চেষ্টা আমি করবই।

শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে ডেকে বলি, ক্লেয়ার, আমি সামান্য মানুষ, কিন্তু একটা অস্ত্র আমার হাতে আছে। এবার সেটাই প্রয়োগ করব আমি। ফলাফল ভয়াবহ হবে। তোমার এবং আমার! বল, শেষ চেষ্টাটা করে দেখব?

ক্লেয়ার অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

- আমি সাংবাদিক। তুমি যদি রাজি হও, আমি সমস্ত ঘটনাটা 'প্রেসকে' জানাব। আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা। ঐ ওদের গুলি করা থেকে মৎস্য মন্ত্রকের উদাসীনতা- সব কিছু। সাংবাদিক জগতে আমার এটুকু সুনাম আছে যে গোটা পৃথিবীতে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। বলো, ছুঁড়ে দেখব সেই একাঘ্নী বজ্রটা?

ক্লেয়ার নয়ন নত করল। আমি জানি, বার্জিয়োকে ও ভালবাসে। আমি যা করতে চাইছি তাতে এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। সব কথা অকপটে দুনিয়াকে জানালে বার্জিয়োতে আর আমাদের ঠাই হবে না।

ক্লেয়ার যেন মনে-মনে গুছিয়ে নিল জবাবটা! তারপর বললে, যদি এ ছাড়া উপায় না থাকে--ও। ফার্লে। বিশ্বাস কর আমি চাই—তিমিনীটা বেঁচে থাক, আফটার অল সে গর্ভিণী। আমিও তো মায়ের জাত! কিন্তু ... কিন্তু.... বুঝতেই তো পারছ! আবার আমাদের এ বাড়িঘর বেচে দিয়ে......

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছুটে গিয়ে তুলে নিলাম। অপারেটার বললে, একটা টেলিগ্রাম আছে! ফোনোগ্রাম। পড়ছি শুনুন

HAVE CONTACTED SEVERAL EMINENT BIOLOGISTS, NEW ENGLAND. THEY VERY EXCITED ABOUT YOUR WHALE. SUGGEST YOU BEGIN SYSTEMATIC OBSERVATION IMMEDIATELY PENDING THEIR ARRIVAL. GOOD LUCK, DR. DAVID SURGENT

[নিউ ইংল্যান্ডের একাধিক জীববিজ্ঞানীকে আপনার তিমির কথা জানিয়েছি। সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত। এখনই ধারাবাহিকভাবে নোট রাখতে শুরু করুন। যতক্ষণ-না বিজ্ঞানীরা পৌঁছচ্ছেন। শুভেচ্ছাসহ, ডক্টর ডেভিড সার্জেন্ট]

আশার আলো এই প্রথম দেখলাম। ডক্টর সার্জেন্ট একজন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী — নাম জানা ছিল। সম্ভবত জ্যাকের কাছেই তিনি সংবাদটা পেয়েছেন।

মনে হল, হয়তো এবার একটা সুরাহা হবে!

পরদিন রাত থাকতে কে যেন এসে টোকা দিচ্ছে আমার দরজায়। তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। দরজা খুলে দেখি ড্যাগ হান।

কী ব্যাপার? তুমি এই সাত-সকালে?

ড্যাগ স্বল্পভাষী, লাজুক প্রকৃতির। আমার বিস্ময় দেখে ওর খেয়াল হল এত ভোরে কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে হানা দেওয়া সৌজন্যে বারণ। হাত দুটি কচলে সসঙ্কোচে বললে, না, মানে... ইয়ে আজ রোববার তো—

রবিবার, তাই কী?

না মানে... ওরা আজ দল-বেঁধে আবার হয়তো অল্ডরিজেস পন্ডে...

তাই তো। কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। বন্দিনীর জীবনে আবার একটি সাবাথ-ডে ফিরে এসেছে। ড্যাগ হান তাই আজ মাছ ধরতে যায়নি, ডোরি নিয়ে এসে এই কাকডাকা ভোরে হানা দিয়েছে আমার বাড়ি। ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি তৈরি হতে ভিতরে চলে আসি। ক্লেয়ার জানতে চাইল, কে এসেছে এত সকালে?

ড্যাগ। তিমিটার জন্য তার যে এত মাথাব্যথা তা তো জানতাম না—

ক্লেয়ার তখনও কম্বলের তলায়। সেখান থেকেই বললে, জানতে না? আমি কিন্তু জানতাম। তোমার আমার মত ড্যাগেরও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ঐ হতভাগী।

একটু অবাক হতে হল। বলি, তাই নাকি? তুমি কেমন করে জানলে?

তিমিনীটা যে মা হতে যাচ্ছে!

আমি হো-হো করে হেসে উঠি। মেয়েমানুষের মন! এর মধ্যেই একটা রোমান্টিক প্রেমের গল্পের ইঙ্গিত পেয়েছে। যেহেতু ড্যাগ হানের সেই নাম না-জানা প্রণয়িনী... কোন মানে হয়! এটা একটা তিমিনী। মানুষী নয়!

অল্ডরিজেস পন্ডে এসে যখন পৌঁছলাম তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। তবু সেই সাত-সকালেই দেখছি জনা দশ-বার দর্শনার্থী সমবেত হয়েছে। ভাগ্য ভালো। ওদের কারও হাতে বন্দুক নেই। আমরা দু'জন এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। কয়েকজন আমার পরিচিত, দু'চারজন মুখচেনা। তারা কিন্তু কেউই 'সুপ্রভাত' জানাল না আমাকে। এটা একটু নতুন ধরনের। কিন্তু গরস্ত্র বড় বালাই— আমিই গায়ে পড়ে আলাপ করলাম ওদের সঙ্গে। প্রচারের যুগ— ক্যানভাসিং ছাড়া ভোট পাওয়া যায় না—ফলে, আমি ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই শুরু করে দিলাম। বার্জিয়োর কত বড় সৌভাগ্য, এত বড় একটা জীবকে অতিথি হিসাবে পেয়েছে। আর কোন দেশ কোন জন্মে জ্যান্ত তিমিকে আতিথ্য দান করেনি— দু'চার দিনে এখানে জীববিজ্ঞানীরা দলে-দলে এসে পড়বেন— প্রেস, ক্যামেরা, মুভি, টিভি!— লোকগুলো তবু নির্বিকার। শেষে গতকাল রাত্রে পাওয়া ফোনোগ্রামটার কথাও বলি। রঙ চড়িয়ে বলতে থাকি— দলে-দলে বিদেশী আসা মানেই বার্জিয়োর আর্থিক লাভ। ট্যুরিস্ট এ যুগের মা লক্ষ্মী।

একজন বুড়ো জেলে এতক্ষণে বললে, পন্ডে আর একটাও হেরিং নেই। সব খেয়ে সাবাড় করেছে।

তা বটে! ওরা মৎস্যজীবী। ঐ প্রকাণ্ড তিমিনীটা ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঠিক তখনই হৈ হৈ করতে-করতে এসে গেল চার-পাঁচটা স্পিডবোট। জর্জির দল। সঙ্গে বন্দুক নেই, আছে ট্রানজিস্টার আর বিয়ারের বোতল। ওরা এগিয়ে এল সদলবলে। আমাকে যেন দেখতেই পেল না। কিন্তু দলটা এসে দাঁড়াল আমাদের শ্রুতিগোচর দূরত্বে। এক ছোকরা বললে, কী বলিস জর্জি? পুলিস লেলিয়ে না দিলে এ্যাদ্দিনে বাঞ্চোৎটাকে সাবাড় করে ফেলা যেত, তাই না?

জর্জি বিয়ারের বোতল খোলার ব্যস্ত ছিল। জবাব দিল না। ওপাশ থেকে আর

একটা ঢ্যাঙা মত ছোকরা—সে বোধহয় এখনও দাড়ি কামায় না— বললে, কোত্থেকে এসব উটকো ঝামেলা আসে বল তো মাইরি? তিমিপ্রেমিক! জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। শাল্লাহ্!

জর্জি আমাকে দেখিয়ে মাটিতে থুথু ফেলল। বন্ধুকে বললে, জর্জি কোন শালাকে পরোয়া করে না, জানলি। মরদের বাচ্চা হও তো সামনাসামনি লড়ে যাও। পুলিসের আঁচলের তলায় লুকানো কেন বাওয়া?

ঢ্যাঙা ছেলেটা বললে, একদিন এমন শিক্ষা দেব—

বাধা দিয়ে জর্জি বলে, কী বে? এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখবি? যা করতে এসেছিস তাই করবি চল!

চল! কোন শালাকে আমিও ডরাই না!

ওরা বিয়ারের বোতল নিয়ে যে যার স্পিডবোটে ফিরে গেল। কী করতে এসেছে ওরা? বন্দুক যখন নেই তখন কীভাবে ক্ষতি করতে পারে অত বড় প্রাণীটার?

সেটা বোঝা গেল পরমুহূর্তেই। ওরা চার-পাঁচটা স্পিডবোট নিয়ে তিমিটাকে এলোপাথাড়ি তাড়া করতে শুরু করল। এতক্ষণ সে শান্ত ছিল, মাঝে-মাঝে মুখটুকু তুলে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ওরা সদলবলে এগিয়ে যেতেই ভয় পেয়ে সে ছোটাছুটি শুরু করল।

ওরা বুঝে নিয়েছে— ঐ দানবাকৃতি তিমিটা নিতান্ত নিরীহ—মানুষের ক্ষতি করবার ক্ষমতা তার নেই। সেটাই ওদের ব্রহ্মাস্ত্র। তিমিটা যদি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ জানত—মাঝে-মাঝে ফোঁস করেও উঠত, তাহলে ওদের এতটা সাহস হত না কিন্তু বেচারি নিতান্ত শান্ত। প্রতিবাদে রুখে উঠতে জানে না।

দশ-পনের মিনিটের ভিতরেই এলোপাথাড়ি ছোটাছুটিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল অভুক্ত জলজন্তুটা। ইতিমধ্যে কনস্টেবল মাউক এসে পৌঁছেছে জলপুলিসের মোটরবোটে। ড্যাগ হান কথা বলে কম, কিন্তু এখন সে মুখর হয়ে উঠল। ছুটে গেল মার্ডকের কাছে। তার হাতদুটি টেনে নিয়ে বললে, প্লিজ, সার্জেন্ট! ওদের থামাও।

মার্ডক দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে। ড্যাগকে নয় আমাকে উদ্দেশ্য করে সে জবাব দেয়, আয়াম সরি স্যার, ওরা তো বেআইনী কিছু করছে না। গুলি করতে আমি দেব না, কিন্তু অল্ডরিজেস পন্ডে স্পিডবোট চালানোতে তো আইনত কোন বাধা নেই।

আইন! আইন! সভ্য মানুষের হাতিয়ার! স্যামসন বন্দী হবার পরে সম্রাটও তাই বলেছিলেন—বন্দী বীরের অঙ্গস্পর্শ করা হবে না, শুধু জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ধরে রাখা হবে ওর চোখের আধ ইঞ্চি সামনে। তাতে তো আইনত কোন বাধা নেই।

কথাগুলো কর্ণগোচর হল জর্জির দলের। হে-হে করে উঠল তারা পৈশাচিক আনন্দে। বন্দুক নয়, শব্দ দিয়ে ওরা জব্দ করবে প্রতিপক্ষকে! শব্দ কি সামান্য? শব্দ ব্রহ্ম! শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তিমিঙ্গিলের বজ্র।

কালীপূজার রাত্রে এ্যালসেশিয়ান কুকুরের অবস্থাটা লক্ষ করেছেন? অমন তেজী, সাহসী জানোয়ারটা ভীতু হয়ে যায় পটকা-বোমার শব্দে। তিমির শ্রুতি ঐ অ্যালসেশিয়ান কুকুরের চতুর্গুণ। স্পিডবোটের শব্দে ওর কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার উপর নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ ওরা দিচ্ছে না। ক্রমাগত ওরা ঘাড়ের উপর নিয়ে যাচ্ছে স্পিডবোটগুলো—ও মাথা জাগাবার উপক্রম করলেই। পাগলের মত সে ঐ হ্রদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে এলোপাথাড়ি ছুটছে, মাঝে-মাঝে মনুমেন্ট-মাপের সম্পূর্ণ দেহটা জল থেকে উৎক্ষিপ্ত করে ঘাই দিচ্ছে! তখন উল্লাসে ফেটে পড়ছে জর্জির দল।

এই ওদের খেলা। পৈশাচিক উল্লাস। আমি কী করতে পারি?

সূর্য উঠে এসেছে পূর্ব দিগ্বলয় ছেড়ে। বাতাসে ভেসে আসছে রবিবারের সকালে গির্জার প্রার্থনাসভার আহ্বান। সেখানে আজও উপস্থিতি কম। দলে-দলে সবাই এসে

জুটছে অল্ডরিজেস পন্ডে। বন্দিনী তিমিকে দেখতে। একটা মোটরবোটে দেখলাম ডাক্তার-দম্পতি বসে আছেন ছানাপোনা নিয়ে। পাশে বড় বাস্কেট, বোধ করি সারাদিনের নানান সরঞ্জাম – বিয়ারের বোতল, লাঞ্চ প্যাকেট, থার্মোস, বাইনোকুলার, ক্যামেরা। আর একটা মোটরলঞ্চে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মেয়রসাহেব। মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন তিমিটাকে।

ড্যাগকে বললাম, ডোরিটা মেয়র সাহেবের লঞ্চের কাছে নিয়ে যাও।

কাছাকাছি হতেই চিৎকার করে বললাম, ওদের থামান। আপনি মেয়র, আপনার কথা শুনবে! বলুন এদের অল্ডরিজেস পন্ড ছেড়ে যেতে।

মার্ডক আর জর্জির জলযানদুটোও ঘনিয়ে এসেছে এতক্ষণে। সকলেই বুঝতে পারছে নাটক পঞ্চমাঙ্কের শেষ যবনিকা পতনের দিকে এগিয়ে এসেছে। মেয়রসাহেব একটু সময় নিলেন, মুভি ক্যামেরা 'প্যান' করায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তিমিটা ডুব দেওয়ায় ক্যামেরাটা নামিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন, কী লাভ বলুন? তিমিটা তো মরবেই। আমি কেন মাঝ থেকে এদের আনন্দে বাধা দিই?

উল্লাসে ফেটে পড়ে জর্জির দল, ব্রেভো মেয়রসাহেব।

বুঝলাম, আমার সব চেষ্টাই বৃথা হল। ওটা মরবেই! আজই! কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবু কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, বলা হল না। তার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা! তিন দিক থেকে তিনটে স্পিডবোট একযোগে আক্রমণ করায় তিমিটার মতিভ্রম হয়ে গেল। হয়তো খণ্ডমুহূর্তের ভুল। অথবা হয়তো এ ওর নিরুপায় আত্মসমর্পণ! তিমিনীটা সোজা ছুটে গেল হ্রদের পশ্চিমদিকে। সেদিকে পাথর নেই, আছে নরম বালির বেলাভূমি। এবার দেখলাম সে সময়ে তার গতিকে সংবরণ করতে পারল না, অথবা— যদি আত্মহত্যার কথাই সে চিন্তা করে থাকে, তবে বলতে হবে সে স্বেচ্ছায় গতিবেগ সংবরণ করল না। ঢালু বালুবেলার উপর সোজা উঠে গেল সে ডাঙায়।

সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল।

সবিস্ময়ে দেখলাম, তিমিটার দেহের বারো-আনা অংশ ডাঙায়। মাথা, পিঠ, হাতডানা দুটো এবং পাখনা। শুধু লেজের দিকটা জলের ভিতর। ওর দেহের যা ওজন তাতে তলপেটটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে সে এতক্ষণে আত্মরক্ষায় ক্ষান্তি দিল। আর পালাতে চায় না, বুঝে নিয়েছে পালানো যাবে না, অনিবার্য মৃত্যুর পারে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানানোর ভঙ্গিমায় এ ওর অন্তিম আত্মসমর্পণ।

এতক্ষণে স্বচক্ষে দেখলাম হ্যাঁ, ওটা মাদী তিমি। নিঃসন্দেহে গর্ভিণী। বার্টখুড়োর আন্দাজ ভুল হয়নি কিন্তু। ওরা সারা দেহে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সাত দিনের অনাহারে ও রীতিমত রোগা হয়ে গেছে। পিঠের শিরদাঁড়াটা দু'চালা ঘরের মটকার মত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট—প্রথম দিন যে তৈলচিক্কণ পৃষ্ঠদেশ দেখেছিলাম, সেটা আর নেই। পাঁজরের হাড়গুলোও স্পষ্ট। কিন্তু ওটা কী? এতক্ষণ তো লক্ষ করিনি। ওর পিঠে, পাখনার অদূরে বাঁ দিকে কী একটা গেঁথে আছে। একটা তীরের মত কোন কিছু—খুব সম্ভবত এ্যালুমিনিয়ামের। চকচক করছে! কী ওটা? তীর তো কেউ ছোঁড়েনি ওকে লক্ষ করে?
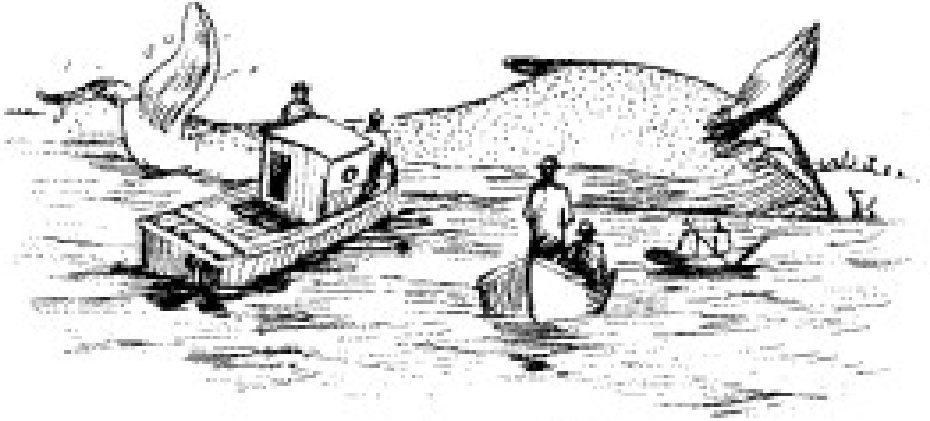
জনতা ছুটে আসে তিমিটাকে লক্ষ করে

হাটের মাঝে পাকা আম-বোঝাই গো-গাড়ি উল্টে গেলে যেভাবে ছুটে আসে লুঠেরার দল, সেই ভঙ্গিতে জনতা ছুটে আসে তিমিটাকে লক্ষ করে। জর্জির দলও লাফিয়ে নেমেছে স্পিডবোট থেকে। বন্দুক ছোঁড়াতেই আইনের বাধা, পাথর ছোঁড়াতে নয়। ওরা ক্রমাগত পাথর ছুঁড়তে থাকে। তিমিটা না-রাম না-গঙ্গা, তার চোখদুটি বোজা!

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ড্যাগ হান লাফ দিয়ে নেমে পড়ল নৌকা থেকে। ছুটতে-ছুটতে এগিয়ে গেল তিমিটার দিকে, ইষ্টকবর্ষণ অগ্রাহ্য করে। একেবারে ওর মুখের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে গেল ওর মাথাটা—বেড়ে পাওয়া অসম্ভব। চিৎকার করে সে ঐ জন্তুটাকে বললে, না! না! কিছুতেই না! এভাবে তুমি হার মেনে নিতে পার না! আমরা তো আছি। দেখ, এই দেখ, ড্যাগ হান এখনও আছে তোমার ঠিক পাশেই।

আচমকা একটা পাথর এসে লাগল ওর রগে। দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে। ড্যাগ হান ঘুরে দাঁড়ায়। জনতার মুখোমুখি। তার চোখে স্পষ্ট দেখলাম—খুনীর দৃষ্টি।

সে কিন্তু কাউকে আক্রমণ করল না। রক্তটা মুছলও না হাত দিয়ে। জনতাকে

উদ্দেশ করে বললে—বেজন্মার দল! তোমাদের লজ্জা করে না? দেখছিস না এটা মাদী তিমি!

জনতা স্তম্ভিত। ওর সেই আকাশ বিদীর্ণ-করা আর্ত চিৎকারে এমন একটা আকুতি ছিল, ওর সেই রক্ত-রাঙা মুখে এমন একটা ব্যঞ্জনা ছিল যে কেউ ভাষা খুঁজে পায় না। পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন মেয়র আর ডাক্তারসাহেব। ড্যাগ তাঁদের দিকেই ফিরে দাঁড়াল। আঙ্গুল ভুলে বললে, আপনারা না ভদ্দরলোক?

ছুটে গিয়ে সে ঐ বিশাল তিমিটার চেপ্টে-যাওয়া তলপেটে একটা চাপড় মেরে বললে, দেখতে পাচ্ছেন না? ওর বাচ্চা হবে? আপনাদের ঘরে কি মা-বোন নেই? তাঁদের পোয়াতি হতে দেখেননি কখনও?

তারপরেই সে যে কান্ডটা করল তাতে বুঝতে পারি- ড্যাগ হান আজ পাগল হয়ে গেছে। সে তিমিনীটার কাছে একছুটে ফিরে গেল। তার কানের কাছে মুখ এনে যেন বিড়বিড় করে কী বলল, যেন চুমো খেল। তারপর ওর পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে উল্টোমুখে সে ঠেলতে শুরু করল।

বদ্ধ উন্মাদ! ঐ আশি-নব্বই টন জগদ্দল পাহাড়কে সে টলাবে গায়ের জোরে একা? ড্যাগ কি বুঝতে পারছে না, তিমিনীটা এখন ইচ্ছে করলেও বাঁচতে পারবে না? তার যা কিছু কেরামতি তা জলের তলায়—ওর পক্ষে ঐ প্রকান্ত দেহটা নিয়ে...

কিন্তু এ কী! তিমিনী এতক্ষণে চোখ চাইল। তার অনড় দেহটাতে স্পন্দন জাগল। সে নড়ছে—হ্যাঁ, তিল-তিল করে সরছে। কেউ কোন কথা বলছে না! জনতা সম্পূর্ণ স্তব্ধ! হাত ডানায় ভর দিয়ে ঐ অতিকায় জলজন্তুটা অতি ধীরে-ধীরে একশো আশি ডিগ্রি মোড় ঘুরল। লেজটা এল ডাঙায়, মুখটা জলের দিকে। তারপর কুমীর যেভাবে জলে নামে, ঠিক সেই ভাবে হাত ড়ানায় ঠেকো দিয়ে তিলে তিলে এগিয়ে গেল জলের দিকে।

আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে আবার সে ফিরে গেল জলে।

তলিয়ে গেল তার সেই অতিকায় দেহটা অল্ডরিজেস পন্ডে।

নাটকের চরম ক্লাইম্যাক্সটা যে বাকি আছে তখনও, তা বুঝিনি আমি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম তিমিনীটার দিকে। রঙ্গমঞ্চ থেকে সে বিদায় নেবার পরে দর্শকদলের দিকে ফিরে দেখলাম— নাটকের ক্লাইম্যাক্সটা ছিল সেদিকেই।

কেউ কোন কথা বলল না। একে-একে মাথা নিচু করে যে যার নৌকায় উঠল। মায় জর্জির দল। আধঘণ্টার মধ্যে জায়গাটা জনশূন্য হয়ে গেল। শুধু মাথার উপর চক্রাকারে পাক খাচ্ছে কয়েকটা সী-গাল আর ঘাটলায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা দু'জন!

নাটকের নায়িকা তখন হ্রদের গভীরে।

ড্যাগ বসেছিল একটা পাথরের উপর। দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। আমি এগিয়ে আসি। ওকে ডাকি এস ড্যাগ! চল, এবার যাওয়া যাক। ড্যাগ হান সাড়া দেয় না।

ওর হাত ধরে টানতেই মুখটা তুলল। না, শুধু রক্ত নয়, অশ্রুর বন্যাতেও ভেসে যাচ্ছে তার মুখ। ড্যাগ এতক্ষণ তাহলে কাঁদছিল। কেন? এ অশ্রু আনন্দের, না বেদনার? তিমিনীটার জনাই কি কাঁদছিল ও?

"Today the few remaining Fin Whale families are so widely scattered that a young female Finner may have to wait many years before encountering a potential male. This is the more deeply tragic because Finners seem to be strictly monogamous. There is nothing to indicate that a sexually mature daughter ever produces young while she remains in the family pod, or that a widowed female will mate

again except with an unattached male. Polygamy, which is the rule amongst Sperm Whales, has helped that nation to partly hold its own against our depredations. But the practice of monogamy among the Finners may prove to be a luxury their decimated species cannot afford."

ডানা তিমিদের যে-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আজও টিকে আছে তারা এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে যে, একটি প্রাপ্তবয়স্কা মাদী তিমির পক্ষে কোন বীর্যবান পুরুষ তিমির সাক্ষাৎ পেতে বহু-বহু বছর কেটে যায়। এটা বিশেষ করে বেদনাবহ, কারণ ডানা তিমিরা অনিবার্যভাবে বহুবিবাহে অবিশ্বাসী। জাতিগতভাবে একপত্নীক এবং একপতিক। প্রাপ্তবয়স্কা কোন মাদী তিমি যতদিন তার পরিবারভুক্ত থাকে ততদিন তার বাচ্চা হয় না। অর্থাৎ কুকুর-গরু-হাতি বা মানুষের মত নিজ পরিবারভুক্ত কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও কোন মাদী ডানা তিমি মিলিত হয় না। নিজের পরিবার-ঝাঁক ছেড়ে যখন সে মনোনীত জীবনসঙ্গীর সঙ্গে যাত্রা করে তখনই তার সন্তান হয়। এমনকি কোন তিমিনী বিধবা হলেও অপর কোন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয় না, যদি না জানতে পারে সে বিপত্নীক অথবা কুমার। দাঁতাল তিমিরা এ নীতি মানে না, তারা বহুবিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ, আর হয়তো সেজন্যই তারা মানুষের ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে আজও মোকাবিলা করতে পারছে। ডানা তিমি পারছে না। কারণটা বেদনাবহ। প্রেমের ঐ একনিষ্ঠতার জন্যেই! ক্ষয়িষ্ণু ডানা-তিমির সমাজ এই 'সতীত্বের বিলাসিতাটা সহ্য করতে পারছে না। ওরা অনিবার্যভাবে চলেছে অবলুপ্তির পথে!

রবিবারের ঘটনায় বুঝে নিয়েছিলাম আমার অসহায় অবস্থাটা। শুধু জর্জিদের মত চপলমতিরাই না, ডাক্তারবাবুদের অথবা স্বয়ং মেয়রকেও আমি স্বপক্ষে পাব না। ঘটনার নাটকীয়তায় সেদিন ওরা সাময়িকভাবে স্থানত্যাগ করেছিল বটে, কিন্তু একটা নগণ্য মৎস্যজীবীর মুখে ঐ বেজন্মার দল' গালাগালটা ওরা হজম করতে পারবে না। প্রত্যাঘাত করবেই—এবং সে আঘাতটা শুধু আমার উপর, অথবা ড্যাগ হানের উপর নয়, আসবে ঐ বন্দিনীর উপর।

তাই মনে হল, আমার একাঘ্নী-অস্ত্রটা ত্যাগ করার ব্রাহ্মমুহূর্ত উপস্থিত। সোমবার বেলা দশটায় নিজ ব্যয়ে বিস্তারিত একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠালাম কানাডিয়ান প্রেসকে [গুণে দেখছি সে টেলিগ্রামের শব্দসংখ্যা—একশো নয়]:

"সত্তর ফুট লম্বা প্রায় আশি টন ওজনের একটি ডানা তিমি একুশে জানুয়ারি থেকে এখানকার একটি হ্রদে বন্দিনী হয়ে পড়েছে xxx হ্রদ একটি অকৃত্রিম এ্যাকোয়ারিয়াম দৈর্ঘ্য-প্রস্থে আধমাইল যাতে তিমি স্বচ্ছন্দ বিহারিণী xxx প্রথম পাঁচদিন স্থানীয় কিছু অতি-উৎসাহী রাইফেলের গুলিতে তাকে বিপর্যস্ত করেছে xxx এখনও স্পিডবোট নিয়ে তাকে ক্রমাগত উত্যক্ত করছে xxx স্থানীয় জলপুলিসের সাহায্যে গুলিবর্ষণ বন্ধ করেছি xxx কিন্তু অন্যান্য বিপদের আশঙ্কা যায়নি xxv বড় জাতের তিমির এভাবে বন্দী হওয়াটা অভূতপূর্ব সংবাদ xxx বৈজ্ঞানিক গবেষণার অপূর্ব সুযোগ পাওয়া গেছে xxx অনাহারে তিমিনী ম্রিয়মাণ xxx ওজন দ্রুত কমছে xvX তাছাড়া বহাল তবিয়ং xxx অত্যাচারীদের প্রতি তিমিনী ক্ষমাশীলা xxx বিস্তারিত সংবাদের জন্য বার্জিয়াতে আমাকে টেলিফোন করুন xxx সাহায্য চাই xxx অত্যন্ত জরুরি!"

স্বীকার করব, আমার এ একাঘ্নী ভাস্ত্রে যে গোটা বিশ্বে সাড়া জাগবে, তা আমি আদৌ আশা করিনি। ক্লেয়ারও করেনি। কিন্তু অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ঐ দিন বেলা বারোটার রেডিও-সংবাদে আমার টেলিগ্রামটি আদ্যোপান্ত পড়ে শোনানো হল এবং তারপর থেকে টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রাখা যায়নি।

তার একটি কাকতালীয় হেতু ছিল। সারা বিশ্ব ঐ সময়ে ছিল তিমি-বিষয়ে উৎসাহী।

কারণ আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের অজান্তে, এখান থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে বার্জিয়োতে খবরের কাগজ আসে বাসি হয়ে।

ম্যাকেঞ্জি নদীর মোহনার কাছাকাছি সতেরটি সাদা তিমি (আকারে ছোট) বরফের বলয়ে আটকে পড়ে গিয়েছিল—অখ্যাত একটি এসকিমো গ্রামে, তার নাম 'ইনুভিক'। তিমিগুলো উষ্ণতর অঞ্চলে পালিয়ে যাবার আগেই নাকি তাদের চতুর্দিকে বরফের বলয় ঘিরে আসে। অর্থাৎ ডুব দিয়ে তিমিগুলো সেই বরফ রাজ্য পার হতে পারবে না—তার বিস্তার চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল যা এক ডুবে অতিক্রম করা যায় না। ‘ইনুভিক' গ্রামের মোড়ল গ্রামবাসীদের নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছিল তাদের বাঁচাতে। হেলিকপ্টারে করে সভ্য দুনিয়া থেকে বরফ-কাটার যন্ত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দিবারাত্র তিন শিফটে ঐ গ্রামবাসীরা বরফ কেটে হতভাগ্য তিমিদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। শীত যতই বাড়ছে ততই অবস্থাটা যেন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

যে-রবিবার জনাকীর্ণ অল্ডরিজেস পণ্ডে বার্জিয়োর মেয়র আমাকে বলেছেন, “তিমিটা তো মরবেই, আমি আর কেন ছেলেদের আমোদে বাধা দিই,” ঠিক সেই রবিবারই ইনুভিক গ্রামের মোড়ল একটু ভিন্ন জাতের কথা শোনাচ্ছেন তাঁর গ্রামের এস্কিমোদের। সেদিন সেখানে মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রিতে নেমে গেছে তাপাঙ্ক। প্রচণ্ড তুষার-ঝড় বইছে গ্রামের উপর। চারদিকে শুধু বরফ, বরফ আর বরফ! সেই দুর্যোগে ম্যাকেঞ্জি মোহনার গাঁয়ের মোড়ল সে গ্রামের জর্জিদের বলছেন হাল ছেড় না, প্রয়োজন হয় সারা রাত আমরা তিন শিফটে কাজ করে যাব। ঐ সতেরটা তিমিকে বাঁচাতে হবেই।

তাই বলছিলাম, এটা নিতান্ত একটা কাকতালীয় কৌতুক। সম্পাদকদের টেবিলে আমার টেলিগ্রামখানার সঙ্গে একই আলপিনে গাঁথা হয়ে পড়েছিল আর-একটা তারবার্তা —ঐ ইনুভিক গাঁয়ের। সংবাদ মর্মন্তদ: সমস্ত রাত্রির নিরলস পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে। সতেরটি তিমি অন্তিম সমাধি লাভ করেছে বরফের কবরে।

রন্ধন যদি একটা চারুকলা হয় তবে পরিবেশন পারিপাট্যও কম যায় না। সাংবাদিকরা জানে কীভাবে খবর পরিবেশন করতে হয়। একই প্লেটে জোড়া সন্দেশ উপস্থিত করা হল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। পাশাপাশি দুটি কলামে দুটি খবর—ইনুভিক ও বার্জিয়ো—দেবতা ও দানব, মানবিকতা ও পাশবিকতা,–যেন বিউটি এ্যান্ড দ্য বীষ্ট।

আমার সমস্ত জীবনের সাহিত্যসাধনা মুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল! সাংবাদিক হিসাবে, ঔপন্যাসিক হিসাবে, আমি এতদিন যা বলে এসেছি, দেখা গেল তা মিথ্যা – আমারই পরিবেশিত সংবাদে। এতদিন বারে বারে বলে এসেছি এইসব নিরক্ষর চাষী, মৎস্যজীবী, তন্তুবায়ের দল, যারা তথাকথিত সভ্য দুনিয়া থেকে বহু দূরে অজ্ঞাতবাস করে, তারা অমানুষ নয়। তারা আছে মাটির কাছাকাছি, অরণ্যের অঞ্চলতলে, সমুদ্রের গা-ঘেঁষে, ওরা জানে ভালবাসতে প্রকৃতিকে, প্রাকৃতিক জীবজন্তুকে। অথচ আজ আমারই টেলিগ্রামখানা প্রমাণ করল আমি এতদিন ভুল বলেছি! সংক্ষিপ্ত তারবার্তায় জর্জি আর বার্টখুড়োর ফারাকটা বোঝা যায় না। গোটা বার্জিয়োর কপালে আমি লেপে দিয়েছি দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা!

একটা তিমিকে বাঁচাতে আমি আমার সাহিত্যিক সত্তার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিয়ে বসে আছি।

সোমবার সকালেই অবশ্য খবরটা জানাজানি হয়নি। এখানে খবরের কাগজ আসে দু'দিনের বাসি হয়ে। সোমবার দুপুরে ওনী স্টিকল্যান্ড এল আমাকে ডাকতে কর্তা, অল্ডরিজেস পণ্ডে একবার যাবেন নাকি? চলুন দেখে আসি, বার্টখুড়োর ফন্দিটা কাজে লেগেছে কিনা।

বার্টখুড়োর ফন্দি! সেটা আবার কী?

বিস্তারিত শোনা গেল ওনীর কাছে। বার্টখুড়োর জ্বরটা সেরেছে। উঠে বসেছে

এতদিনে। কাল রাত্রে ড্যাগ হান গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুড়োকে খুলে বলেছিল। খুড়ো বলে, অবিলম্বে ঐ পোয়াতি হতভাগীকে কিছু খাওয়াতে হবে। না, মরা মাছ সে খাবে না! জ্যান্ত মাছ কী করে তাকে খাওয়ানো যায়? বুদ্ধিটা সেই বাতলেছিল।

জোয়ারের জলের সঙ্গে প্রতিদিনই বেশ কিছু হেরিং ঢুকে পড়ে অল্ডরিজেস পন্ডে; কিন্তু ভিতরে ঢুকেই কোন এক দুর্বোধ্য আইনে তারা বুঝে ফেলে তিমিটার উপস্থিতি। ভাটার টান শুরু হবার আগেই তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে পালিয়ে যায়। খুড়ো বুদ্ধি দিয়েছে—ভরা জোয়ারের পরেই সাউথ চ্যানেলের মুখে আড়াআড়ি জাল দিয়ে আটকাতে হবে। ভোর রাতে কেনেথ আর ড্যাগ দু'ভাই গিয়ে সেই কথামত জাল আটকে দিয়ে এসেছে। একটা চক্রব্যূহী জাল! এতক্ষণে ভাটার টান ধরেছে। তাই ওনী স্টিকল্যান্ড দেখতে চায় অবস্থাটা।

আমরা যখন সাউথ চ্যানেলের কাছাকাছি, তখন দেখতে পেলাম—কর্তা তিমিকে। বন্দিনীর 'নাইট-ইরান্ট'! যার প্রসঙ্গে সেই মাড়ি-কোভ-এর বৃদ্ধ ধীবরটি বলেছিল —"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা, বাইর-সায়রের মদ্দা তিমিড়া অরই মরদ, একথা যদি ব্যত্যয় হয়, তবে আমাকে শাঁখা-শাড়ি পরাবেন।" তার কথা শোনা ছিল, এবার স্বচক্ষে দেখলাম। শুধু দেখলাম না, স্বকর্ণে শুনলামও তার আর্তনাদ: "A deep, vibrant sound such as might perhaps be simulated by - a bass organ pipe heard from a distance on a foggy night. It was a deeply disturbing sound, a kind of eerie ventriloquism out of another world utterly foreign to anything Onie and I were familiar with. -"শব্দটা কেমন জান? — গভীর কাঁপা-কাঁপা আওয়াজ, যেন কুয়াশা-ঢাকা মধ্যরাত্রে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে গির্জার প্রার্থনাসঙ্গীতের ভোমা অর্গানপাইপের একটানা শব্দ। শব্দপ্রেরণের বিচিত্র কায়দায় কেমন যেন গা শিরশির করে, বিচলিত বোধ হয়, মনে হয় চেনা-জানা দুনিয়ার বাইরে থেকে বুঝি কোন অশরীরী আত্মার আর্তি ভেসে আসছে।'

শব্দটা সে একবারই করল। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম—কিন্তু সে আর ডাকল না। সাউথ চ্যানেলের প্রবেশদ্বারে ক্রমাগত পাক খেতে থাকে। তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে তলিয়ে গেল সমুদ্রে।

সাউথ চ্যানেলে ঢুকেছি কি ঢুকিনি, মাদী তিমিটা ভেসে উঠল। মাথাটা জাগিয়ে যেন আমাদের দেখল। ও কি চিনতে পারছে আমাদের? না হলে এমনভাবে মাথা জাগাল কেন? যেন বলতে চাইছে, এই যে! আজ এত দেরি হল কেন?

ঠিক তখনই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। আমরা তিমিটাকে দেখছিলাম বলে এদিকে লক্ষই করিনি। আমাদের পশ্চিমে ভাসছিল একটা স্পিডবোট— তিমিটা মাথা জাগানো মাত্র সেটা উল্কার বেগে ছুটে গেল তার দিকে। তৎক্ষণাৎ তিমিটা ডুব দিল—কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেছে, স্পিডবোটের তলদেশ ওর শিরদাঁড়ায় ঘষে গেল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল স্পিডবোটের যাত্রীরা।

চিনতে পারলাম ওদের। জর্জি নেই, কিন্তু তার দলের সেই বকাটে ছেলেরা আছে। তিমিটার পিঠে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে স্পিডবোটটা ঘুরে এল আমাদের মুখোমুখি। আমি তখন রাগে থরথর করে কাঁপছি, তা দেখে ছেলেগুলো হি-হি করে হাসতে শুরু করল। চিৎকার করে বললাম, এই মুহূর্তে অল্ডরিজেস পন্ড ছেড়ে চলে যাও। এখানে স্পিডবোট চালানো বারণ।

স্পিডবোটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আঠার-উনিশ বছরের সেই ছোকরা। হি-হি করে হাসতে-হাসতে বললে, বটে! মহাশয়ের হুকুমে?

সোজা মিথ্যা বললাম, না। মুখ্যমন্ত্রী জো স্মলউডের হুকুমে। শোননি আজকের রেডিও ব্রডকাস্ট? আমি তোমাকে চিনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পন্ড ছেড়ে না-গেলে আমি

সোজা তোমার নামে কমপ্লেন পাঠাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

নিউফাউন্ডল্যান্ডে সেই ১৯৬৭ সালে জো স্মলউডের নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। ওরা কেমন যেন চুপসে যায়। নিজেদের মধ্যে কী সব পরামর্শ করতে থাকে। আমি রিস্টওয়াচের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমার ডোরিতে। ফন্দিটা কার্যকরী হল। ওরা স্পিডবোটের মুখ ঘোরাল। সত্যিই পাঁচ মিনিটের মধ্যে অল্ডরিজেস পন্ড ত্যাগ করে চলে গেল।

আবার নৈঃশব্দ ঘনিয়ে এল হ্রদের চারপাশে। সেই নীল আকাশ, নীল হ্রদের জল আর একঝাঁক সাদা সী-গাল। আধঘন্টার মধ্যেই তিমিটা কী জানি কী করে বুঝে নিল শত্রু নৌকাটা চলে গেছে। ফিরে এল সে। আমাদের ডোরিটার চারিদিকে পাক দিতে থাকে। জলের প্রায় উপরিভাগ দিয়েই। এতক্ষণে নজরে পড়ল স্পিডবোটের ঘর্ষণে ওর কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। প্রায় সাত-আট ফুট লম্বা একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন, উপরের চামড়াটা ছিঁড়ে গেছে, ব্লাবার বেরিয়ে পড়েছে! পরে শুনেছিলাম, ঐ ছেলেগুলো কারখানায় ফিরে এসে গল্প করেছিল —কীভাবে তারা তিমিটার ঘাড়ের উপর উঠে পড়েছিল “We cut a Jesusly big hole into her!” বাংলায় ওটার অনুবাদ কী হবে?—“আমরা এর পিঠে একটা রামকোপ বসিয়েছিলাম?” না! ‘চলন্তিকা' বলছেন, বৃহৎ অর্থে 'রাম'-এর ব্যবহার হয়, যথা রামছাগল, রামদা, রামশিঙা। কিন্তু করুণার অবতার যিশুর সঙ্গে ক্ষত্রিয়বীর রামের কিছু ফারাক আছে—রামের বদলে যদি বৃহৎ অর্থে বুদ্ধের ব্যবহার বাংলা ভাষায় প্রচলিত থাকত, তাহলেই ঐ Jesusly cut-এর ঠিকমত অনুবাদ করে বলতে পারতাম, ‘বুদ্ধ কোপ' ৷

সমস্ত দিন আমরা পাহারায় থাকলাম। আর কেউ ওকে বিরক্ত করতে এল না। সন্ধ্যার সময় কনস্টেবল মার্ডক এসে পড়ায়, ওনীকে নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। বেচারি ক্লেয়ার। সারা দিনমানে সে ত্রিশটি টেলিফোন কল পেয়েছে— অধিকাংশই বাইরের দুনিয়া থেকে, খবরের কাগজের রিপোর্টার, বৈমানিক, সরকারী অফিসার। এসেছে সাত-আটখানা টেলিগ্রাম। তার ভিতর একখানা আমাকে অনৃতভাষণের পাপ থেকে মুক্তি দিল। এ তারবার্তাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আসছে সত্যই খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে

‘আপনার প্রেরিত সংবাদে আনন্দিত। সহকর্মীদের ইচ্ছানুযায়ী জানাচ্ছি, তিমিটাকে খাওয়ানোর জন্য আপনি একহাজার ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারেন। বার্জিয়োর ধীবরদের মাধ্যমে তিমিটাকে জীবিত রাখুন আপনার দায়িত্বে। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ। জে. আর. স্মলউড।”

তারবার্তাটা পড়া শেষ হতেই ক্লেয়ার বলল, শোন, একটু আগে তোমার পাবলিশার বন্ধু জ্যাক ফোন করেছিল। বলেছে, স্মলউড খুব নাচানাচি করছে, কিন্তু তুমিও যেন তার সঙ্গে তাল দিয়ে নেচ না।

মানে?

জ্যাক বলেছে, হাজার ডলার নগদে হাতে পাওয়ার আগেই যেন ধরে নিও না, ও টাকা তুমি আদৌ পাবে!

কিন্তু ওটা কী বানাচ্ছ তুমি?

ক্লেয়ার বোর্ডটা তুলে দেখাল। সারাদিনে সে একা একা শুধু টেলিফোন কলই এ্যাটেন্ড করেনি, প্রকাণ্ড একটা কাঠের বোর্ডে রঙ-তুলি দিয়ে লিখেছে একটা নোটিশ:

সাবধানবাণী

এই তিমিটিকে কোনভাবে

বিরক্ত করিবেন না।

অল্ডরিজেস পন্ড সাময়িকভাবে

নৌকা যাত্রীদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা

বিশেষ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

অনুমত্যানুসারে

নিউফাউন্ডল্যান্ড সরকার।

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শুধু বার্জিয়ো নয়, আমিও বিখ্যাত হয়ে পড়লাম।

অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে অকল্পিত সব টেলিগ্রাম আসতে শুরু করল। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর একটি দ্বিতীয় তারবার্তা এসেছ, "আপনাকে সরকারীভাবে ঐ তিমির অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছে। দায়দায়িত্ব সবই আপনার। এজন্যে যথোচিত সম্মান আপনাকে সময়ে দেওয়া হবে। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ, জে. আর স্মলউড।"

সেদিনই সংবাদপত্রে ছাপা হল কানাডিয়ান প্রেসের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট:

"মুখ্যমন্ত্রী আজ বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, বার্জিয়োতে বন্দী তিমির রক্ষকরূপে সাহিত্যিক ফার্লে মোয়াটকে নিয়োগ করা হয়েছে। জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আশি টন ওজনের প্রকাণ্ড জলজন্তুর এই অভিভাবককে কী জাতের উপাধি দান করা যাবে সেটা এখনও স্থির করা যায়নি, কারণ ব্যাপারটা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। রক্ষক মহোদয়ের জন্য যথোপযুক্ত জমকালো য়ুনিফর্মের অর্ডার দিতে হবে।" সদস্যরা এ কথায় সমস্বরে হেসে ওঠায় স্মলউড বলেন, "আপনারা এটা লঘু করে দেখবেন না। ব্রিটেনের এই সবচেয়ে প্রাচীন উপনিবেশে আবার নূতন ইতিহাস রচিত হতে চলেছে।"

"শোনা যাচ্ছে, তিমিটার একটা নামকরণও করা হবে। কেউ-কেউ বলছেন নামটা হওয়া উচিত : মবি জো!—নামটি সুপ্রযুক্ত। ইতিহাসবিখ্যাত মবি ডিক-এর মত এই তিমিও বিশ্ববিখ্যাত হতে চলেছে। হয়তো সেই সূত্রে সাহিত্যিক ফার্লে মোয়াটের নাম হয়ে যাবে ফার্লে আহাব।"

বস্তুত ক্লেয়ারের পক্ষে ডাকবিভাগের সঙ্গে একা পাল্লা দেওয়া সত্যই ক্রমে কষ্টকর হয়ে পড়ছে। কত চিঠির জবাব সে একা লিখে উঠতে পারে? সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম—অতি বিখ্যাতদের চিঠির জবাব না-দিলে চলে না। কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন জানিয়েছেন, তাঁরা একটি টীমকে পাঠিয়েছেন, ফিল্ম তোলার জন্য—দলপতি বব ব্রুক্স। কানাডিয়ান মেরিন লাইফ নাকি একজন সরকারী বিশেষজ্ঞকে পাঠাচ্ছেন। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়ম শোভিল নিজে থেকেই তারবার্তা পাঠিয়ে জানাচ্ছেন, যে তিনি আমার অতিথি হতে চান। আমার বাড়ি ছোট্ট, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কোন অতিথি এসে আমার বাড়িতে থাকবে তা ভাবতেই পারিনি

এতদিন। কাকে কোথায় থাকতে দেব? ত্রিসীমানায় হোটেল মোটেলও নেই। তাহলে!

আরও দু-দুটি প্রস্তাব এসেছে যা মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

এক নম্বর—লুইসিয়ানার এক সার্কাসের মালিক আমাকে জানাচ্ছেন, জ্যান্ত অবস্থায় তিমিটাকে তিনি কিনতে চান। কত দাম চাইব আমি?

দু'নম্বর—মনট্রিয়েলের একজন ধনকুবের সরাসরি লিখছেন, আগামী বিশ্বমেলায়, অর্থাৎ এক্সপো '৬৭-তে তিনি ঐ তিমিটাকে উপস্থিত করতে চান। জীবিত অবস্থায় তিমিটাকে হস্তান্তরিত করলে তিনি নগদ এক লক্ষ ডলার আমাকে দিতে প্রস্তুত। জানতে চেয়েছেন আমি বেচতে রাজি কিনা।

টেলিগ্রামের বান্ডিলটা বাড়িয়ে ধরে ক্লেয়ার বলল, বল, কাকে কী বলব? আমি বললাম, ওসব থাক। তিমিটাকে বাঁচানোই হচ্ছে আসল কথা। ওকে খাওয়াব কী? কেমন করে?

ক্লেয়ার বললে, সে বিষয়েও নানান খবর আছে। কর্তৃপক্ষ হেরিং মাছ ধরার সিনার পাঠিয়ে দিচ্ছেন, —জ্যান্ত হেরিং ধরে ঐ সাউথ চ্যানলের পথে পন্ডে পাঠানো হবে! হবে, মানে কবে? আজ আটদিন সে না-খেয়ে আছে! ইতিমধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

ও হ্যাঁ! সে বিষয়ে বার্টখুড়ো তোমাকে কী যেন বলতে এসেছিল। তুমি নেই শুনে একাই অল্ডরিজেস পন্ডে চলে গেল।

বার্টগুড়ো তাহলে সামলেছে। তিমিটাকে ভবিষ্যতে কী করা হবে সেটা পরের চিন্তা। তিমিবিজ্ঞানীরা এসে সেসব ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু আপাতত পারলে ঐ বার্টখুড়োই পারে একটা সাময়িক ব্যবস্থা করতে। আমি তখন ডোরি নিয়ে রওনা হলাম। বার্টখুড়োকে ধরতে হবে। বেশি বেগ পেতে হল না। কোভ-এর কাছাকাছি তার দেখা পেলাম। সাউথ চ্যানেলের মুখের কাছে ডোরিটা নোঙর করে চুপচাপ বসে আছে। একা।

আমাকে দেখতে পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। এক গাল হাসল। ওর মাথায় এখন আর ব্যান্ডেজ নেই। দিব্যি খোশমেজাজ। বোধহয় নির্বান্ধব সমুদ্রসৈকতে কয়েক ঘণ্টা থাকায় তার তিরিক্ষে মেজাজটা শান্ত হয়েছে।

বললে, বুঝলে হে ভালো-মানষের পো। তিমিটা আমার নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছে। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু করেছে যা বার্টখুড়োরও ধারণার বাইরে। সেটা কী তা জানবার জন্য আমার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সে কথা না-বলে আমি ওকে উল্টো চাপ দিলাম ওটা তিমি নয়, তিমিনী। তোমার লিঙ্গে ভুল হল।

খুড়ো রাগ করল না। হাসল। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর হাসি-হাসি মুখে বললে, বার্টখুড়ো তোমার মত গ্রামার পড়েনি, তাই তার লিঙ্গে ভুল হয় না! আমি তিমিনীর কথা বলছি না। বাইর-সায়রের তিমির কথাই বলছি।

ও! তা কিভাবে তোমার নাকে ঝামা ঘষে দিল?

ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বস! চুপচাপ বসে থাক। তোমার নাকেও ঘষবে।

অগত্যা অপেক্ষা। কিন্তু বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না। আধ ঘন্টা খানেক পরে খুড়ো নিঃশব্দে আমার কাঁধটা ধরে ইঙ্গিত করল। টের পেলাম—মদ্দাটা এসেছে। সাউথ গেটের বাইরে এসে প্রকাণ্ড একটা বৃত্ত রচনা করে পাক খাচ্ছে। আমরা যেন মাচায় বসা শিকারী- নিঃসাড়ে লক্ষ করছি। তিমিটা পাক খাচ্ছে, ক্লকওয়াইজ চালে, প্রথমে প্রকাণ্ড বৃত্ত, তারপর ক্রমশ বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে। শেষদিকে অত্যন্ত ছোট পরিসরে বার-দুই পাক খেয়েই যেন একটা গোঁত্তা মারল ঐ বৃত্তের কেন্দ্রেতে। তারপর যা দেখলাম তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। প্রকাণ্ড তিমিটা সাউথ চ্যানেলের প্রতিবন্ধকতার এপারে লাফ দিয়ে

উঠল পোল ভল্টের প্রতিযোগীর মত আর পরমুহূর্তেই দেখলাম তার মুখবিবর থেকে কয়েক হাজার গ্যালন জল গড়িয়ে গেল অল্ডরিজেস পন্ডে। এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা গেল সূর্যের আলোয় তাতে চিকচিক করছে জ্যান্ত হেরিং! -

এদিকে ফিরতেই দেখি বার্টবুড়োর নীল চোখজোড়াতে জল চিকচিক করছে। আমার হাতটা ধরে বললে, এতটা বয়স হল, কিন্তু তিমির প্রেম যে কী জাতের তা জানা ছিল না! পোয়াতি নাতবৌ যে না-খেয়ে মরেনি তার কারণ ঐ। আমরা কেউ টের পাইনি —কিন্তু মদ্দা তিমিটা ক্রমাগত মাছ ধরে এনে জ্যান্ত মাছ ওপারে চালান করেছে। যিশাসে মালুম—ঐ নাতি শালা নিজে না-খেয়ে আছে কি না।

ফেরার পথে আমি খুশিয়াল হয়ে উঠি। আর ভয় নেই। বন্দিনীকে কেউ গুলি করবে না, বিরক্ত করবে না, তাকে অনাহারেও মরতে হবে না! দশটা দিন কেটে গেছে, ভালোয় ভালোয় আর দু'হপ্তা পাড়ি দিতে পারলেই পূর্ণিমার জোয়ার আসবে। বার্টখুড়োকে কিন্তু আদৌ উৎফুল্ল লাগছিল না। আমি একনাগাড়ে বকবক করে চলেছি— সমস্ত পৃথিবীতে কী জাতের সাড়া জেগেছে। দু'চার দিনের মধ্যেই জীব-বিজ্ঞানীরা এসে পড়বেন। ফিল্ম শ্যুটিং শুরু হয়ে যাবে। এই জনহীন অল্ডরিজেস পন্ডের চারিদিকে ভিড় করে আসবে বিদেশী ট্যুরিস্ট—য়ুরোপিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, জাপানি, মার্কিন...

কোথাও কিছু নেই প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে খুড়ো থাম তো তুমি। চমকে উঠি ধমক শুনে। আমতা-আমতা করে বলি, তুমি এমন ক্ষেপে উঠলে কেন বল তো?

খুড়ো আমার চোখে চোখ রেখে শুধু বললে 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালেবিলে, সুন্দরীকে বিয়ে দিলাম ডাকাতদলের মেলে।'

আশ্চর্য! নির্ভুল উদ্ধৃতি। প্রবাদ বাক্য-প্রয়োগে বার্টখুড়ো চিরকাল উল্টোপাল্টা উদ্ধৃতি দেয়, কিন্তু এবার আর গুলিয়ে যায়নি গ্রাম্য ছড়াটা! অবাক হয়ে বলি, মানে?

খুড়ো মুখটা নিচু করল। ভোরি থেকে নিচু হয়ে এক আঁজলা লোনা জল নিয়ে অহেতুক মাথায়-মুখে নাগল। তারপর বললে, ভালো-মানষের পো। তোমার মনে আছে, প্রথম দিনই আমি বলেছিলাম, তোমার সমিস্যে তিনটে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! তৃতীয় সমস্যাটা কী, তা সেদিন খুড়ো বলেনি। বলেছিল, আমার এক নম্বর সমস্যা জর্জিদের হাত থেকে তিমিনীটাকে রক্ষা করা, দু'নম্বর কাজ তাকে খাওয়ানো এবং তিন নম্বর—না বলেনি। বরং বলেছিল, পরে বলব সময় হলে।

তাই প্রশ্ন করলাম ওকে। বললে, তিমিদের তিনজাতের শত্রুর, বুয়েছ ভালো-মানষের পো। তাদের মধ্যে প্রথম দু'জাতের সঙ্গে মোকাবিলা করার তাগৎ সে নিজেই রাখে—হাঙর আর রাক্ষুসে তিমি। কিন্তু সেই তিন নম্বর শত্রুর বিরুদ্ধে ঐ তাগড়াই ভীমভবানী নিতান্ত অসহায়। পারবে, সেই তিন নম্বরের হাত থেকে আমার ঐ পোয়াতি নাতবৌকে বাঁচাতে?

একটু-একটু যেন বুঝতে পারছি। আমার দিকে ফিরে বললে, চিনেছ ওদের সেই তিন নম্বরী দুশমনকে? তিমিঙ্গিল! যারা তিমিকে আস্ত গিলে খায়।

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, খুড়ো কী বলতে চায়। তাই তো। এ কথা তো খেয়াল করিনি কেন ঐ হতভাগিনীকে আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা? |

ও তো আর এখন সেই গ্রাম্য কিশোরীটি নয়, যে-মেয়েটা ঝুড়ি ভরে কাঁচামিঠে আম আনত, আনিটা দিতে যাকে ভুল করে দোয়ানিটা দিয়ে ফেলতাম—ও এখন “মবি জো'! তিন তিনটে টেলিগ্রাম পড়ে আছে আমার টেবিলে–হয় তাকে হতে হবে জো স্মলউডের হারেমের বাঁদী, অথবা সার্কাসের নাচনেওয়ালী, কিম্বা এক্সপো ৬৭-এর বন্দিনী।

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,

সুন্দরীকে বিয়ে দিলাম ডাকাতদলের মেলে'।

আমি কে? আমি কতটুকু? ঐ তিমিঙ্গিলদের হাত থেকে কেমন করে উদ্ধার করব ঐ বন্দিনীকে! ওর জীবনে কৃষ্ণপক্ষ তো আর অতিক্রান্ত হবে না–পূর্ণিমা কোনদিনই আসবে না। বিজ্ঞান বলে, তিমির নাকি রাত্রি নেই, একটানা ঘুম দেওয়া ওদের দেহধর্ম অনুযায়ী অসম্ভব। আজ মনে হল—ভুল বলে বিজ্ঞান। রাত্রিটাই শুধু আছে, আর কিছু নেই ওদের। তিমির রাত্রি নিষ্প্রভাত!

পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে।

ড্যাগ হান, সেদিনের সেই হঠাৎ উচ্ছ্বাসের পর থেকে আর আমার সামনে আসেনি। বার্টখুড়ো অসহযোগ করছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তার বক্তব্য মহাষ্টমীতে যে-মোষকে বলি দেওয়া হবে, তার খড়বিচালির যোগান আমি দিতে পারছি কিনা এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। ওনী স্টিকল্যান্ডও ফিরে গেছে তার দোকানে, কেনেথ হান মাছ ধরায় ব্যস্ত। এরাই ছিল আমার সহযোগী। নেপথ্যে কে ওদের কী বলেছে জানি না, জানবার কথাও নয়—কিন্তু তারা আর আমার বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডায় জমায়েত হয় না!

বাদবাকি গোটা বার্জিয়ো এখন আমার বিপক্ষে, আর সে কথা জানাতে তাদের দ্বিধা নেই। ডাক্তারবাবু নিজে থেকেই টেলিফোন করে জানালেন--কাজটা আমি ভাল করিনি। বহিরাগত হিসাবে সংবাদপ্রেরণের সময় আমার আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল। ইতিমধ্যে পৌরসভার কর্তৃপক্ষ একটা হ্যান্ডবিল বিলি করেছেন, যার বক্তব্য, মবি জো জাতীয় সম্পত্তি। তাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে। মবি জোর মাধ্যমে বার্জিয়ো আজ বিশ্বের কাছে পরিচিত—বহু বিজ্ঞানী, ট্যুরিস্ট প্রভৃতি অনতিবিলম্বে এখানে আসবেন। বার্জিয়োবাসী যেন তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে—কারণ এভাবেই বার্জিয়োর উন্নতি হবে, এ দ্বীপের নানান অভিযোগের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে। বহিরাগত কোন-কোন লোক হয়তো বার্জিয়োবাসীর নামে কুৎসা রটনা করতে চাইবে—তাতে যেন ওরা উত্তেজিত হয়ে না-ওঠে।

আমি রোজই একবার করে অল্ডরিজেস পন্ডে যাই। দেখে আসি বন্দিনীকে। অধিকাংশ দিনই দেখি লোকজন নেই। দু'একদিন দেখা যায় দর্শনার্থী জমেছে। তারা আমাকে গ্রাহ্য করে না। দু'একবার ওরই মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন গিয়ে দেখি আবার দশ-পনেরটা ডোরি নিয়ে একদল ছোকরা এসেছে। স্পিডবোট নয়, নৌকা। তারা তিমিনীটার পিছু-পিছু নৌকা বাইছে। দেখলাম ওদের মধ্যে রয়েছে বারি রোজ। আমার পরিচিত লোক। বছর-দুয়েক আগে তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাওয়ায় সে আমার দ্বারস্থ হয়েছিল একটা দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে। আমারই তদ্বিরে সে তার বাজেয়াপ্ত লাইসেন্স ফেরৎ পায়, অথচ আজ সে আমাকে দেখে চিনতেই পারল না। আমি আবার নৌকাটা তার কাছাকাছি এনে বললাম, রোজ! দেখতে পাচ্ছ না অত বড় নোটিশ বোর্ডে কী লেখা আছে?

রোজ তার নৌকায় উঠে দাঁড়ালো। চীৎকার করে বললে "না। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পড়তে পারছি না! কেন? তুমি জান না আমি আনপড়?"

কথাটা মিথ্যে নয়। বারি রোজ নিরক্ষর, কিন্তু এটা তার মিথ্যা অজুহাত। আমি কিছু বলার আগেই সে যোগ করে, তবে সেজন্য কিছু যায় আসে না। আমি নৌকা নিয়ে কোথায় যাব, কোথায় যাব না, তা আমি নিজেই ঠিক করব। এ কারও বাপের খাস তালুক নয় যে নোটিশ টাঙালেই আমরা কেঁচো হয়ে যাব।

ঘটনাচক্রে মার্ডকের নৌকাটা এসে পড়ায় সে যাত্রায় ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল। আর-একদিন। পোস্ট অফিসের সামনে। উইন্ডো ডেলিভারি থেকে একগাদা চিঠি নিয়ে বেরিয়ে এসেই দেখা হয়ে গেল জিম ব্রোকারের সঙ্গে। জিমের সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ। বার্জিয়োতে বাড়ি কিনবার সময় সে আমাকে সাহায্য করে এবং

দালালি পায়। সচরাচর দেখা হলে, সেই এতদিন আমাকে প্রথমে অভিবাদন করত, আজ করল না। আমি বরং তাকে বললাম, কী খবর?

জিম জবাব দিল না। সে আমাকে দেখিয়ে থুথু ফেলল মাটিতে। প্রায় আমার জুতোর উপর।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি এটা কী হল জিম?

এটা হল তোমাদের মত মানুষের কুশল প্রশ্নের জবাব।

আমাদের মত মানুষ?

হ্যাঁ, যারা বিদেশী, বার্জিয়োতে আসে আমাদের নামে মিথ্যা কুৎসা রটাতে। দুনিয়ার কাছে আমাদের মাথা হেঁট করতে—

জিম ব্রোকারের হাত মুষ্টিবদ্ধ।

জিম বলশালী। লক্ষ করে দেখলাম, সে একা নয়। জর্জির দলের আরও দু'তিনজন দাঁড়িয়ে আছে ওর পিছনে। হয়তো ওরা লক্ষ করেছে রোজই আমি এ সময় ডাকঘর থেকে চিঠি নিতে আসি। হয়তো এ একটা সুপরিকল্পিত আক্রমণের ভূমিকা।

তুমি আর তোমার ঐ তিমি। তিমিটা মরবেই—কারও বাবার ক্ষমতা নেই ওকে বাঁচায় । তবে সে একা মরবে না, মরবে তুমিও! নেহাৎ যদি প্রাণে না-মর, এখানকার বাস তোমার ঘুচে যাবে। বুয়েছ?

কোন কথা না-বলে আমি স্থানত্যাগ করলাম। ওরা বোধ হয় হতাশ হল।

অদ্ভুত উদ্ধৃতিটা শুনিয়েছিল কিন্তু বার্টখুড়ো! আদ্যিকালের একটি ছড়া

' ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,

সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

অখ্যাত গাঁয়ের অচেনা কালো মেয়ের মত ঐ তিমিনীটার কথা কেউ জানত না—আমিই তার কথা জানিয়ে দিলাম গোঁয়ার খুনিটাকে! তার অনিবার্য পরিণতি নিদারুণ! দু'দিন পরেই শোনা যাবে চৌকিদারের মুখে 'যৌবন তার দলে গেছে, জীবন গেছে চুকে।' বার্টখুড়ো তাই আজ ঘরের কোণে বিনবিনিয়ে কাঁদে---অন্ধ কলুবুড়ির মত!

আর এ ছড়ায় ঢক্কানিনাদী সাংবাদিক মোয়াটের ভূমিকা? আমি বোধ করি ঐ 'জমিদারের বুড়ো হাতি হেলেদুলে চলেছে বাঁশতলায়, ঢঙঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।' হাতিটা বুড়ো—নিবীর্য, অসহায়! তার ঢঙঢঙানিতে বীররস নয়, করুণ সুরের অনুরণন! এ দুনিয়া এখন তিমিঙ্গিলদের অধিকারে।

'উপায় নাইরে, নাই প্রতিকার — বাজে আকাশ জুড়ে!'

কিন্তু না! একটানা দুঃখের ইতিহাসই যদি হত তাহলে হয়তো এ গল্প শোনাতে বসতাম না। ঐ যে প্রতিদিন পোস্ট অফিস থেকে ডাকের বান্ডিলটা নিয়ে আসি ওতেই থাকে আমার সান্ত্বনা,

আমার উৎসাহের উপাদান। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে চিঠি, চিঠি আর চিঠি। তাদের আমি চিনি না, জানি না, জীবনে কোনদিন তাদের চিনবও না। তারা জানতে চায়—তিমিটা কেমন আছে? তারা সনির্বন্ধ অনুরোধ করে আমি যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখি, তাকে মুক্তি দিই!

সাউথ আমেরিকার কোন অফিসের কর্মীদের ব্রিজ ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাকে একটি চেক পাঠিয়ে বলা হয়েছে—এই সামান্য দান আমি যেন প্রত্যাখ্যান না করি! টেক্সাসের কোন স্কুলের ছেলেমেয়েরা একটি অদ্ভুত চিঠি লিখেছে—তারা দশ সেন্ট করে চাঁদা তুলে দশ ডলারের একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়েছে। লিখেছে, "দশ ডলারে আর ক'টা হেরিংই বা হবে? তবু আমাদের নাম করে ঐ টাকায় কিছু হেরিং কিনে তিমিনীকে খাওয়াবেন। ওর বাচ্চা হলে আমাদের খবর দিতে ভুলবেন না যেন, আমাদের হাতে-

লেখা পত্রিকায় নিউ এ্যারাইভাল কলামে লিখতে হবে!” চিঠি শেষ করে আবার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে “প্লিজ স্যার! দেখবেন, ওকে যেন শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়।”

বার্জিয়োর টেলিফোন অপারেটার মেয়েটিও আর-একটি উদাহরণ। তাকেও আমি চিনি না, নাম জানি না, শুধু কণ্ঠস্বরই শুনেছি! অথচ সে যেভাবে নিরলস পরিশ্রমে লং-ডিস্টেন্স কলে আমাকে যোগাযোগে সাহায্য করছে, তা বিস্ময়কর। মেয়েটাকে ধন্যবাদ দেওয়ায় সে আমাকে বলেছিল, ভাববেন না স্যার, শুধু কর্তব্য বোধে এভাবে খাটছি! ঐ তিমিটাকে আপনার মত আমিও ভালবাসি।

সোমবার সকাল থেকে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে। আজ আর কোন জেলে নৌকা নিয়ে বার হয়নি। সকলের মত আমিও আটক পড়েছি রুদ্ধদ্বারের চৌহদ্দিতে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়! অটোয়াতে নৌরক্ষা বাহিনীতে আমার এক পূর্বপরিচিত বন্ধু আছে। তার সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে যোগাযোগ করে অনুরোধ করলাম তুমি আমাকে কিছু ডুবুরি পাঠাতে পার? সাউথ চ্যানেলের গভীরে, সাত-আট ফুট নিচে তারা কয়েকটা পাথরকে সরিয়ে দিতে পারে?

টেলিফোনের ও প্রান্তে বন্ধুবরের ভ্রূকুঞ্চনটা আমি স্বচক্ষে দেখতে পাইনি, কিন্তু কণ্ঠস্বরে মনশ্চক্ষে দেখতে পাই সেটা। বললে, তোমার মতলবটা কী বল তো ফার্লে?

রাতারাতি আমি সাউথ চ্যানেলের গভীরতা তিন-চার ফুট বাড়িয়ে দিতে চাই। পারবে? বন্ধু বললে, বুঝলাম। কাজটা হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু এ বুদ্ধি কিছুদিন আগে তোমার মাথায় এল না কেন? যখন তিমিটা ‘মবি জো' হয়নি?

তার মানে এ কাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার পক্ষে অসম্ভব?

সে কথা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে টেলিফোনে কোন আলোচনাও আমি করব না!

আমি জবাব দেওয়ার আগেই একটি মহিলা-কণ্ঠ শোনা গেল, এক্সকিউজ মি স্যারস্! ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আগামী তিন মিনিট আমি বধির!

বন্ধুবর একটু চমকে উঠে বলে, আপনি কে? আমরা কথা বলছি—ট্রাঙ্ক লাইনে...

‘জানি। আমি বার্জিয়োর অপারেটর! আমিও চাই তিমিটা মুক্তি পাক!’

ও! ধন্যবাদ! বন্ধু নিঃশব্দে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। আমাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না-দিয়েই। হয়তো এ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই! সে নৌবিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার।

একটা তিমির মুখ চেয়ে তিমিঙ্গিলকে চটাবে না; ‘উপায় নাইরে, নাই প্রতিকার, বাজে আকাশ জুড়ে।

টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে বসিয়ে সবে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি, তখনই আবার বেজে উঠল যন্ত্রটা। তুলে ধরতেই ও প্রান্তবাসী বললে, স্কিপার মোয়াট বলছেন? আমি ড্যাগ। অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে ধরবার চেষ্টা করছি শুনুন, আমি অল্ডরিজেস পন্ডের দিকে গিয়েছিলাম... একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে। ও আবার ডাঙায় উঠে পড়েছে। ওর গা দিয়ে রক্ত পড়ছে, ও...ও মারা যাচ্ছে...

মনে হল কে যেন একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিয়েছে আমার পাঁজরায়! কোনক্রমে সামলে নিয়ে বললাম, আমি.... আমি এখনই আসছি।

বর্ষাতিটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। রীতিমত ঝড়ই বইছে। ঘাটলায় একখানাও নৌকা নেই—মানে সারি-সারি নোঙর করা আছে, কিন্তু সমুদ্রে যাত্রা করার মত একটাতেও মাঝিমাল্লা নেই, তবু এগিয়ে গেলাম সেদিকে। দু'চারজনকে অনুরোধ করলাম। অনেকেই আমার উপর এখন চটা, কিন্তু সেজন্য নয়—এই দুর্যোগে কেউ যদি বাহির-সমুদ্রে যেতে না চায় তবে তাকে দোষ দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে

বার্টখুড়োর দ্বারস্থ হওয়া গেল। খুড়ো অবশ্য বৃদ্ধ—এই বর্ষণমুখর সমুদ্রে নৌকা চালাবার মত দৈহিক ক্ষমতা তার নেই, তবু জেলেপাড়ায় সে মাতব্বর। তার অনুরোধে কেউ হয়তো রাজি হয়ে যাবে।

খুড়ো আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনল। তারপর উঠে বসল। বললে, এই দুর্যোগে কেউ সমুদ্রে যাবে না ভালো-মানষের পো! তবে তোমাকে নিরাশ করব না। চল্ আমিই যাচ্ছি। খুড়ি দাঁড়িয়েছিল অদূরে। বললে, কিন্তু—

বার্টখুড়ো ঘুরে দাঁড়াল তার মুখোমুখি। হেসে বললে, ভয় নেই গো! সমুদ্র আমাকে নেবে না। ঠিক ফিরিয়ে দেবে। দেখছ তো আজ তিনকুড়ি বছর ধরে...

খুড়ি জানে—সমুদ্র তার সতীন বার্টখুড়োর কাছে সমুদ্র সুয়োরানি। সে রাক্ষসী ওদের সোনার সংসারকে ছারখার করে দিয়েছে। তবু খুড়োর ঐকান্তিক প্রেম অন্ধ। খুড়ি বাধা দিল না।

যথারীতি একটা পুটলি আর জলের বোতলটা নিয়ে এসে তুলে দিল খুড়োর হাতে।

অল্ডরিজেস পন্ডের পশ্চিম পাড়ে ওদের দেখা পেলাম। তিমিনী আর ড্যাগ। বসে আছে মুখোমুখি। তিমিনীটার দেহের বার আনা অংশ নরম বালির উপর। শুধু লেজটা জলে। ওর চোখদুটি বোজা। সমস্ত এলাকাটায় একটা দুর্গন্ধ! এ গন্ধ আমি চিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমল থেকে এ গন্ধ লেগে আছে আমার নাকে। গ্যাংগ্রীণ হয়ে-যাওয়া গলিত ক্ষতের গন্ধ! তিমিটার মুখের কাছে একটা গলগলে কাদা—তাতে বিজ-বিজ করছে মরা হেরিং—মানে ডাঙ্গায় উঠে বেচারি বমি করেছে। ওর পিঠে সেই সাত-আট ফুট লম্বা ক্ষতটায় পুঁজ জমেছে! ও অসুস্থ। বোধহয় এখানে নিশ্চিন্তে মরতে এসেছে।

ওর সামনে বসেছিল ড্যাগ হান। কখন সে এসেছে কে জানে? বসে আছে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। এতক্ষণে বৃষ্টিটা ধরেছে। ত্রিসীমানায় জনমানব নেই। ড্যাগের জামা-প্যান্ট কাদামাখা, সপসপে ভিজে। বার্টখুড়ো এগিয়ে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখল। ডগ উঠে দাঁড়ায়। বলে, খুড়ো! ও আমার কথা শুনছে না! ও..ও বোধহয় বাঁচতে চায় না...

খুড়ো মাথাটা নাড়ল। এগিয়ে গেল। তিমিটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কার ওপর অভিমান করছিস দিদি? এরা যে মানুষ। যা! জলে নেমে যা! মরতে তোকে হবেই। বাচ্চাটাকেও বাঁচাতে পারলি না--তবে এ ভিন্নদেশে মরবি কেন পাগলি? যা, লক্ষ্মী দিদি! নিজের ঘরে যা—

যেন অভিমানী নাতনিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শশুরবাড়ি পাঠাচ্ছে!

আমি ততক্ষণে এগিয়ে গেছি ওর পাখনার দিকে। ওর সারা গায়ে বসন্তের গুটির মত বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। ভেবেছিলাম তাতে তার কোন ক্ষতি হয়নি। ভুল ভেবেছিলাম। ক্ষতি হয়েছে। আঘাতে নয়। জীবাণুর আক্রমণে। প্রতিটি ক্ষতের মুখে পুঁজ জমেছে। বিশালতম জীবকে কাবু করেছে ক্ষুদ্রতম জীবাণু। পাখনার ঠিক পাশেই কী যেন চিকচিক করছে। আগেও এটা দূর থেকে লক্ষ করেছি। আমি দুই হাতে সেটা চেপে ধরে সমূলে উৎপাটিত করলাম। একটা এ্যালুমিনিয়ামের তীর। তাতে কী যেন লেখা আছে। কোন তিমিবিজ্ঞানীর নিক্ষিপ্ত তীর!

হঠাৎ আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। নীল আকাশের বুক চিরে বার হয়ে এল একটা এয়ারোপ্লেন। পরে জেনেছিলাম, সেটা ফিল্ম কোম্পানির উড়োজাহাজ। ওরা কোথাও নামতে পারছিল না যন্ত্রপাতি নিয়ে। এখানে এয়ারস্ট্রিপ নেই—নামতে হবে ফাঁকা মাঠে। প্লেনটা অল্ডরিজেস পন্ডের উপর চক্রাকারে পাক খেতে থাকে তারপর নেমে আসে খুব নিচে। ক্যামেরাম্যানকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা জুম করে সে আমাদের মুভিশট নিচ্ছে— দুর্লভ দৃশ্য! ডাঙার উপর তিমিটা, আর ঘাটে তিনটে গাঁওয়ার। সে সময়ে যদি আমার হাতে রাইফেল থাকত, তবে আমি হয়তো আত্মসংবরণ করতে পারতাম না।

প্লেনটাকে গুলি করতাম!

প্লেনটা যখন ফিরে গেল, তখন দেখি তিমিনী চোখ মেলে তাকিয়েছে। প্লেনের শব্দে আমাদেরই কানে তালা লেগেছে—ওর কর্ণপটাহ বোধহয় এতক্ষণে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

খুড়ো জলকাদার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসল। তিমিটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, দেখলি তো দিদি, ওরা তোকে এখানে শান্তিতে মরতেও দেবে না যা লক্ষ্মীসোনা, যা, আর পাগলামি করিস না-নিজের ঘরে যা!

কী বুঝল তা ওই জানে। ঠিক সেদিনের মত ও তিল-তিল করে মুখ ঘোরাল। তবে আজ ও রীতিমত অসুস্থ। অতি কষ্টে যেন বুড়ো দাদামশায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধের মর্যাদা রাখতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ধীরে-ধীরে ফিরে গেল অল্ডরিজেস পন্ডে।

ফিরবার জন্য নৌকায় উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ হাত-পঞ্চাশ দূর থেকে সে ডেকে উঠল It was the same muffled, disembodied and unearthly sound, seeming to come from an immense distance, out of the sea, out of the rocks, out of the air itself!

সেই রুদ্ধকণ্ঠের দেহাতীত অপার্থিব আর্তনাদ -- যেন বহু-বহু দূর থেকে ভেসে এল। মনে হল, সে শব্দ আসছে সমুদ্রের অন্তরাত্মা থেকে, অথবা পাহাড়ের বুক ভেদ করে, কিংবা মহাকাশের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে।

সেই শেষবার তার ডাক শুনলাম।

ও কি বিদায় সম্ভাষণ জানাল?

কোথাও কিছু নেই, পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু টেলিফোন করলেন। আমাকে ওনী স্টিকল্যান্ডের কাছে শুনলাম, তিমিটা নাকি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওর কথা শুনে মনে হল সেপটিসিমিয়া, মানে ঘা সেপটিক হয়ে গেছে। আমরা দু'জন কোন সাহায্য করতে পারি? এতটা আশা করিনি। মিসেস ডাক্তার স্থানীয় পৌরসভার হেলথ অফিসার। কর্তা-গিন্নি দু'জনেই আমার উপর চটা—খবরের কাগজে বার্জিয়োর কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে দেওয়ায় । তাহলে এভাবে আমাকে টেলিফোন করার মানে? যেহেতু স্মলউড আমাকে ঐ তিমির রক্ষক বলে ঘোষণা করেছেন?

বললাম, সাহায্য করতে পারেন কি না তা তো আপনারাই ভাল জানেন। হ্যাঁ, ক্ষতগুলো সেপটিক হয়ে গেছে। পুঁজ পড়ছে, কোনরকম চিকিৎসা সম্ভব?

চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। মুশকিল হচ্ছে এখানকার হাসপাতালে যথেষ্ট এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ নেই। দেখুন না একটু চেষ্টা করে? বাইরে থেকে আনানো যায় কি না। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করে দেখছি।

কাল রাত্রেই আমি আর-একটা প্রেস রিলিজ-এর খসড়া তৈরি করে রেখেছিলাম। লিখেছিলাম, তিমিটা ইনফেকশন থেকে মারা যেতে বসেছে। স্থানীয় বাহাদুরেরা দশ দিন আগে যে-বীরত্ব দেখিয়েছেন, এতক্ষণে তার বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। উপসংহারে আরও বলেছিলাম, বার্জিয়োর ঐ বীর ছাড়াও দুনিয়ায় মানুষ আছে, তাঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন? এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ, ইনজেকশন সিরিঞ্জ পাঠিয়ে।

কাগজখানা আমি বাড়িয়ে ধরলাম ক্লেয়ারের দিকে। বললাম, এটা প্রেসে পাঠাচ্ছি। তুমি একবার দেখলে?

একবার চোখ বুলিয়েই শিউরে উঠল ক্লেয়ার। বললে, ফার্লে! না। এ বিবৃতি তুমি কিছুতেই পাঠাতে পার না। এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে তোমার বিদ্বেষ, তোমার ঘৃণা। ওদের ঐ রাইফেলের গুলির মত গোটা বার্জিয়োকে এগুলো বিদ্ধ করবে। প্লিজ—এটা নয়। তুমি শান্ত হও। নতুন করে লেখ!

ক্লেয়ারের পরামর্শ মেনে নিয়েছিলাম। নতুন করে রিপোর্টটা তৈরি করলাম। অনেক

মোলায়েম ভাষায়। টেলিফোনে লং ডিস্টেন্স কল বুক করতেই অপারেটার মেয়েটি বললে, এখনই দিচ্ছি স্যার, তিমিটা কেমন আছে?

বললাম, সেই খবর জানাবার জন্যই লাইনটা চাইছি।

টরেন্টো অফিসের সংবাদ সংস্থার অফিসার আমার রিপোর্ট শুনে বললে, নিশ্চিন্ত থাক, কার্লে। কাল সকালে প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় এ খবর ছাপা হবে। তাই হল। কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক কোটি পাঠক পরদিন খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় পড়ল

"মবি জো-র রক্ষক আজ রাত্রে একটি জরুরি আবেদন প্রচার করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন, বুলেটের আঘাতে বন্দিনীর দেহে যে ক্ষত হয়েছিল সেগুলি সেপটিক ঘায়ে পরিণত হচ্ছে।

ফার্লে মোয়াট-এর মতে তিমিনী অত্যন্ত অসুস্থ। স্থানীয় ডাক্তার-দম্পতি চিকিৎসার ভার নিতে রাজি। অভাব ওষুধের। ওদের প্রয়োজন, আট ডোজ ইনজেকশন—প্রতি ডোজ একশ যাট গ্রাম টেট্রাসিলিন হাইড্রোক্লোরাইড। একটা প্রকাণ্ড সিরিঞ্জও চাই—যাতে অন্তত তিন পাঁইট ওষুধ ধরে। উপযুক্ত স্টেনলেস স্টিলের সূচও চাই, অন্তত দেড় ফুট লম্বা সূচ।

পত্রিকা প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একের পর এক ফোন আসতে থাকে। মন্ট্রিয়েলের এক ঔষধের নির্মাণকারক জানালেন, আটশ গ্রাম এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ একটি প্লেনে করে পাঠাচ্ছেন। ব্রন্স চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ জানালেন, অত বড় সিরিঞ্জ তাঁর আছে, যেটা একটি চাটার্ড প্লেনে এদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ভ্যাঙ্কুভার এ্যাকোরিয়াম-এর বড়কর্তাও জানালেন, প্রার্থিত সূচ প্রেরিত হচ্ছে। সেন্ট জন থেকে একজন প্রথিতযশা ভেটিরিনারি সার্জেন টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন—তিনি নিজ-ব্যয়ে এদিক পানে রওনা হচ্ছেন, উড়োজাহাজে। সন্ধ্যার মধ্যে এত টেলিগ্রাম আর টেলিফোন এল যে আমরা বিহ্বল হয়ে গেলাম। ডক্টর শোভিল, সেই অতিবিখ্যাত জীববিজ্ঞানীটির টেলিফোনও এল, তিনি একটি চার্টার্ড প্লেনে বার্জিয়োতে এসেছিলেন, কিন্তু নামতে পারেননি। প্লেনটি অবতরণের উপযুক্ত ফাঁকা মাঠ পায়নি। বৃদ্ধ বলেছিলেন, যন্ত্রপাতিসমেত তাঁকে প্যারাসুটে বেঁধে অল্ডরিজেস পন্ডের ধারে ফেলে দিতে। বৈমানিক রাজি হয়নি। টেলিফোনে তিনি জানালেন, এবার হেলিকপ্টার নিয়ে তিনি আসছেন।

কাল থেকে যে যে দুর্মনস্যতায় ভুগছিলাম, বলুন, এর পর সেটা থাকে? আমি তো তবু তিমিটাকে চোখে দেখেছি, তার ডাক কানে শুনেছি, কিন্তু ওঁরা? ওঁদের এই উৎসাহ, ভালবাসা, মানবিকতার উৎস কোথায়? পৃথিবীতে যদি জর্জির মত মানুষ থাকে, তবে ডক্টর শোভিল-এর মত বৈজ্ঞানিকও আছে। সত্তর বছরের বুড়ো। প্যারাসুট নিয়ে জীবনে প্রথমবার লাফ দিতে চায়! কেন? একটা তিমিকে বাঁচাতে। ধীরে-ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। এত-এত মানুষের শুভেচ্ছা আছে আমার পিছনে! না, হার মানব না কিছুতেই। বাঁচাতেই হবে বার্টখুড়োর ঐ নাতনি অথবা নাতবৌকে। শুধু বাঁচাতে নয়—তাকে মুক্তি দিতে হবে, না-হলে টেক্সাস স্কুলের সেই ছেলেগুলো— যারা টিফিন-খরচ থেকে বাঁচিয়ে দশসেন্ট করে চাঁদা দিয়েছে, তারা আমাকে ক্ষমা করবে না।

রাত বারটা নাগাদ ফোন করলেন খোদ মেয়রসাহেব, জেগে আছেন দেখছি। এইরকমই আশা করেছিলাম, আপনার কি আজ রাতে ঘুম হতে পারে? দারুণ কাণ্ড বাধিয়েছেন মশাই আপনি। পৃথিবীর মানচিত্রে বার্জিয়োটাকে আজ সবাই খুঁজছে! বুঝেছেন, আর হপ্তাখানেক এই ভাবে চালাতে পারলে মনে হয় খোদ স্মলউডই এখানে উড়ে আসবেন। কী বলেন? শরীর-মন ক্লান্ত। জবাবে বললাম, এই কথা জানাতেই মধ্যরাতে ফোন করছেন?

আরে, আপনি রাগ করছেন নাকি? না মশাই, না!... তিমিটার খোঁজখবর নিচ্ছি।

আমি কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি না জানতে চাইছি।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলি, পারেন। মনে হয় ভোর রাত্রেই এদিকে আন্দাজ পাঁচটা চার্টার্ড প্লেন এসে পৌঁছবে! যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র এবং বিশেষজ্ঞরা এসে যাবেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করার দায়িত্বটা নিন। কে কোথায় থাকবেন...

নিশ্চয় নিশ্চয়। ওঁরা বার্জিয়োর অতিথি-

মুখে এল বলি, যেমন দু সপ্তাহ আগে তিমিটা ছিল বার্জিয়োর অতিথি। বললাম না সে কথা! বরং যোগ করি, দ্বিতীয়ত আপনার পৌরসভায় কোন রাত্রের প্রহরীকে অল্ডরিজেস পন্ডে পাঠিয়ে দিন। তিমিনীকে সর্বদা নজরবন্দী রাখা দরকার। মার্ডক দিনের বেলা ছিল, সে রাত্রে বিশ্রাম নিক। আপনার লোককে বলবেন, কোন খবর থাকলে যেন আমাকে তৎক্ষণাৎ ফোন করে!

শিওর, ফার্লে। তুমি কিছু ভেব না। আমি নিজেই যাচ্ছি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এ দায়িত্ব আর কারও উপর দিতে ভরসা হয় না।

মেয়রসাহেব আমাকে নাম ধরে ডাকার অন্তরঙ্গতায় আজই প্রথম এলেন।

আবার একটি নিদ্রাহীন রাত্রি। শুধু আমার নয়, ক্লেয়ারেরও। সমস্ত দিনের উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো এমন চড়া তারে বাঁধা যে ঘুম এল না। দুজনে মুখোমুখি বসে কাটিয়ে দিলাম রাতটা, প্রভাতের প্রতীক্ষায়। ক্লেয়ার বারে বারে কফি করে আনল। এ তো তিমির রাত্রি নয়, তাই প্রভাত হল। মুখে-চোখে জল দিয়ে প্রাতরাশের আয়োজন করলাম দু'জন। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘমুক্ত প্রভাতে একটা খুশির আমেজ। রোদ উঠেছে ঝলমলে। আকাশটা কী নীল!

দু'জনে সকাল-সকাল বসেছি প্রাতরাশ সেরে নিতে, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। মেয়র সাহেব বললেন, ফার্লে? আমি এইমাত্র খবর পেলাম, মবি জোকে আজ সকাল থেকে আর দেখা যাচ্ছে না।... সকালে একটি লোক এসে বললে, দু'ঘণ্টার মধ্যে সে একবারও নিঃশ্বাস নিতে ওঠেনি।... বুঝলে? রাত্রেই সে যেমন করে হোক পালিয়ে গেছে।... এখন আমরা কী কৈফিয়ৎ দেব?

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, কৈয়িফং। কীসের কৈফিয়ৎ?

বাঃ। মবি জো যে পালিয়ে গেল, তার জন্যে।

না। সে পালায়নি! বুঝলে? সে মারা গেছে?

মারা গেছে! মানে?

জবাব দেবার মত মেজাজ আমার নেই। পালাবার ক্ষমতা থাকলে সে অনেক-অনেক আগে পালিয়ে যেত। এখন সে অসুস্থ–সারা গায়ে দগদগে ঘা——এখন যদি দু'ঘণ্টা ধরে সে নিঃশ্বাস নিতে না-ওঠে তাহলে বুঝতে হবে, তার সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেছে। সে অল্ডরিজেস পন্ডের তলায় তলিয়ে গেছে।

পুরো দু'মিনিট কেটে গেছে। মেয়রসাহেব এবং আমি দু'প্রান্তে দু'জনেই নির্বাক। টেলিফোনটা যে কান থেকে নামিয়ে রাখা হয়নি তা টের পেলাম আবার তিনি কথা বলে ওঠায়। মিস্টার মোয়াট। এ হতে পারে না। মবি জো ওভাবে মরেনি—সে কাল রাত্রে মুক্ত সমুদ্রে ফিরে গেছে! প্লিজ! মেনে নিন আমার কথা।

বেশ বুঝতে পারি, মেয়রসাহেব রীতিমত ভয় পেয়েছেন। অন্তরঙ্গ সম্বোধন আর নেই গলাটা কাঁপা কাঁপা।

বললাম, মেয়রসাহেব, আমি মেনে নিই বা না-নিই, কিছু যায় আসে না। সে মেনে নেবে না, নিতে পারে না।

সে! সে কে?

সেই গর্ভিণী হতভাগিনী। তার সত্তর ফুট লম্বা, আশি টন ওজনের দেহটা নিয়ে সে

ভেসে উঠবেই। আপনার মিথ্যার চাদর দিয়ে তার অত বড় দেহটা ঢাকবেন কেমন করে?

আপনি বুঝতে পারছেন না! ভেসে উঠতে তার দু'তিন দিন কেটে যাবে। তার আগেই বহিরাগতরা সব ফিরে যাবেন, যদি আমরা প্রচার করি তিমিটা পালিয়ে গেছে। কী আশ্চর্য! কথা বলছেন না কেন? বুঝছেন না? এত কাণ্ডের পরে যদি বলি, আমরা তিমিটাকে খুন করেছি তবে ওরাও আমাদের খুন করবে!

বললাম, এতক্ষণে আপনি একটা খাঁটি কথা বলেছেন। হ্যাঁ, তাই করবে! ওরা আপনাদের খুনই করবে। কিন্তু খুনোখুনি খেলার সেটাই তো নিয়ম মেয়রসাহেব! দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ! তাই নয়?

ভেবেছিলাম, এত বড় অপমানের পর উনি টেলিফোনটা নামিয়ে রাখবেন, অথবা গাল পাড়বেন। কোথায় কী? উনি উল্টে বিনীতভাবে শুরু করলেন, প্লিজ মিস্টার মোয়াট। খবরটা কেউ জানে না। আপনার কথা সবাই মেনে নেবে। এ অপরিসীম লজ্জার হাত থেকে আপনি বার্জিয়োকে রক্ষা করুন! এ তো আপনারও শহর।

না!—আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিই—এ শহর আর আমার নয়। আমি দু'সপ্তাহ ধরে একঘরে হয়ে আছি। চলে যাইনি, ঐ তিমিটার জন্য। সে আমাকেই মুক্তি দিয়ে গেল। হয়তো ওর মৃতদেহ ভেসে ওঠার আগেই আমরা চলে যাচ্ছি.....

ওঁকে জবাব দেবার সুযোগ না-দিয়ে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

ক্লেয়ার এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একখানা হাত রাখল। বললে, সেই ভালো। চল, আমরা আবার বেরিয়ে পড়ি। এ কয়দিন যে কীভাবে কেটেছে....

আমি জানি। একটিও প্রতিবেশী আমাদের বাড়িতে আসেনি। পথেঘাটে দেখা হলে কেউ মুখ তুলে তাকায়নি—এমনকি আমার দলে যারা ছিল এতদিন, যারা রোজ সকাল-সন্ধ্যা এসে বসত আমার বৈঠকখানায়। কেনেথ, সিম, ড্যগ, বার্টখুড়ো, ওনী, ঐ ধোপানি, মুদি, রুটিওয়ালা, পোস্টম্যান—কেউ না! শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লেয়ার এতদিন নীরব ছিল; এখন আমার মুখ থেকে শুনেই সে তার মনোগত ইচ্ছাটা জানিয়ে দিল।

বললাম, না ডার্লিং, কিছুদিনের জন্য বেরিয়ে পড়তে আমি রাজি নই। বার্জিয়ো ত্যাগ করে যাব চিরকালের জন্য। বাড়িটা বেচে দেব। এদের সঙ্গে আর জোড় লাগবে না। আমরা ওদের চোখে আজ অবাঞ্ছিত।

আবার বেজে উঠল টেলিফোন। তুলে নিয়ে বললাম "মোয়াট।"

আমি স্যার, টেলিফোন অপারেটার।... এতক্ষণ শুনছিলাম আপনার সঙ্গে মেয়র সাহেবের কথোপকথন... মানে, ওটা কি সত্যিই...?

হ্যাঁ, মারা গেছে! আপনি আবার আমাকে লঙ্-ডিস্টেন্স লাইন দিন। টরোন্টো প্রেস। যাঁরা এখনও রওনা হননি, তাঁদের বারণ করতে হবে! ওষুধ, সিরিঞ্জ, তিমি-বিশেষজ্ঞ কারও আসার দরকার নেই। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেছে এখানে—

মেয়েটি করুণ স্বরে বললে, দিচ্ছি স্যার!... কিন্তু.. কিন্তু ও কি সত্যিই মারা গেছে? আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। চিৎকার করে উঠলাম, " She is dead, d'you hear me! Christ! Do I have to rub your face in her stinking corpse to make you understand? [হ্যাঁ, মরে ভূত হয়ে গেছে। কথাটা কানে ঢুকল? হায় ভগবান! তোমার মুখটা ওর গলিত মৃতদেহে ঘষে না-দেওয়া পর্যন্ত কি ব্যাপারটা তোমার মগজে ঢুকবে না?]

ক্লেয়ার আস্তে করে তার হাতখানা আমার পিঠে রাখল আবার। ক্লেয়ার জানে –ঐ লোকটা, টেলিফোনে যে অভদ্র ভাষায় অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে অসভ্যতা করছে সে ওর স্বামী নয়। আমার চোখের জল তখন টেলিফোনের মাউথপিসে গড়িয়ে পড়ছে

টপটপ করে। মেয়েটিও বুঝল সে কথা। আমার কণ্ঠস্বরে। রাগ করল না একতিল। জবাবে সেই অপরিচিতা এই প্রথম আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করল, নাম ধরে ডাকল। বললে, বিশ্বাস কর মোয়াট! এখন সেই ইচ্ছাটাই জাগছে আমার মনে! ওর ঐ গলিত মৃতদেহে মুখ ঘষে বলতে— 'তুমি আমাদের ক্ষমা করে যাও!'

বোধ করি ও পক্ষের মাউথপিসেও জমেছে কয়েক ফোঁটা জল। সে-ও আজ দু'সপ্তাহ দিবারাত্র পরিশ্রম করে গেছে আমাদের মত। বেচারি।

সকালটা গেল টেলিফোন আর টেলিগ্রাম করতে। কিছু লোক হয়তো ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে পড়েছে—তাদের ভোগান্তিই সার হবে। যারা হয়নি, তাদের রুখবার চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে টেলিফোনে খবর পাচ্ছি অল্ডরিজেস পন্ডে তিমিনীর মৃতদেহ ভেসে ওঠেনি। খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দ্বীপের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। ক্লেয়ার ব্যস্ত ছিল বাঁধাছাঁদায়। কাল বেলা আড়াইটেয় একটা ফেরি স্টিমার আছে। তাতেই রওনা হয়ে যাব। প্রথমে মন্ট্রিয়েল। সেখানে পৌঁছে স্থির করব, কোথায় যাব। এখন মনটা এত উত্তেজিত যে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করার চেষ্টা বৃথা। লক্ষ একটাই। রাত পোহালে বার্জিয়ো ত্যাগ করে যাব—আর ফিরব না কোনদিন। না, আর একবার আসতে হবে, সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে যেতে।

আজ আকাশ পরিষ্কার। ঘাটলায় একটা ডোরিও নেই। সবাই মাছ ধরতে বেরিয়েছে। অথবা, কী জানি কে কোথায় আছে!

আমরা খবর রাখি না, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ততক্ষণে কম্পোজ সারা, রোটারি মেশিনে ছাপা হচ্ছে। সংবাদ! কাল তা বাজারে ছাড়া হবে।

"সেন্ট জন্স, নিউফাউন্ডল্যান্ড, ৪ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আজ জানিয়েছেন, অল্ডরিজেস পন্ডে 'মবি জো'-র সব যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। গতকাল থেকে সে আর নিঃশ্বাস নেবার জন্য ভেসে ওঠেনি। সংবাদে প্রকাশ, তার পলায়ন সম্ভবপর ছিল না- -ফলে অনুমান করা হচ্ছে, সে মারা গেছে।

"মুখ্যমন্ত্রী এ জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, মানুষের যতটুকু সাধ্য তা করা হয়েছিল। তবু তাকে বাঁচানো গেল না।"

আজকেও সারাদিনে কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা হল না কোন সূত্রে। আমাদের বাড়ির সামনে একটু ফাঁকা মাঠমত আছে, সেখানে আশপাশের জেলেপাড়ার ছেলেগুলো রোজ খেলতে আসে। আশ্চর্য! আজ তারাও আসেনি। হয়তো বাবামায়ের নিষেধে। মানুষের সাড়াশব্দ পেলাম শুধু টেলিফোনে — তাও অধিকাংশই বহু দূরদেশের মানুষ। তাদের সঙ্গেও বন্ধন একে-একে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তিমিনীর মৃত্যুসংবাদে একে-একে বাঁধন কাটছে।

সন্ধ্যা নাগাদ ক্লেয়ারকে বললাম, তুমি একটু অপেক্ষা কর, পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে আসি—আর কোন চিঠিপত্র এসেছে কি না। ক্লেয়ার বললে, দেরি কর না, কাল তো সারারাত ঘুম হয়নি তোমার...

বাধা দিয়ে বলি, শুধু আমার?

ক্লেয়ার ম্লান হাসল। বললে, না। আমাদের দু'জনেরই। আজ সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ব। কাল তো যেতে হবে।

তৈরি হয়ে বের হতে যাব, ক্লেয়ার বললে, একটু ধর তো, এটাকে টাঙিয়ে দেব। লক্ষ করে দেখি, সে ইতিমধ্যে একটা 'নোটিশ বোর্ড' লিখেছে। দু'জনে মিলে সেটাকে ধরে টাঙিয়ে দিলাম সদর দরজার উপর -

'এই বাড়ি বিক্রয় হবে।'

পোস্ট অফিসের পথটা বাজারের মধ্যে দিয়ে। জনবিরল নয়। এই রৌদ্রোজ্জ্বল

বিকালে, পথে লোকও বড় কম নয়। অনেকেই আমার পরিচিত। বেশ বুঝতে পারি, তারা আমাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। কেউ-কেউ মামুলি নমস্কার করছে। হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গেলাম জর্জির দলের। পাঁচ-সাতটি ছেলে এবং প্রায় সমসংখ্যক মেয়ে। দল-বেঁধে তারা কোথায় চলেছে। আমরা বিপরীতমুখে চলেছি। ওদের মুখে চাপা হাসি।

ওদের পাশ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পরই শুনতে পেলাম একটা উচ্চ হাস্যরোল। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। পিছন ফিরি না কিন্তু। সেখানে থেকেই শুনতে পেলাম মেয়েলি গলায় একটা সমবেত সঙ্গীত--চাপা গলায়, তবে এত অনুচ্চ নয় যে আমার কর্ণগোচর হবে না।

"Moby joe is dead and gone...

Farley Mowat, he won't stay long ..."

[মবি জো তো ফৌৎ হল, হায় কী সর্বনাশ!

ফার্লে মোয়াট, ঘুচল তোমার বার্জিয়োতে বাস।]

পোস্ট অফিসের দিকে আর যেতে মন সরল না। জনাকীর্ণ পথ ছেড়ে একটা নির্জন টিলার মাথায় উঠে গেলাম---সূর্যাস্ত দেখব বলে। বস্তুত একেবারে নির্জনে নিজের মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত কাটাতে চাই।

টিলার মাথাটা নির্জন। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়। তিনশ বছর আগে এখানে বসে ক্যাপ্টেন জেমস কুক তাঁর মানমন্দির থেকে শুক্রগ্রহের গ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

পাহাড়ের মাথায় অনেক অনেকক্ষণ বসে রইলাম। পরাজয়টা শেলের মত বুকে বিঁধে আছে। তারপর ধীরে-ধীরে একটা সত্য যেন আমার সামনে প্রতীয়মান হল। মনে হল, সব কিছু বুঝি বৃথা যায়নি। এই পরাজয়, এই অপমান, এটুকুই সব নয়--আমার লোকসানের পুঁজিটাকেই বা এত বড় করে দেখছি কেন? লাভ কি কিছুই হয়নি? ব্রীজ ক্লাবের সেই অচেনা ছেলেগুলো? টেক্সাস স্কুলের বাচ্চা ছেলের দল? আর ঐ অপরিচিতা টেলিফোন অপারেটার, যে হতভাগিনী তার প্রসাধন করা মুখখানা ঐ তিমিনীর গায়ে ঘষতে চায়?

তবুও দু চোখ জলে ভরে আসে কেন? চতুর্দিক ঘন অন্ধকার... কেউ জানতে পারবে না, আমি কাঁদছি। কিন্তু কেন? আমি তিমিনীর জন্যে কাঁদছিলাম না, কাঁদছিলাম মানুষের সঙ্গে জীবজগতের বিচ্ছেদ ঘটে গেল বলে। বার্জিয়োর সঙ্গে বিচ্ছেদ—হ্যাঁ সেটাও বেদনাবহ; কারণ ক্লেয়ার আর আমি দু'জনেই এ দ্বীপটিকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। এখানকার ঐ সরলমূর্খ জেলেদের। কিন্তু না, সে বিচ্ছেদের চেয়ে বেশি করে বুকে বিঁধছিল একটা কথা মানুষ আজ পৃথিবীর ঈশ্বর হয়ে সমস্ত জীবজগৎকে পদানত করতে চায়! তুমি এত-এত উন্নতি করলে, অথচ পাশবিকতাকে অতিক্রম করতে পারলে না?

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর উঠে পড়লাম। ধীরপদে ফিরে এলাম বাড়িতে। ফেরার পথে কাদের সঙ্গে দেখা হল লক্ষ করে দেখিনি। তারা অভিবাদন জানিয়েছিল কি না তা-ওঁ জানি না। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি, আমি শুধু তাকিয়েছিলাম আমার টর্চের আলোর দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে প্রথমেই লক্ষ পড়ল সদর দরজার উপর। সেই নোটিশটা নেই। কে বা কারা ইতিমধ্যেই সেটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। প্রচণ্ড রাগে আমি ভিতরে-ভিতরে জ্বলে উঠি। এরা ভেবেছে কী? এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেবে না। টাঙানো মাত্র নোটিশটা ছিঁড়ে দিয়েছে। এ কী অত্যাচার!

বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে একবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বৈঠকখানায় অন্তত বিশ-পাঁচিশজন মানুষ—বুড়ো-বাচ্চা-জোয়ান। পুরুষ ও স্ত্রী। সবাই মাটিতে বসেছে আসনপিঁড়ি হয়ে। সোফাসেটিতে কেউ বসেনি। শুধু বার্টখুড়ো বসে আছে প্যাকিং বাক্সে। ফায়ার-প্লেসে গনগনে আগুন।

আমাকে দেখেই বার্টখুড়ো বলে ওঠে, এই যে ভালো-মানষের পো। এত রাত হল যে ফিরতে? ওনী বললে তারপর খুড়ো? তোমার গল্পটা শেষ কর!

খুড়ো তৎক্ষণাৎ আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তার অসমাপ্ত কাহিনীর সূত্রটা তুলে নেয় হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমি তখন টমের বয়সী। দাদুর সাথে ডোরি নিয়ে সবে মাছ ধরায় যেতে শুরু করেছি—একদিন হয়েছে কী...

দেখলাম সবাই এসেছে—ওনী, কেনেথ, ড্যাগ, সিম, ও'নীল, ধোপানি, মুদি, পোস্টম্যান, অধিকাংশই সস্ত্রীক ও স-বাচ্চা! যেন আমার বাড়িতে কীসের উৎসব।

ক্লেয়ার আমাকে আড়ালে ডেকে বললে, ওরা এমন দল বেঁধে এসে জাঁকিয়ে বসল কেন বল তো? ওরা কিন্তু একসঙ্গে আসেনি, সন্ধ্যে থেকে গুটি-গুটি আসছে, আসছেই বললাম, নোটিশ বোর্ডটা কী হল? -

খুড়ো এসেই টান মেরে সেটা ছিঁড়ে ফেলেছে।

আগন্তুকেরা বেশিক্ষণ থাকল না। কেনেথ বললে, তোমাদের বিশ্রাম দরকার। আজ উঠি। কাল জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। খুড়ো বললে, ও হো, ভালো কথা মনে এল। ভালো-মানষের বেটি! আমার ঐ মেয়েমানুষটা বলেছে, কাল রাতে তোমরা আমার ওখানে খাবে। সামান্য আয়োজন...

ওনী স্টিকল্যান্ড হাসতে-হাসতে বলে, তা হোক সস্ ইজ দ্য বেস্ট হাঙ্গার! আশ্চর্য! তিমিনীর প্রসঙ্গ কেউ আদৌ উচ্চারণ করল না।

আমি ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। খুড়ো ওদের দিকে ফিরে বললে, তোমরা এগোও, আমি আসছি।

ওরা কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই খুড়ো আমার হাতটা চেপে ধরল। বলল, আমরা গরিব আমাদের উপর রাগ করতে নেই।

আমি বলি, কিন্তু এত কাণ্ডের পরে কি আমাদের এখানে থাকা উচিত?

কেন নয়? বার্জিয়োতে কি শুধুই বুনো শুয়োরের বাস? আমরা কি মরে গেছি? হেসে বলি, না, আজও সবাই মরিনি— চোখেই তো দেখলাম, তোমরা দলবেঁধে এসেছ আমার দুঃখের ভাগীদার হতে—তবে বেশিদিন টিকতে পারবে না খুড়ো। তোমাদের জেনারেশানই শেষ। এর পর বার্জিয়োতে থাকবে শুধু শুয়োরের পাল!

হতে পারে!—তাই বলে আগে থেকেই হার মেনে নেব কেন? লড়তে-লড়তে মরব। মনে হল আমার ঐ বৈঠকখানা ঘরটা যেন মেরুবলয়ের ক্রিলপাড়া। তিমিঙ্গিলের তাড়া খেয়ে আমার ফায়ারপ্লেসের চারিধারে ঘিরে বসেছিল নানা জাতের তিমি--ডানা তিমি, কুঁজি তিমি, বো-হেড, উত্তর অতলান্তিক, রামদাঁতালের দল। ওরা জানে, ওরা ফুরিয়ে আসছে। তিমিঙ্গিলের অব্যর্থসন্ধানী হারপুনবন্দুকে—তবু তারা আজও হার মানেনি। আর সেই গঙ্গা সাগরের ক্রিলমেলায় বার্টখুড়ো যেন এক এককসঞ্চারী নীল তিমি! উদাসী বাউলের মত তানপুরা হাতে একা-একা গেয়ে চলেছে বেলাশেষের গান। তিমি বনাম তিমিঙ্গিল! হারপুন গান বনাম তানপুরার গান।

পরদিন সকাল থেকে আমরা ব্যস্ত ছিলাম লটবহর খুলে ফেলায়। আমরা স্থির করেছি বার্জিয়ো ত্যাগ করে যাব না। কেন যাব? এ দ্বীপ তো শুধু শুয়োরের অধিকারে আজও যায়নি!

ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোন। ক্লেয়ার ছিল যন্ত্রটার কাছাকাছি। তুলে কী শুনল ---তারপর বস্ত্রটার কথা-মুখে হাত চাপা দিয়ে আমাকে বললে, “এতক্ষণে ভেসে উঠেছে।”

হুঁ। কে ফোন করছে?

ডাক্তার গিন্নি। তোমাকে খুঁজছে।

টেলিফোনটা টেনে নিয়ে আত্মঘোষণা করি : মোয়াট

আয়াম সরি মিস্টার মোয়াট। এইমাত্র খবর এসেছে তিমিনীর মৃতদেহ ভেসে উঠেছে... আমি দেখে এলাম।... এখন, এখন, আমরা কী করব?

তার আমি কী জানি?

বাঃ। আপনিই তো ওর 'কীপার'। সরকার-নিয়োজিত রক্ষক!

না! আপনি ভুল করছেন। আমি ছিলাম জীবিত তিমিনীর অভিভাবক! মৃত তিমিনীর দায়দায়িত্ব আমার নয়, আপনাদের। ওটা বার্জিয়োর সম্পত্তি।

আপনি বুঝতে পারছেন না। ওটা পচে গেলে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ হবে। এ অঞ্চলে একটা মহামারী দেখা দিতে পারে।

পারেই তো। আপনি হেলথ অফিসার, ব্যবস্থা নিন। আমাকে নয়, মেয়রসাহেবকে ফোন করুন।

শুনুন, শুনুন... লাইন কেটে দেবেন না! আপনি প্রেসে খবরটা জানিয়ে দিন। একটা রেডিও এ্যানাউন্সমেন্ট হওয়া দরকার। জনস্বাস্থ্যের কারণে ও এলাকাটা নিষিদ্ধ হওয়া দরকার, অল্ডরিজেস পন্ডের এক মাইলের মধ্যে কেউ যাবে না।

আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা উচিত হবে না। রাজি হয়ে গেলাম। প্রেসে খবরটা জানানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডিওতে সাবধানবাণী ঘোষিত হল অল্ডরিজেস পন্ড নিষিদ্ধ এলাকা।

তার ঘণ্টাখানেক পরে খোদ মেয়রসাহেব আমাকে ফোন করলেন, এ আপনি কী করেছেন? অল্ডরিজেস পন্ড নিষিদ্ধ এলাকা হলে যে কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়।

আমি বললাম, দেবেন। ঐ মৃতদেহটা গলে-পচে মিশে যেতে মাস দু'তিন লাগবে। মেয়র আতঙ্কে শিউরে ওঠেন কী বলছেন মশাই—তার মানে তো যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে। পালে-পালে শকুনের দল...

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বলি কী লাভ বলুন? তিমিটা তো মরেছেই। আমি কেন মাঝ থেকে শকুনের আনন্দে বাধা দিই...

আমার বক্রোক্তিটা বৃথা গেল! অথবা হয়তো 'গরজ বড় বালাই' বলে মেয়রসাহেব বুঝেও বুঝলেন না, না-বোঝার ভান করে আমাকেই উল্টে বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না.. দু'তিন মাস ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে... প্রচণ্ড লোকসান হয়ে যাবে—

এবার সহজ ভাষায় বলি, মেয়রসাহেব, এ চিন্তাটা হপ্তা-কয়েক আগে আপনার করা উচিত ছিল, যখন আমি আপনাকে বারে বারে অনুরোধ করেছিলাম ঐ জর্জির দলকে নিবৃত্ত করতে। আপনি সে কথায় কর্ণপাত করেননি। আর্মি এ্যামুনিশান ব্যবহার করাতেও আপনি বাধা দেননি।

মেয়রসাহেব থতমত খেয়ে যান, জবাব যোগায় না তাঁর মুখে। আমি যোগ করি 'এন্টশিয়েন্ট মেরিনারের' কথাটা মনে আছে মেয়রসাহেব? তাঁর কাঁধে ঝুলছিল একটা মৃত এ্যালবাট্রস। কতই বা ওজন ঐ পাখিটার? আর আপনি আশি টন ওজনের একটা ডানা তিমিকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ভোগান্তি তো একটু হবেই।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বার্টখুড়ো বললে, যেমন গবুচন্দ্র রাজা, তেমনি হবুচন্দ্র মন্ত্রী। সব ক'টি পণ্ডিতে মিলে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত হল? – না, তিন মাস ঐ কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। তা, হ্যাঁ ভালো-মানষের পো, এর চেয়ে সহজ বুদ্ধি আর কিছু বুঝি লেখা নেই তোমাদের কেতাবে?

ক্লেয়ার বললে, তুমি কোন বিকল্প ব্যবস্থা বাৎলাতে পার?

আলবং! এক ঘন্টার মধ্যে। যন্ত্রপাতি কিচ্ছু লাগবে না—আমি একাই ঐ আবাগীকে সাউথ-চ্যানেল পার করে দিয়ে আসব।

কেমন করে?

বার্টখুড়ো বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা—জীবিত তিমি আর মৃত তিমির ফারাকটা। এখন যদি সে ভেসে ওঠে তবে সেটা পচে ঢোল হয়ে উঠেছে—তার শরীরের সামান্য অংশই জলে ডুবে থাকবে। ওর লেজে একটা দড়ি বেঁধে যে-কোন ডোরি ওকে টেনে নিয়ে সাউথ চ্যানেলের অগভীর প্রণালীটা পার করে দিতে পারে।

ঠিক কথা। সেই মর্মে আবার জানিয়ে দিলাম মেয়রসাহেবকে!

আধ ঘণ্টা পরেই ডোরি নিয়ে রওনা হলাম আমরা।

ক্লেয়ার সে বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্য সঙ্গে এল না। ড্যাগ হানও কোথাও মুখ লুকিয়ে রইল। কেনেথ, বার্টখুড়ো আর স্টিকল্যান্ডকে নিয়ে আমরা চারজন রওনা দিলাম অল্ডরিজেস পণ্ডের দিকে।

আজ আর দর্শনার্থীর ভিড় নেই। যদিও আজ সাবাথ ডে। এই এলাকাটা এতদিনে সত্যিই নিষিদ্ধ হয়েছে। আকাশটা তেমনই গভীর নীল, অল্ডরিজেস্ পন্ডও নীলিমার চাদরমুড়ি দেওয়া।

চারিদিকে ঝলমলে রোদ, আর দূর আকাশে ভাসছে এক ঝাঁক সী-গাল। কিন্তু সেই জনমানবহীন প্রকৃতির রাজ্য আজ পূতি গন্ধময়।

আসবার পথেই দেখেছি মদ্দা তিমিটাকে। এখনও সে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে, আর মাঝেমাঝে মুখ তুলে কী যেন দেখছে। হয়তো সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চায় একটা ডাক— যে-ডাক বিয়ান গাইয়ের কণ্ঠস্বরের মত মাঝে-মাঝে তাকে উতলা করে তোলে। আজ দু'দিন সে বেচারা ঐ ডাকটা শুনতে পাচ্ছে না। ও কি বুঝতে পারেনি তার মর্মন্তুদ হেতুটা?

সাউথ চ্যানেল পার হয়েই দেখতে পেলাম তিমিনীকে। এখন সে চিৎ হয়ে ভাসছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে জয়ঢাকের মত। মুখটা জলের নিচে, শুধু শক্ত হয়ে যাওয়া হাতডানাদুটো মেলে ধরেছে আকাশপানে। যেন যুক্তকরে আকাশকে প্রণাম জানাচ্ছে। ওর তলপেটটা এতদিনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। অজাত সন্তানের ভারে বেচারি স্ফীতোদরা। তলপেটের কাছে স্তনের বোঁটা দুটোও শক্ত হয়ে গেছে। আকাশপানে মেলে দিয়েছে সেই যুগলস্তন—যার অমৃতধারা থেকে বঞ্চিত হল ওর অজাত সন্তান!

একটু পরেই সাউথ চ্যানেলের দিক থেকে এসে উপস্থিত হল একটা মোটরলঞ্চ। সেটা এগিয়ে গেল ঐ ভাসমান মৃতদেহটার দিকে। মাঝিমাল্লাদের নাকে রুমালবাঁধা। একজন একটা রশি বেঁধে দিল মৃতদেহটার লেজে।

টান পড়ল। তিমিনীর মুখ ঘুরল। লেজটা সমুদ্রের দিকে। মুখটা আমাদের দিকে। মোটর লঞ্চ চালু হল। তিমিনী এগিয়ে চলল অনিবার্য আকর্ষণে সাউথ চ্যানেলের দিকে।

যে সাউথ চ্যানেলের সংকীর্ণ পথ আপ্রাণ চেষ্টাতেও অতিক্রম করতে পারেনি, মৃত্যুর মহিমায় এখন সে তা অনায়াসে অতিক্রম করে গেল। কোথাও বাধল না তার দেহটা। অল্ডরিজেস পন্ড থেকে দেখতে পেলাম, বাহির-সমুদ্রে মদ্দা তিমিটা কাটা ছাগলের ধড়ের মত ঘাই দিয়ে উঠছে।

ঠিক তখনই দূর গির্জা থেকে ভেসে এল রবিবারের প্রার্থনাসভার আহ্বান —ঢং ঢং ঢং!

যেন ডেথ-নেল।

। গ্রন্থপঞ্জি ।

1. A Whale for the Killing,-Mowat, Farley.
2. Whales & Whaling-Budker, Pul.
3. The Life & Death of Whales - Burton, R.
4. The Whales -- Mathews, Dr. L. H.
5. Home is the Sea- Riedman, S. R.
6. The Path through Penguin City—Lillie, H. R.
7. Man & Dolphin -- Lillie, Dr. John C.
8. The Twilight Seas-Carrighar, Sally.
9. Bulletins of International Society for Protection of Animals.
10. Bulletins of Project Jonah, California, U. S. A.
11. National Geographic Magazine, Mar.'76 & Dec. '76.
12. The Reader's Digest, Aug. 78.

ব্যবহৃত পরিভাষা

অশ্ব অক্ষাংশ Horse Latitude
অষ্টাপদ Octopus
উচ্চ-উচ্ছায় High-pitched
উপবর্গ Sub-order
ঔদক Hydraulic
কুঁজি তিমি Humpback (Megapota)
গণ Genus
গর্জনশীল চল্লিশা Roaring Forties
গোত্র Family
জলগতিবিদ্যা Hydrodynamics
ঝিল্লিমুখো Baleen Whale (Myticeti)
ঠোঁটওয়ালা তিমি Beaked Whale (Ziphidae)
ডানা তিমি Fin Whale
তিম্যাদি Cetacian
তুণ্ড Snout
দক্ষিণ তিমি Right Whale
দাঁতাল Toothed Whale (Odontoceti)
নাক-বিকল্প Blow-Whole
নাড়ি Umbilical cord
নীল তিমি Blue Whale
নীলাভ তিমি Grey Whale
পাখনা Dorsal fin
প্রজাতি Species
প্রাকৃতিক নির্বাচন Natural selection
বর্গ Order
বোতলনাসা Bottle-nosed
ভরবেগ Momentum
মহীসোপান Continental shelf
মেরুবলয় Arctic circle
রামদাঁতাল Sperm Whale (Physelar Cotoden)
শূলনাসা Narwal
শ্রবণযন্ত্র Electronic sonar
রাক্ষুসে তিমি Killer Whale (Oreimus Orca)
সামুদ্রিক জীবাগার Ocanium
হাতডানা Flipper
সেঈ তিমি Sei Whale

ফার্লে মোয়াটের কাহিনীটি যে আপনাদের উপহার দিতে পারলাম এ জন্য লন্ডনপ্রবাসী আমার বন্ধুটি ধন্যবাদার্হ; সে কথা আগেই বলেছি। অনুরূপভাবে রচনা শেষ করার পরে এই পরিশিষ্টটুকু সংযোজনের সৌভাগ্যলাভ করলাম আর-একজন প্রবাসিনীর সৌজন্যে। মেয়েটিকে হয়তো আপনারা চিনবেন, যদি আমার 'পথের মহাপ্রস্থান' পড়ে থাকেন। রুদ্রপ্রয়াগে এক নিশীথরাত্রে যে ছোট্ট মেয়েটির ফ্রক চেপে ধরেছিলুম, লিখেছিলুম, "কোন্ দৈবশক্তির বলে যে আমি একলাফে এগিয়ে এসে ওর ফ্রক চেপে ধরেছি তা আজও জানি না। সেখান থেকে আর তিনটি কি চারটি পদক্ষেপ ছিল জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা।" সেই মেয়েটি বর্তমানে থাকে পৃথিবীর ঠিক অপর প্রান্তে, একশ আশি ডিগ্রি ফারাকে তার স্বামীর ঘরে। তিমি-বিষয়ে বই লিখছি শুনে সেই বুলবুল আমাকে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকার সভ্য করে দিয়েছে—ভারতীয় মুদ্রাসম্বল যা আমার পক্ষে ক্রয় করা নাকি বিলাসিতা। এ গ্রন্থের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি গত দু'বছরে প্রকাশিত ঐ আশ্চর্য পত্রিকা মারফৎ। ঐ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৯৭৯ Vol. 155, No. I) একটি অনবদ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যা গ্রন্থশেষে তিমি-দরদী পাঠককে উপহার না-দিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি না। তাই এই পরিশিষ্টের সংযোজন।

মনে আছে, কিছুদিন আগে যখন ফার্লে মোয়াটের সেই অনবদ্য পংক্তিটার অনুবাদ করেছিলাম—সেই যেখানে তিমির ডাক কী জাতের বোঝাতে উনি লিখেছেন, "Like a cow bawling into a big empty tin barrel" তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেই তিমির ডাক এ জীবনে স্বকর্ণে শুনবার সৌভাগ্য হবে। মাত্র কয়েক মাস পরে এ গ্রন্থ ছাপাখানা থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই দেখছি আমার সে ধারণা ভুল। তিমির ডাক —'ডাক' নয়, 'সঙ্গীত' স্বকর্ণে শুনবার সৌভাগ্য ইতিমধ্যেই হয়েছে—আপনাদেরও হতে পারে যদি একটু তৎপর হন!

জানুয়ারি সংখ্যা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকায় ড. রজর পাইনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে— "হাম্পব্যাকস্ দেয়ার মিস্টিরিয়াস্ সংগস'। প্রবন্ধলেখক সস্ত্রীক প্রায় এক দশক ধরে হাম্পব্যাক তিমির কণ্ঠস্বর টেপ রেকর্ড করে ফিরছেন—গানগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজাচ্ছেন, গোছাচ্ছেন, তা নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রবন্ধে সে বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে এবং ঐ সঙ্গে প্ল্যাস্টিকের একটি রেকর্ডে হাম্পব্যাক তিমির কিছু সঙ্গীত পরিবেশনও করা হয়েছে। বুঝে দেখুন ব্যাপারটা! পত্রিকা খুলে পেলাম তার ভাঁজে কাগজের মত পাতলা একটি রেকর্ড——তার গায়ে লেখা SONGS HUMPBACK WHALES এবং নির্দেশ "Remove the sheet carefully by pulling straight out from the binding, and play it manually at 33% rpm. The sound sheet is in stereo but will play satisfactorily on any phonograph. " নির্দেশমত ঐ রেকর্ডটি বাজিয়ে শুনলাম। হাওয়াই দ্বীপের অদূরে গভীর সমুদ্রসঞ্চারী হাম্পব্যাক তিমির কণ্ঠস্বর নয়, সঙ্গীত শুনলাম ভবানীপুরে বসে! কোন বড় জাতীয় গ্রন্থাগার, যারা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকা রাখেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ মহাসঙ্গীত হয়তো আপনারাও শুনতে পারেন—তাই এই সংবাদটা জানিয়ে রাখলাম।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি এবং নিউইয়র্ক জিওলজিক্যাল সোসাইটির সহায়তায় ড. রজার পাইন এবং তাঁর স্ত্রী কাটি দীর্ঘ দশ বছর ধরে হাম্পব্যাক তিমির কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করে চলেছেন। ওঁদের মতে হাম্পব্যাক তিমি শুধু শব্দ করে না, গান গায় —"তাল-লয়-মান'জ্ঞান তাদের প্রখর। প্রবন্ধের সত্যতা প্রমাণ করতে যে-রেকর্ডটি ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংযোজিত সেটাই এ তথ্যের নিঃসংশয় প্রমাণ। লেখকের ঐ প্রবন্ধের সারমর্ম অতঃপর ভাবানুবাদ করে দিলাম

সন্ধ্যে হয়-হয়। বারমুডার (নিউ ইয়র্ক থেকে ছয়-সাতশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অতলান্তিকের একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপ) গিবস হিল লাইটহাউস থেকে নৌকাটা ভাসছে মাইল-পঁয়ত্রিশ উত্তরপূর্বে। ডাঙা থেকে খুব দূরে নেই আমরা—আবার এতটা কাছেও নয় যে রাত্রে তীরে ফিরতে পারব। স্থির করেছিলাম কাটি আর আমি সমুদ্রেই কাটিয়ে দেব রাতটা। দিনের আলো ছাড়া এখানে নৌকা বাইতে সাহসও হয় না।

রাত্রি ঘনিয়ে এল। একটা পরিচিত অনুভূতির স্পর্শ। জনহীন সমুদ্রের নিঃসঙ্গতা। শুধু জনহীন নয়, জীবহীন। আকাশে নেই কোন সী-গাল, — যতদূর দৃষ্টি যায় প্রাণের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু চর্মচক্ষু সম্বল করে তো আমরা যাত্রা করিনি, তাই এবার একজোড়া হাইড্রোফোন ধীরে-ধীরে নামিয়ে দিলাম সমুদ্রের গভীরে। দু'জনে দু'টি হেডফোন কানে লাগিয়ে শুনতে থাকি তলদেশের সংবাদ।

এই তো! আমরা আর মোটেই নিঃসঙ্গ নই। একঝাঁক হাম্পব্যাক তিমি সমবেত হয়েছে আমাদের নৌকার নিচেই। তাদের সান্ধ্য সঙ্গীতের জমাটি আসর বসে গেছে দেখছি!

প্রতি বসন্তে হাম্পব্যাকের ঝাঁক ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিক থেকে এদিকে আসে। তারা অদ্ভুত শব্দ করে—শব্দ নয়, গান গায়। আজ্ঞে হ্যাঁ, গান—দীর্ঘ সময় ধরে, নানান স্বরগ্রামে। 'গান' শব্দটা ব্যবহার করে বোঝাতে চাইছি—ওদের ধ্বনিতে বিভিন্ন স্বরগ্রাম সুষম ছন্দে ফিরে-ফিরে আসে—যেমন আসে পাখির ডাকে, ঝিল্লিস্বরে।

ঝিল্লিস্বরের সঙ্গে ওদের গানের মৌল পার্থক্যটা এই যে, ঝিল্লিরব একটানা, বৈচিত্র্যবিহীন! অপরপক্ষে পাখির ডাকও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই। কোকিল, পাপিয়া, কিম্বা দোয়েলের ডাক একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি। কোন-কোন পাখির ডাকে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তা স্বতই স্বল্পস্থায়ী। কয়েক সেকেন্ডের ডাক। অপরপক্ষে হাম্পব্যাক তিমি পাঁচ-ছয় মিনিট একটানা গান গায় — এমনকি গানের আসর আধ ঘণ্টা পর্যন্ত নানান বৈচিত্র্যসমাহারে এগিয়ে চলে। ওরা কখনও- কখনও একা গায়, কখনও দ্বৈতসঙ্গীত, এমনকি সমবেত সঙ্গীতও গেয়ে থাকে। “But if you collect humpback songs for many years and compare each yearly recording with the songs of earlier years, something astonishing comes to light that sets these whales apart from all other animals. Humpback whales are constantly changing their songs! In other words, the whales don't just sing mechanically rather, they compose as they go along, incorporating new elements into their old songs. We are aware of no other animal besides man in which this strange and complicated behavior occurs, and we have no idea of the reason behind it. If you listen two songs from two different years you will be astonished to hear how different they are. For example, the songs taped in 1964 and 1969-both of which can be heard on the enclosed sound sheet- — are as different as Beethoven from the Beatles. "

[আপনি যদি হাম্পব্যাক তিমির গানগুলি দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্কলন করেন এবং এ বছরের গানটি পূর্ব বৎসরের গানের পাশাপাশি বাজিয়ে শোনেন, তাহলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন একটি আবিষ্কারে। যে আবিষ্কারের ফলশ্রুতি হিসাবে হাম্পব্যাক তিমিকে একটি বিচিত্র ব্যতিক্রম বলে মেনে নিতে বাধ্য হবেন। দেখবেন, হাম্পব্যাক তিমি তাদের গানে পরিবর্তন করে। ভাষান্তরে, তিমিরা যান্ত্রিক অনুপ্রেরণায় শব্দ করে না, ওরা পুরানো গানে নতুন সুরারোপ করে নতুন সুরে গান গায়। মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের এই বিচিত্র এবং জটিল ক্ষমতা আছে বলে তো জানি না। আর এ ক্ষমতা তারা কেমন করে আয়ত্ত করল তা-ও আমাদের ধারণার বাইরে। দুটি ভিন্ন বছরের দুটি গান শুনলেই

বুঝতে পারবেন তাদের পার্থক্যটা কত প্রচণ্ড। উদাহরণস্বরূপ আমাদের সঙ্কলিত দুটি গান শুনুন—১৯৬৪-তে প্রথমটি এবং ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়টি আমরা টেপরেকর্ড করেছিলাম—দুটোই এই প্রবন্ধের সঙ্গে শব্দতরঙ্গের প্ল্যাস্টিক শিটে পাবেন। দুটি সঙ্গীতের পার্থক্য এত বেশি যা লক্ষ করা যেতে পারে আলি আকবরের দরবারী কানাড়ার সঙ্গে চটুল হিন্দি গানের।]

আরও বিস্ময়ের কথা- পরিবর্তনটা যথেচ্ছভাবে হয় না। তিল-তিল করে হয়। কাটি আর আমি বারে বারে বাজিয়ে দেখেছি, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বরগ্রামের 'পিচ' এবং 'ফ্রিকোয়েন্সি' মেপে দেখেছি—ওদের একই গানের পরিবর্তন প্রতি বছর একটু-একটু করে হয়। গান্ধার ধৈবতে লাফ মারে না, বিবর্তনের পথে মধ্যম পঞ্চম অতিক্রম করেই অগ্রসর হয়।

আরও একটা কথা! আমরা গত চার বছর ধরে সংগৃহীত হাম্পব্যাকের গান পাশাপাশি বাজিয়ে দেখেছি—দুটি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত সেগুলি। অতলান্তিকের বারমুডা দ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ। আশ্চর্য! পৃথিবীর দু'প্রান্তের দু'টি গানে একই জাতের পরিবর্তন হচ্ছে বছরে-বছরে! কেমন জানেন? ধরুন শান্তিনিকেতনের প্রচলিত স্বরলিপি একটু পরিবর্তন করে দেবব্রত বিশ্বাস কলকাতায় একটু নতুন তানে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন এবং দেখা গেল বোম্বাইতে জর্জদার এক শিষ্যও ঠিক ঐ ঢঙে গাইছে! আপনারা বলবেন শিষ্যটি জর্জদার কণ্ঠেই ঐ নতুন ঠাট শিখেছে! কিন্তু হাওয়াই দ্বীপের তিমি কেমন করে শিখল বারমুডার গানের ঠাট? নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হয় না—আমার বিশ্বাস, তিমিরা উত্তরাধিকারসূত্রে এমন অনুভূতির দ্বারা চালিত হয় যে গানগুলি একই ঢঙে বছরে বছরে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

কাটি যখন প্রথম আবিষ্কার করল যে হাম্পব্যাক তিমির গান বছরে বছরে ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তার সহজ-সরল হেতু হিসাবে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এটাই যেহেতু গ্রীষ্মকালীন ক্রিলপাড়ার ভোজন মহোৎসবে ওরা গান গায় না, তাই মাস চার-ছয়ের ভিতর ওরা গানের কলি ও স্বরগ্রাম বিস্মৃত হয়ে যায়। তারপর স্মৃতিনির্ভর গানগুলি যথেচ্ছভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় পরের মরশুমে। এই থিয়োরিটা যাচাই করতে আমরা স্থির করলাম হাওয়াই দ্বীপে একটানা সারা বছর ধরে গানগুলি সঙ্কলন করে দেখব। সেবার অল গিডিংস এবং সিলভিয়া আর্লে নামে দু'জন দুঃসাহসী ডুবুরি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। মার্চ ১৯৭৬ এবং অক্টোবর ১৯৭২ সংখ্যা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।]

ছয় মাস একটানা টেপরেকর্ড করে দেখলাম—তিমিরা আগের বছরের গানগুলি মোটেই ভুলে যায়নি! ক্রিলপাড়ায় যাওয়ার সময় যে-গান গাইত, ফেরার পথে (মাস-দুয়েক পরে) ঠিক সেই সুরে সেই গানই গাইছে। তারপর যেন স্বেচ্ছায় তারা ঐ গানে পরিবর্তন আরোপ করে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে ভোজন-মহোৎসবের কয়েকমাস ওরা নীরব থাকলেও তাদের মস্তিষ্কের কোন রন্ধ্রকোষে ঐ গানের সুর সুসঞ্চিত ছিল।

আরও একটা মজার ব্যাপার- আমরা আবিষ্কার করলাম অনেক সময় ওরা প্রথম শব্দের শেষ ও পরবর্তী শব্দের আদিটা সংযোজন করে ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে—যেন সন্ধির সূত্রে। আমরা যেমন 'do not'-কে যোগ করে বলি 'don't' 'অতি উৎসাহীকে' বলি “অত্যুৎসাহী' কিম্বা 'মহোৎসবকে প্রাকৃত ভাষায় 'মচ্ছোব'।

"Songs are not the only vocalizations of humpbacks; we often hear grunts, roars, bellows, creaks and whines. These sounds sometimes accompany particular types of behaviour, suggesting that

they may have special social meaning."[Grunt, roars, bellow, creaks and whine' শব্দগুলির ঠিক-ঠিক বঙ্গানুবাদ কী হবে জানি না, তবে টেপরেকর্ডটি বাজিয়ে আমি তার মধ্যে যেন শ্যামা দোয়েলের শিস, বিয়ান গরুর হাম্বা, শুয়োরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, বাঘের নিরুদ্ধ আক্রোশ শুনতে পেলাম।]

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার ঐ জানুয়ারি '৭৯ সংখ্যায় আরও দুটি অদ্ভুত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম কথা হাম্পব্যাক তিমির মাছ-ধরার এক বিচিত্র কায়দা। ফার্লে মোয়াট-এর জবানিতে আমরা জেনেছি, ডানা তিমি দক্ষিণাবর্তে কীভাবে মাছ ধরে। এবার জানলাম হাম্পব্যাকের মাছ ধরার আর এক কায়দা।

ওরা ফুট পঞ্চাশ-ষাট নিচে নেমে যায় এবং সেখান থেকে স্পাইরালের পথ অতিবাহিত করে ক্রমশ উপরে উঠে আসতে থাকে। গতিপথটা একটা কর্ক স্ক্রুর মত অথবা বলা যায়।

দ্বিতলে এসে জমাদারের কাজ করার জন্য আমরা যেমন লোহার গোলাকার সিঁড়ি বাড়ির পিছন দিকে লাগাই। ঐ চক্রাবর্ত পথে উপরে ওঠার সময় হাম্পব্যাক তিমি ক্রমাগত বুদ্বুদ ছাড়তে থাকে। ফলে বুদ্বুদের এক বেড়াজালের কৃত্রিম পাতকুয়ো তৈরি হয়ে যায়—যার গভীর পঞ্চাশ-ষাট ফুট, ব্যাস পনের-বিশ-ফুট। ঐ চোঙার মধ্যে আটক-পড়া মাছগুলো বুদ্বুদে বেড়াজাল অতিক্রম করে পালাতে ভয় পায়। হাম্পব্যাক তিমি তখন এক হাঁ-এ ঐ কেন্দ্র ক্রল ও মাছ ভক্ষণ করে। ঐ ত্রিমাত্রিক অভিনব ব্যাপারটা বোঝাতে একটা ছবি এঁকে দিলাম।
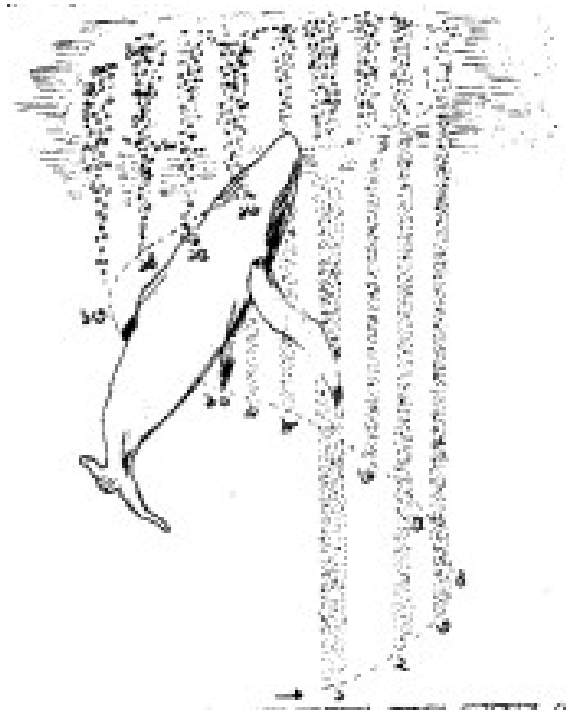
তিমি যে স্পাইরাল পথে ক্রমশঃ নিচে থেকে উপরে ওঠে সেটিকে ১-২-৩-৪ সংখ্যায় সূচি করেছি। বুদ্বুদগুলি উপরে উঠে সমুদ্র-সমতলে যে-বলয়ের সৃষ্টি করে তাও চিত্রে দেখানে হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমরা দেখছি সমুদ্রের গভীর থেকে—সমস্ত দৃশ্যটাই

জলের তলায় লক্ষণীয়, হাম্পব্যাকও দক্ষিণাবর্তে ঐ কৃত্রিম বুদ্বুদের কূপ বানায়।

পত্রিকা-সংলগ্ন টেপরেকর্ডে ঐ বুদ্বুদ বানানো এবং মাছ ধরার গানও আছে!

দ্বিতীয় সংবাদ আপনারা হয়তো শুনেছেন ১৯৭৭ সালে ভয়েজার ১ এবং ২ নামে দুটি স্পেসক্রাফট (মহাকাশযান) কেপ কানাভেরাল থেকে মহাকাশের দিকে যাত্রা করেছে। সৌরমণ্ডল পেরিয়ে, আমাদের পরিচিত গ্যালাক্সি (নক্ষত্রজগৎ) অতিক্রম করে অতিদূর মহাকাশের দিকে তারা যাত্রা করেছে, এই আশায় যে নক্ষত্রান্তরের কোন বুদ্ধিমান জীব যদি তাকে ধরতে পারে, তাহলে আমাদের এই সূর্যের তৃতীয় গ্রহের কিছু সংবাদ সে পাবে। ঐ মহাকাশযানে এ পৃথিবীর পরিচয়বাহী নানান শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে কিছু টেপরেকর্ডও আছে—পার্থিব শব্দসমূহের প্রতীক হিসাবে। তার মধ্যে মোসার্ট, বিটোফেন প্রভৃতির সঙ্গীতের সঙ্গে রাখা হয়েছে রজার ও কাটি ফলিত হাম্পব্যাক-তিমির একটি সঙ্গীত।

সম্পাদক উপসংহারে বলছেন বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তিমির গণহত্যা উৎসব আমরা অত্যন্ত বিলম্বে হলেও বন্ধ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমরা যদি সমুদ্রকেই ধ্বংস করতে থাকি তাহলেও তো ওরা রক্ষা পাবে না! হারপুনের বদলে এখন সমুদ্র দূষিতকরণই হচ্ছে ওদের বচেয়ে বড় বিপদ। আমরা যদি কল-কারখানা ও জাহাজের দূষিত ক্লেদে সমুদ্রকে এভাবে নষ্ট করতে থাকি, অসতর্ক এবং অদরদী প্রযুক্তিবিদদের রুখতে না-পারি, তাহলে ঐ তিম্যাদি জীবের অবলুপ্তিকে কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। আর সে দুর্ঘটনা যদি সত্যই ঘটে কোনদিন, তাহলে এই পত্রিকা-সংলগ্ন রেকর্ডের সঙ্গীতকে অতল সমুদ্রের সম্পদ নামে অভিহিত করাটা যথেষ্ট হবে না, বলতে হবে, ওরা অতীত-সঙ্গীতের স্মৃতি!

সবশেষে আর-একটা অপরাধ স্বীকার করে যাই। ফার্লে মোয়াটের তিমিনী—‘মবি জো’র পিঠে কোন এ্যালুমিনিয়ামের তীর পাওয়া যায়নি। ওটা ঔপন্যাসিক সত্য মাত্র!—দুটি কাহিনীর যোগসূত্র ঐ তীর!